পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

পার্বত্য চট্টগ্রাম
ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

প্রথম প্রকাশ ঃ ০১ জানুয়ারী ১৯৯৭

প্রকাশক ঃ লেখকদ্বয়

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

গ্রাফিকস্ ঃ ডট প্লাস

মুদ্রণ ঃ চৌকস
১৩১, ডি.আই.টি. এক্সটেনশন রোড
(৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

CHITTAGONG HILL TRACTS: GEOPOLITICS AND ENDANGERED SOVEREIGNTY, by Dr. Hasanuzzaman choudhury and Dr. Mohammad Abdur Rob. First Published : 01 January 1998. Puhlished by : Authors. Copyright : Authors. Cover : Arifur Rahman. Graphics : Dot Plus. Printing : Chowkash, 131, DIT Extension Road (3rd floor), Dhaka-1000. Price : Taka 100 (One Hundred) only.

উৎসর্গ

সেই সব দেশপ্রেমিক সৎ মানুষকে,

যারা দেশকে অন্যের হাতে তুলে দেয় না

এবং

যারা দেশরক্ষার নামে বাস্তবে নিষ্ক্রিয় থেকে

জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে না

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ চাকমা প্রতারণা, লুক্কায়িত স্বার্থ এবং প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

প্রকৃত সত্য

সুদূর অতীত থেকেই সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে যুগে চট্টগ্রাম ছিল বাংলার হরিকল জনপদ নিয়ে গঠিত। এটি ছিল বরাবর বাংলাদেশের কন্টিগিউআস টেরিটোরি এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে এর সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ গঠন ও অবয়ব প্রদানকারী অঞ্চল। রেকর্ডেড ইতিহাস এই যে, মাত্র ১৮৬০ সালের ২৬ জুনের 'নোটিফিকেশন নাম্বার ৩৩০২' এর ভিত্তিতে এবং একই সালের ০১ অগাস্টের 'রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার এ্যাক্ট ২২ অফ ১৮৬০' অনুসারে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী তাগিদে চট্টগ্রামের পাহাড় প্রধান অঞ্চলকে স্বতন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় রূপ দেওয়া হয়। এরপর ১৯০০ সালের ০১ মে, 'নোটিফিকেশন ১২৩ পি.ডি.' হীল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশন জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বিচ্ছিন্ন এলাকা' (excluded area)-য় পরিণত করে অযৌক্তিকভাবে সেখানে এ দেশের মূল জনগণ তথা বাংলাভাষী বা বাঙালীর অবাধ গমনাগমন ও বসতি স্থাপনকে বিঘ্নিত করে ভূমিজ সন্তান (সান অব দি সয়েল) নয় এমন বহিরাগত ও বিদেশী এবং এদেশে অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) আরাকানী, লুসাই, টিপুরা উপজাতিদের ঠাঁই করে দেওয়া হয় (S. Mahmood Ali, "The Fearful State : Power People and Internal War in South Asia", London and New Jersy : ZED Books, 1993)। ১৯৮৯ সালে এ প্রক্রিয়ায় আরো মারাত্মক ইন্ধন যোগানো হয় (৫ম খণ্ড–বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি, বাংলাদেশ গেজেট, মার্চ ২, ১৯৮৯)। অথচ আজ চাকমারা বহিরাগত হয়েও সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে নিজেদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র এবং বাস্তবে যারা এ দেশবাসী সেই বাঙালীদেরকে বহিরাগত বলে ভারতীয় প্রভাবে এবং তাঁবেদার সরকারের নোংরা সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করে "জুম্মল্যান্ড" প্রতিষ্ঠার দাবী উঠিয়েছে। এই 'জুম' শব্দটি চাকমাদের ভাষার নয়, এটি কোলদের শব্দ। এছাড়া জুম চাষ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০%-এরও কম। আবার চাকমারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের

অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম তথা কেবল দশমিক বাইশ শতাংশ। তারা আরো ১২টি উপজাতির নাম ভাঙ্গিয়ে বাস্তবে তাদেরকে প্রতারিত করে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক-দশমাংশ ভূখণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামটি পর্যন্ত চিরতরে মুছে দিয়ে "জুম্মল্যান্ড" এবং প্রকৃত প্রস্তাবে "চাকমাল্যান্ড" কায়েম করতে চায় দেশীয় ষড়যন্ত্রী ও প্রতিবেশী প্রভু রাষ্ট্রের সহায়তায়।

যাহোক, এদিকে ইতিহাস বলে, এই বাংলাদেশে ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ এর পলাশীর যুদ্ধ — এই সুবৃহৎ কালে মুসলিম শাসন চালু ছিল ইংরেজ আগমনের পূর্বে। এ উপমহাদেশে এবং এক সময়ে বাংলাদেশেও মুঘল শাসন কায়েম হয় ১৫২৬ সালে ভারতে এর প্রতিষ্ঠার পর। মুঘল শাসন কায়েমের দেড় শতাব্দী কাল পরে চাকমারা আসে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং তৎকালের চট্টগ্রামে। মুসলমান সম্রাটদের অধীনে বাংলাদেশের সুলতান, নবাব, সুবেদার দ্বারা শাসনকৃত রাজ্যে অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক জমিদাররা পূর্বোক্ত উভয় পক্ষের নিকট পুরো অনুগত থেকেই জমিদারী চালাতেন, তা ক্ষেত্রবিশেষে তারা রাজা উপাধি পেলেও।

১৩৪০ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রামের বিরাটাংশ দখল করেন। ১৫৪২ সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এ অঞ্চল দখল করেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের স্থানীয় শাসক ছিলেন খোদা বখশ খান। তার শাসনাধীন ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রাম। এভাবে আরাকানের মুসলিম প্রভাবে এবং মুসলিম শাসনের অধীনে থাকতে থাকতে এক সময়ে এখানে ঠাঁই নেওয়া চাকমা রাজারা মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ইসলামী পরিভাষা, আরবী-ফারসী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং অনেকের মতে, মুসলমান হয়ে যান। আরাকানে থাকা অবস্থাতেই এদের অনেকে মুসলমান ছিলেন। ইতিহাস থেকে দেখা যায় ১৭৩৭ সালে শের মস্ত খাঁ, ১৭৪০ সালে সোনা খাঁ, ১৭৪৯ সালে শের জব্বার খান, ১৭৬৩/৬৫ সালে নূরুল্লা খান, ১৭৭১ সালে ফতেহ খান, ১৭৭৬ সালে শের দৌলত খান, ১৭৮৩ সালে জান বখশ খান, ১৮০০ সালে তব্বার খান, ১৮০১ সালে জব্বার খান, ১৮১২ সালে ধরম বখশ খান — এরা ছিলেন এতদঞ্চলের চাকমা রাজা। ১৮৭২ সালে হিন্দু গোপীনাথের পুত্র হরিশচন্দ্র রাজা হবার পর থেকেই চাকমা সর্দার মহলে মুসলমানী নাম ও খিতাব ধারণ ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এই শেষোক্ত রাজার সময়ও রাজমাতা নিজে ধরম বখশ খাঁর কন্যা হিসেবে সমগ্র জীবনকাল চিকন বিবি নামে পরিচিত ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, চাকমা রাজদরবারে মোগলাই পোশাক ও নিয়ম-কানুন চালু ছিল। কুর্নিশ, নজর, নিয়াজ চালু ছিল। রাজারা মৌলভী দিয়ে পাগড়ী পরতেন। রাজাদেরকে হুজুর এবং রাণীদেরকে রাণী সাহেবা ডাকা হতো। রাণী বা রাজমাতাদের বিবিও বলা হতো। চাকমা রাজ দরবারে সালাম, খোদা, খানা, ওয়াক্ত, তালাক, কুটুম — এসব শব্দের প্রচলন ছিল। এখনও চাকমাদের মধ্যে অনেক মুসলিম শব্দ, আরবী-ফারসী শব্দ চালু আছে।

ঐতিহাসিক প্রফেসর ডঃ আলমগীর এম. সিরাজুদ্দিন তার "Origin of the Raja's of the Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে (প্রকাশিতঃ Journal of the Pakistan Historical Society, Karachi : Vol. xix, Part 1, January

1971) দেখিয়েছেন, রাঙামাটির চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত প্রত্ন নিদর্শনে চাকমা রাজা শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীল (রাবার স্ট্যাম্প) সংরক্ষিত আছে, যাতে লেখা রয়েছে –"রোসাং, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি ১১১১ শের জব্বার খান"। এ থেকে খুবই স্পষ্ট যে, শের জব্বার খাঁর সময়ে চাকমাগণ আরাকানের রোসাং অঞ্চলে বাস করতো। শের জব্বার খাঁর সর্দারীর সময়কাল উল্লিখিত সীল মোতাবেক ১১১১ মঘী অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীস্ট সালে আরম্ভ হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৬৫ সালে তার মৃত্যু হয় এবং সে সময় থেকে চট্টগ্রামের এতদঞ্চলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয়। সতীশ চন্দ্র ঘোষের "চাকমা জাতির ইতিহাস" গ্রন্থে এবং সতীশ ঘোষের শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ানের "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে, বিরাজ দেওয়ানের "পাকিস্তানের উপজাতি" গ্রন্থে এসব তথ্যের স্বীকৃতি আছে। আরো দেখুন — সি.আর. চাকমা, "যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি মধ্যযুগ"।

উপরের তথ্যাদি থেকে এটি খুবই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, চাকমারা বাংলাদেশের ভূমিপুত্র নয়। তারা রোসাং, আরাকান বা উপমহাদেশের অন্য কোনো অঞ্চল বা আরো দূরের কোনো স্থান থেকে এসেছে। তারা নিঃসন্দেহে বহিরাগত।

পক্ষভুক্ত ইতিহাসবিদরা যা বলেন

সতীশ ঘোষ চাকমাদের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ভুরি ভুরি মিথ্যার আশ্রয় নিলেও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, চাকমাদের আদি নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় ; তারা বাইরে থেকে এসেছে। বাস্তবেও তাই (Bangladesh District Gazetteers, Chittagong Hill Tract, pp. 33-34)। সতীশ ঘোষের শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" (রাঙামাটি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৬৯) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ; "চাকমাদের পূর্ব পুরুষরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান নহে তাহা .... স্পষ্ট" (পৃঃ ৯৪)। সাংবাদিক জয়নুল আবেদীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরূপ সন্ধানে" (ঢাকা ঃ ১৯৯৭) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

কোনো কোনো চাকমা ইতিহাসবিদ নিজেদের আদি দেশ হিসেবে চম্পাপুরী কিংবা চম্পকনগর নামে যে রাজ্যের বর্ণনা তাদের লেখায় প্রদান করেন, সেটিও প্রমাণবিহীন বা বাস্তববর্জিত। কেননা ভারতে ও এর বাইরে অন্ততঃ পাঁচটি স্থানের নাম চম্পাপুরী বা চম্পকনগর। এগুলি হচ্ছে — উত্তর বার্মা তথা শান, প্রাচীন মগধ তথা আজকের বিহার, কালাবাঘা তথা আজকের আসাম, প্রাচীন মালাক্কা তথা আজকের মালয়, কৌচিন ও হিমালয়ের নিচে সাংগুপু নদীর তীর অর্থাৎ আজকের দিনের ব্রহ্মপুত্র তীর। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেও চাকমাদের আদি অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আসলে চম্পক, চম্পা– এসব শব্দের সঙ্গে চাকমা শব্দের খানিকটা মিল থাকায় চাকমারা কল্পনা মিশিয়ে আবিষ্কার করতে চান যে চম্পক বা চম্পানগর তাদের আদি বাসস্থান। "বর্তমান ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহু চম্পাপুরী বা চম্পকনগরের নাম পাওয়া যায়। এই জন্য এই নামটি নিয়ে বিভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক"। বলেছেন অশোক কুমার দেওয়ান ("চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার", খাগড়াছড়ি, ১৯৯১, পৃঃ ৩৫)।

চাকমারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের আদি উৎপত্তি কোথায়, এ জাতির যথার্থ পরিচয় কি — এসব ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। এছাড়া চাকমা জাতির কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। এ জাতির প্রকৃত নামটি পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছে। বিরাজ দেওয়ান তার গ্রন্থে এ সত্য মেনে নিয়েছেন। সুগত চাকমা নামে আরেক লেখক চাকমাদের আদি বাসস্থান নিয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন যে, "চাকমাদের বিশ্বাস সুদূর অতীতে তারা চম্পকনগর নামক একটি রাজ্যে বাস করত" ("পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি" রাঙামাটি, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭)) এদিকে সি.আর. চাকমা নামক আর একজন লেখক জানিয়েছেন যে, চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতক নাগাদ চাকমারা বার্মায় মার খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে প্রবেশ করে ("যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি মধ্য যুগ" হাওড়া ঃ লিলুয়া ১৯৮৮, পৃঃ ৬৭)।

বস্তুতঃ চাকমাদের প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না (দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া রায় চৌধুরী, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম", কলকাতা ঃ ১৯৯৬, পৃঃ ১১। তাদের সম্পর্কে গাল-গল্পই লভ্য হয়। বিরাজ দেওয়ান দেখিয়েছেন, চাকমা ভাষা আজকে বাংলা ও সংস্কৃতের মিশ্রণে চাকমা-বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে এ ভাষার শব্দ বাংলা-সংস্কৃতের মিশ্রণ। এটি বস্তুতঃ বাংলার অপভ্রংশ। বিরাজের মতে, "কালের স্রোতে চাকমা ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে"।

চাক ও চাকমারাও যে এক নয় এবং চাকদের ইতিহাসটুকু আত্মসাৎ করার জন্যই যে কোনো কোনো চাকমা ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, সে সত্যও বেরিয়ে এসেছে বিরাজ মোহন দেওয়ান, অশোক কুমার দেওয়ান, বঙ্কিমচন্দ্র দেওয়ান, দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া রায় চৌধুরী প্রমুখের লেখা থেকে। অশোক দেওয়ান জানিয়েছেন যে, সতীশ ঘোষদের প্রদত্ত চাকমা জাতির পনর শত বছরের ইতিহাস প্রকাণ্ড মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিভ্রম ও আজগুবী কাহিনীতে ভরা খিচুড়ী (অশোক দেওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৭৬)। অশোক দেওয়ান মিথ্যা ইতিহাস পরিত্যাগ করে সত্য ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

চাকমা লোকগাঁথা কি বলে

(১) চাকমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত দু'টি পঙক্তি হচ্ছে ঃ

"আদি রাজা শের মস্ত খাঁ, রোয়াং ছিল বাড়ী
তারপর শুকদেব রাজায় বান্ধে জমিদারী"।

এ থেকে মনে হয়, চাকমাদের আদি বাস ছিল উত্তর আরাকানের রোসাং-এ (Roang/Rohang/Roshang)।

(২) চাকমাদের অতি পরিচিত লোকগীতি হচ্ছে ঃ

"ঘরত গেলে মগে খায়
ঝারত গেলে বাঘে খায়
বাঘে ন খেলে মগে খায়
মগে ন খেলে বাঘে খায়"।

এই লোকগীতি থেকে মনে হয়, চাকমারা আরাকানের মগদের কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাংলার চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে অর্থাৎ আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় নেয়।

ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ আবদুল করিমও এরকম মত পোষণ করেছেন যে, প্রাচীন মানচিত্রে পর্তুগীজ জোয়ান ডি ব্যারোজ চাকোমাস নামের এক অঞ্চল নির্দেশ করেছেন যা রাইংক্ষ্যং এবং সুবলং উপ-নদীদ্বয়ের উৎস অঞ্চলের পূর্বদিকে চীন পাহাড় এলাকায় অবস্থিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর আরাকানে চাকমাদের আদি বাসভূমি ছিল (Dr. Abdul Karim, "The Map of Joan de Barros, Dated about 1550 AD., Journal of Asiatic Society of Pakistan, 1963, Vol. VIII, No. 2)।

লিউইন, হাচিনসন, উইলসন্স,পার্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক টি.এইচ. লিউইনকে এ অঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়ে অথরিটি বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন, "উপজাতীয়দের মধ্যে যারা আজকের দিনে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করছে, তাদের অধিকাংশ প্রায় দু' পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত, যেসব কিছু চট্টগ্রামের কালেক্টরেটের রেকর্ডে রয়েছে (T.H. Lewin, "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein", pp. 28-29)।

টি.এইচ. লিউইন আরো জানান, তৎকালীন বার্মার (মায়ানমার) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে ইংরেজদের যোগাযোগের সবচেয়ে পুরনো দলিল হচ্ছে দু'টি পত্র। এর একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অন্যটি আরাকানের রাজা কর্তৃক ইংরেজ অধিকৃত চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত। সম্ভবতঃ ২৪ জুন ১৭৮৭ সাল এই তারিখে পাওয়া গেছে। লিউইন তার গ্রন্থে চিঠি দু'টি তুলে ধরেছেন (Lewin, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯)।

হাচিনসন জানিয়েছেন, "এই উপজাতীয় মানুষেরা নিজেদেরকে দেশত্যাগী সেসব বিহারবাসীর বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখণ্ডে আরাকানী রাজাগণের শাসনকালে বসতি তৈরি করেছে" (Hutchinson, "An Account of Chittagong Hill Tracts", Calcutta, 1906, p. 89)।

উইলসন জানিয়েছেন যে, চাকমারা আরাকান অঞ্চল থেকে পালিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে (Wilsons, Narrative of the Burmesewar, p.25)।

বি.আর. পার্ন-ও জানিয়েছেন যে, আরাকানের আক্রমণ ও লুটপাটের কালে সেখানকার রাজার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এ দেশে চলে আসে চাকমারা (Journal of Burma Research Society The King Bering page 44/48, Dt. 23/11/1933)।

উপরের আলোচনা থেকে এটি পুরোপুরি প্রমাণিত যে, চাকমারা অন্য দেশ থেকে এখানে এসেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী নয়, ভূমিপুত্র তো নয়ই।

অন্যান্য উপজাতিও বহিরাগত

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় উপজাতি মারমারা মায়ানমার থেকে আরাকান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে। মারমা শব্দটি 'ম্রাইমা', 'মায়ানমার' এদের কাছাকাছি। আর.এইচ.এস. হাচিনসন জানিয়েছেন, মারমা রাজা ১৭৫৬ সালে মুঘলদের দ্বারা মূল বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে আরাকানে এবং সেখান থেকে প্রথমে তৎকালীন রামুতে, ঈদগড়ে, এরপর মাতামুহুরী এলাকায় এবং অবশেষে আজকের বান্দরবান শহরে আশ্রয় নেন (হাচিনসন, প্রাগুক্ত)। সুগত চাকমাও তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে এই তথ্য দিয়েছেন। ম্রো শব্দ থেকে উদ্ভূত মুরং। এরাও উত্তর বার্মা থেকে ১৮ শতকের শেষের দিকে চট্টগ্রামে আগমন করে। এরা পূর্বে বার্মার আরাকান রাজ্যে বাস করতো। এখন এরা থাকে বান্দরবানে (আবদুল হাফিজ, "পাকিস্তানের উপজাতি", ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৫। সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭। M.R. Shelley, The Chittagong Hill Tract of Bangladesh : The Untold Story, Dhaka : Centre for Development Research, 1992, p. 83)। ত্রিপুরা উপজাতি যারা মূলতঃ পার্বত্য খাগড়াছড়িতে থাকে, তারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগমন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে (সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)। লুসাইরা যারা মূলতঃ রাঙামাটির সাজেক এলাকায় বাস করে, তারা ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড় অঞ্চল থেকে এ দেশে আসে দেড়শ' বছর পূর্বে (Shelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭)। খুমীরা ১৭ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার আগে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকানের অধিবাসী ছিল (T. H. Lewin, প্রাগুক্ত এবং Shelley, পৃঃ ৫৮)। বোমরা ১৮৩৮ সালের দিকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয় এবং এখন থাকে বান্দরবান জেলার রুমা এলাকায়। আঠারো শতকের খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষিয়াংরা আরাকানের উমাতানং পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। এখন তারা থাকে পার্বত্য রাঙামাটির কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা অঞ্চলে (Shelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২)। চাকরা সম্ভবতঃ মায়ানমারের সীমানায় চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে আরাকান হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছিল। এটি নিশ্চিত, তারা আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে (সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪)। পাংখোরা ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড় এলাকা থেকে এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে (Shelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪)। তনচইঙ্গারাও বাইরে থেকে এ দেশে এসেছে। তারা চাকমাদের উপশাখা হলেও এখন স্বতন্ত্র পরিচয় দেয়।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নরাজি ও উপলব্ধি

(১) উপরের আলোচনা থেকে এটি একেবারে স্পষ্ট যে, চাকমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো উপজাতিই এ দেশের ভূমিপুত্র নয়, আদিবাসী নয়। তারা বহিরাগত, অভিবাসী। কিন্তু এর পরও তারা বাঙালীদের, এ দেশের মূল অধিবাসীদের কিভাবে বহিরাগত বলে অত্যাচার, নিপীড়ন, সন্ত্রাস ও হত্যার শিকার করে তুলছে? কিভাবে তারা বাঙালীকে বহিষ্কার করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে? কিভাবে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে শত শত বাঙালী পরিবারকে উৎখাত হতে হয়েছে এবং ছাড়তে হয়েছে তাদের জমি, বাগান,

ব্যবসা ও অন্যান্য বিষয়াদি? কিভাবে বাঙালী সরিয়ে পুনর্বাসিত হয়েছে চাকমারা? এত কিছুর পরও কেন চাকমারা সন্তুষ্ট নয় (লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং চাকমাদের সঙ্গে আলাপ দ্রষ্টব্য। ২৯ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর ১৯৯৭)। খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউসে শান্তিবাহিনীর সদস্য মেজর জয়েস চাকমা, শান্তিবাহিনী ও পিসিজেএসএস-এর অঙ্গ সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সন্ত্রাসী নেতা প্রসিত খীসার পিতা অনন্ত বিহারী খীসার সঙ্গে আলাপ করেছেন লেখক। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানার বড় মেরুং মৌজার লক্ষ্মীপুর পাড়ায় প্রবীণ চাকমা, কমল জ্যোতি চাকমা, চিত্তরঞ্জন চাকমা, নীলমণি চাকমা, সদানন্দ চাকমা, উত্তম চাকমা, রমণী কুমার চাকমা, জয়ন্ত চাকমা, লিটন চাকমা, চন্দ্রশেখর চাকমা, প্রতিময় খীসা প্রমুখের সঙ্গে আলাপ করেছেন বর্তমান লেখক।

লেখকের ধারণা তৈরি হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আলাপ ও মতামত গ্রহণ থেকে। এছাড়া বর্তমান লেখকের আরো —জিজ্ঞাসা — পার্বত্য রাঙামাটির ঘাঘরা জোনের নাভাঙ্গা আর্মী ক্যাম্পের কাছে কুকী পাহাড়ের (কালা পাহাড়) নিকটে ০১/১০/৯৭ তারিখে লেখকের সঙ্গে আলাপরত রাণীহাট কলেজের ছাত্র আশীষ চাকমা, তুহিন চাকমা, নয়ন তালুকদার, পিন্টু চাকমা, বিধু বিকাশ চাকমার আসল পরিচয় কি? তারা কি চায়? বিভূতিভূষণ চাকমার মনের কথাই বা কি?

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে– কিভাবে চাকমারা বিশেষতঃ শান্তিবাহিনী, জনসংহতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), হীল ওমেন এসোসিয়েশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদেরকে নিজ দেশে পরবাসী করে তুলছে? কেন একের পর এক সরকার বিশেষতঃ ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে, বিন্দু বিসর্গ না জেনে, আগ-পিছ না ভেবে অতি মুষ্টিমেয় চাকমা উপজাতি সন্ত্রাসী ও তাদের সংগঠন শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির কথায় নাচছে, উঠছে-বসছে? কেন আওয়ামী লীগ সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়েও স্বীয় নীতির সঙ্গে পরস্পরবিরোধিতা করে অতি সামান্যসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমার কাছে মাথানত করে বাঙালীদের উপর পীড়ন, বহিষ্কার ও হত্যাকাণ্ড চালাতে দিচ্ছে? কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যেখানে খাগড়াছড়ির মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং ২২ বছর (১৯৭১–১৯৯২) ধরে আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবও নিজেরসহ বাঙালীদের অধিকার, ভূমিকা, ক্ষমতার বিষয়ে হতাশ এবং সেখানে বাঙালীদের ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ে আছেন? কেন প্রাক্তন পৌর চেয়ারম্যান আবুল কাসেম সাহেব উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্যে রয়েছেন? (লেখকের সঙ্গে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে — সরকার এর পরও শান্তিবাহিনীকে এত ছাড় দিচ্ছে কি করে এবং কিভাবে তাদেরকে জামাই-আদর করা হচ্ছে? এর পেছনে বর্তমান সরকারের অজ্ঞতা, জিদ, অপরিণামদর্শিতার সাথে সাথে ভারত-ভীতি, ভারত-প্রীতি এবং স্বীয় ক্ষমতা সংরক্ষণের সংকীর্ণ স্বার্থ-যোগ আছে কি? কেন একতরফা শান্তিবাহিনীর সঙ্গেই কেবল আলোচনা? ওখানকার বাঙালীরা কেন আলোচনায় নেই? কেন সামরিক বাহিনীর কোনো প্রতিনিধিত্ব বা বক্তব্য নেই? কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী বিষয়ক সেনা

সদস্য বিশেষজ্ঞকে আলোচনায় রাখা হয়নি এবং আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন এ ব্যাপারে একেবারেই নভিস একজন রাজনীতিক?

প্রশ্ন হচ্ছে — কেন ভারতীয় আধিপত্যবাদের দালাল ধান্দাবাজ মুষ্টিমেয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মনগড়া ও মিথ্যা প্ররোচনায় সরকার তাল দিচ্ছে? কি কারণে ১৯৯২ সালে শান্তি বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে তাদের কর্তৃক একতরফা যুদ্ধবিরতি (Unilateral Ceasefire) ঘোষণার পরও তৎকালীন সরকার বিষয়টির তাৎপর্য বোঝেনি? কেন ১০৯৫ বার যুদ্ধবিরতি লংঘন করার পরও (০৮/১১/৯৭ পর্যন্ত) আজ সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলে, রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে ভারতের আঞ্চলিক, ভূ-কৌশলগত, রণকৌশলগত, আর্থিক ও বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে? কেন পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? কেন চট্টগ্রামকে বিপদগ্রস্ত করা হচ্ছে? কেন চট্টগ্রাম বন্দরকে ও বঙ্গোপসাগরের আমাদের জলসীমাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের গেইটওয়ে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে বাংলাদেশকে বিধ্বস্ত করা হচ্ছে? কেন 'র' পারছে পার্বত্য বিষয়ে স্বীয় প্ল্যানকে কার্যকরী করতে? কেন বাংলাদেশকে ভূটানের ও নেপালের মত ল্যান্ডব্লকড্ করার ষড়যন্ত্রে পা দেওয়া হচ্ছে? কেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? (দ্রষ্টব্য — বর্তমান লেখক ও অপর একজন লেখকের গবেষণাদ্বয়ের সংক্ষিপ্তসার। দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রাম, নিউ নেশন, সাপ্তাহিক বিক্রম, অতন্ত্র জনতা বাংলাদেশ-এর পার্বত্য চট্টগাম বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ, স্বতন্ত্র প্রচারপত্র এবং ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম-এর উপসম্পাদকীয়তে লেখকদ্বয়ের গবেষণার সার-সংক্ষেপ ও রেফারেন্সসমূহ। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭)।

(২) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি উপজাতির জনসংখ্যার শতকরা হার এক ভাগও নয়। অর্ধেক ভাগও নয়। কেবল ০.৪৫ ভাগ। এর ভিতর ১২টি উপজাতি চাকমাদের সঙ্গে নেই। তাদের দু' একটির দু' চারজন শান্তি বাহিনীর সঙ্গে বাধ্যতা, ভীতি, লোভ, বিভ্রান্তির কারণে গেলেও বাকিরা বুঝতে পেরেছে যে, উপজাতীয়দের স্বার্থ, পাহাড়ীদের স্বার্থ ইত্যাদির কথা বলে চাকমারা এককভাবে নেতৃত্ব, সুবিধা, অর্থবিত্ত, আখের — সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছে, মাখন সব খেয়ে ফেলছে। স্বাধীন জুম্মল্যান্ডের দাবি তুলে বাস্তবে তারা চাকমাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দিকে এগুচ্ছে। এজন্য এবং চাকমা ও শান্তিবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ১২টি উপজাতির লোকেরা বাংলাদেশের অনুগত নাগরিক হিসেবে এ দেশে থেকে বাঙালীদের সঙ্গে সহাবস্থান করে, সমানাধিকার নিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে। অন্যান্য উপজাতির লোকেরা, বিশেষ করে ত্রিপুরা, পাংখো উপজাতির লোকেরা, নেতারা একথা বর্তমান গবেষক-লেখককে জানিয়েছে, পার্বত্য খাগড়াছড়িতে, পার্বত্য রাঙামাটিতে — মূল কেন্দ্রে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে (সেপ্টেম্বর ২৯ থেকে অক্টোবর ২, ১৯৯৭)। পাংখো উপজাতির নেতা লাল এ্যাংলিয়ানা এবং তার উপজাতির অন্য সদস্যরা এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছে। খাগড়াছড়িতে যতীন্দ্র ত্রিপুরার কাছ থেকে লেখক জেনেছেন তার মতামত। আলিক্ষ্যিয়াং, পাংখো পাড়া, বিলাইছড়িতে পাংখোদের সঙ্গে লেখকের দীর্ঘ সাক্ষাত ও আলাপ হয়েছে। বর্তমান গবেষক-লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে (০১/১০/৯৭ তারিখে) লাল এ্যাংলিয়ানা (শিক্ষক, প্রাক্তন উপজেলা

চেয়ারম্যান, পাংখো নেতা), ক্লু আনা (প্রাক্তন সদস্য, রাঙামাটি স্থানীয় পরিষদ), লাল ছোক লিয়ানা (জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক), আব্রাহাম পাংখোয়া (নিউ টেন শ্রেণীতে পড়ে), গামতার পাংখোয়া (নিউ টেন শ্রেণীতে পড়ে) — এদের। শেষ দু'জন বিলাইছড়ি হাই স্কুলের ছাত্র। গিলাছড়া পাহাড়ে লেখক গিয়েছেন, বিভিন্ন পাহাড়ে ওঠা-নামা করেছেন, উপজাতীয়দের বাড়ি-ঘর দেখেছেন, উপজাতীয় নারী-পুরুষের কাজ-কারবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাইংক্ষ্যং খালের পাড়ে হেঁটেছেন। পাংখো পাড়ায় লাল এ্যাংলিয়ানা লেখককে বলেছেন, তারা এ দেশের মানুষ হিসেবে সবার সঙ্গে থাকতে চান। তারা ভারতে যেতে চান না। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে চান না। শান্তিবাহিনীর হাত থেকে নিরাপত্তা চান, শিক্ষা চান, কাজ চান, হেরিংবন্ড রাস্তা চান কেননা গভীর দুর্গম পার্বত্য এলাকায় তাদের রাস্তাই নেই। তিনি জানান, চাকমারা উপজাতি উপজাতি করে নিজেরা ৭২% শিক্ষিত হয়ে গেছে, অথচ পাংখোদের মধ্যে এম.এ. পাস বা ডাক্তার নেই। তিনি বললেন, 'শান্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য তারা চাপ দিত, মার দিত, শাস্তি দিত। চাঁদা আদায় করত'। এ্যাংলিয়ানার মামা শান্তি বাহিনীর গুলীতে মারা গেছে। তাদের উপজাতিতে একজনও শান্তিবাহিনী নেই। তারা বাঙালীদের সঙ্গে সম সুযোগ নিয়ে বাঁচতে চান। তিনি বললেন, 'আমরা ভারতে যেতে চাই না। মরলে এখানে মরবো, বাঁচলে এখানেই বাঁচবো'। তিনি 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে শ্লোগানও দিলেন শ' দেড়েক মানুষের সামনে।

কাজেই এই যখন অবস্থা, তখন স্পষ্ট যে, শান্তি বাহিনী ও জনসংহতি মূলত চাকমা সন্ত্রাসীদের নিয়ে জুমল্যান্ডের নামে চাকমাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্যেই ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট হয়ে বর্ডারের ওপার থেকে তৎপরতা চালাচ্ছে।

উপরের পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ০.৪৫% জনগণের মধ্যে চাকমাদের অবস্থান পুরো দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ০.২২%। এখন এই ক্ষুদ্র লোকসমষ্টির অতি ক্ষুদ্র (মাত্র ছয়-সাত হাজার) সন্ত্রাসী চক্রের সংগঠন ক'টির তথা শান্তিবাহিনী, জন সংহতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ (পিজিপি), হীল ওমেন এসোসিয়েশন, গণ লাইন, পঞ্চায়েত — এগুলির কাছে কেন বাংলাদেশ সরকার নমনীয় হচ্ছে, মাথানত করছে? কেন সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে? কিভাবে শান্তি বাহিনী প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে? কিভাবে তারা চাঁদাবাজি করছে, কোর্ট বসাচ্ছে, শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে? কিভাবে তারা ট্যাক্স কালেক্ট করছে? কিভাবে করছে সন্ত্রাস? কিভাবে তারা নির্বিচারে লুটপাট, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার শিকার করছে বাঙালী মুসলমানদের?

আবার এই ০.২২% বা যদি আরো ১২টি উপজাতিসহ ০.৪৫% উপজাতি জনসংখ্যাও ধরি, তাহলে এই সামান্য বহিরাগতদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ মর্যাদা, বিশেষ কোটা, প্রতি বাঙালী মুসলমান অপেক্ষা প্রতি উপজাতীয় ব্যক্তি ২১ গুণ বেশি সুবিধা লাভ — সবকিছু দেবার পরও কেন তাদেরই দাবি অনুযায়ী দেশের এক দশমাংশ (৫০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩২৯৪.৭১ কিলোমিটার) তাদের জন্য এককভাবে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে রিজিওনাল কাউন্সিল, উপজাতীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে পার্বত্য শাসন,

ভূমির উপর অন্যায় দখলদারির ব্যবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী গমনে বাধা, পুলিশ নিয়োগসহ নানা উপঢৌকন দিয়ে? লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনবসতি এলাকাসমূহের ৭০ ভাগই এককভাবে উপজাতীয়দের দখলে। কেবল অবশিষ্ট ৩০ ভাগে বাঙালীর সাথে তাদের সহাবস্থান। তাও চাকমারা সহ্য করতে রাজি নয়, যদিও তারা নিজেরাই এ দেশে বহিরাগত। ওদিকে চাকমারা ৭২% সাক্ষর, বাঙালীরা ১০% থেকে ২০%। তাতেও চাকমা শান্তিবাহিনী (এস.বি.) সন্তুষ্ট নয়। নচেৎ কেন সেখানকার ৫০% বাঙালীর জীবন বিষিয়ে তোলা হচ্ছে? কেন তাদেরকে জমি, বাগান, দোকান, পুকুর, অন্যান্য ব্যবস্থা, শিল্প ও সম্পত্তি, মেহনতের ফসল, শ্রমের অধিকার — সব কিছু থেকে চ্যুত করে মানবেতর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তথা গুচ্ছগ্রামের ন্যূনতম রেশনের, নিয়ন্ত্রিত গতি-বিধির অনিশ্চিত জীবনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে? (রাঙামাটির ইসলামপুরের মানবেতর গ্রামে লেখক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন)।

বর্তমান গবেষক-লেখক শুনেছেন নিপীড়িত মুসলমান জনতার কাছে – কিভাবে শান্তিবাহিনী হত্যা করেছে তাদের বাচ্চাদের। কিভাবে চাঁদা আদায় করা হয়েছে ও হচ্ছে। কিভাবে বাঙালীদের, মুসলমানদের উচ্ছেদ করা হয়েছে .জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর থেকে। কিভাবে ধরে নিয়ে গেছে মানুষকে। কিভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে বোন, ভাবী, বউ, মা ও মেয়েকে। কিভাবে ধর্ষণের পর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে দেহের অঙ্গসমূহ। কিভাবে গুলী করে বা কসাইয়ের পশু জবাইয়ের মত করে বাঙালীকে, মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। কাপ্তাইয়ের প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলমান বনি আদমের গুমরে ওঠা কান্না দেখেছেন, শুনেছেন বর্তমান লেখক। তার তখন মনে পড়েছে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি. এর কার্যালয়ে ডিসপ্লে বোর্ডে দেখা বাঙালী মুসলমানদের উপর পরিচালিত অত্যাচার, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট দলিল— বিভৎস, আতংক সৃষ্টিকারী, বুক ভাঙ্গা আর্তনাদের স্মারক ফটোগ্রাফগুলির কথা।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন — কেন বাঙালীদের, মুসলমান বনি আদমদেরকে শান্তিবাহিনীর দ্বারা হত্যার ও বহিষ্কারের শিকার করা হয়েছে? শ্রীলংকায় ১৩% তামিল যে সুযোগ পায়নি, বাংলাদেশে মাত্র ০.২২% চাকমা সে সুযোগ পায় কি করে? অনেক বড় ভূখণ্ড হয়েও, প্রদেশের মর্যাদায় থেকেও বায়াফ্রা কি নাইজেরিয়াতে এত সুযোগ পেয়েছে? ইরাকে কুর্দীরা কি এই সুযোগ পেয়েছে? অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা; এ্যামেরিকার নিগ্রোরা কিংবা ১৮৬১-৬৫তে সাউথ কি এমন সুযোগ পেয়েছে? ভারতে নিজ দেশে পাঞ্জাবের শিখদের প্রতি, গুর্খাল্যান্ডের দাবীদারদের প্রতি , দখলকৃত কাশ্মীরে মুসলমানদের প্রতি, সাত রাজ্যসমূহের মানুষ ও গেরিলাদের প্রতি ভারত সরকার কি আচরণ করছে? কীভাবে সে স্থলে বিশাল সংখ্যক সেনা মোতায়েন রয়েছে, নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হচ্ছে ইনসার্জেন্সী? কীভাবে সেখানে চূড়ান্ত সেনা কর্তৃত্ব এবং সেজন্য বিশেষ আইন করা হয়েছে? সেই ভারত বাংলাদেশে কেন শান্তিবাহিনীকে মদদ দিচ্ছে? কেন তাদেরকে ভারত আশ্রয়-প্রশ্রয়, অর্থ, বৈষয়িক সুযোগ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, পশ্চাৎভূমি, রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনিক সহায়তা, প্রচার সুবিধা ইত্যাদি অকাতরে দিয়ে চলেছে? কেন বাংলাদেশ সরকার এসব দেখেও প্রতিবাদ করার সাহস রাখে না এবং উটপাখীর মতো বালিতে মুখ গুঁজে রাখে?

প্রাসঙ্গিক আরো প্রশ্ন হচ্ছে--কেন সামরিক বাহিনী উইথড্র করার দিকে এগোনো হচ্ছে? বরকল, লোগাং, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ির পানছড়ি, মাটিরাঙা, সদর থানার কুমিল্লা টিলা, বান্দরবান জেলার কিছু কিছু সেনা চৌকি, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, মারিস্যা প্রভৃতি সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত স্থানে কেন সেনা ক্যাম্প তুলে নেওয়া হচ্ছে? কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্ভাবনা--সম্পদরাজি, আর্থনীতিক সুযোগ, ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব সবকিছুকে চাকমা সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ও ভারতের পায়ে নিবেদন করা হচ্ছে? যে বাঙালী মুসলমানের ভাই গুলী খেয়েছে, যে বাঙালীর ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার সন্তানকে খুন করা হয়েছে, যার পরিবারের মহিলাকে বেইজ্জত করা হয়েছে, তাদের জন্যে কি করেছে সরকার বাহাদুর? কাউখালী ম্যাসাকারে যে মুসলমান ভাইয়ের তিন ছেলেকে জবাই করেছে শান্তিবাহিনী এবং সেখানে তাদের কবর আছে এবং যে হত্যাকাণ্ডের জন্যে কোনো মামলা নেয়নি থানা কর্তৃপক্ষ, সেই উদ্‌ভ্রান্ত মুসলমান ভাইয়ের জন্যে কোনো সান্ত্বনা আছে কি? তিনি নিজেও তো উৎখাত হয়ে গুচ্ছগ্রামে মানবেতর জীবনে রয়েছেন।

কাপ্তাই লেক স্পীড বোটে পেরিয়ে ইসলামপুর গুচ্ছগ্রামে গিয়াস উদ্দিন ব্যাপারী, জসীম উদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম, পার্বত্য যুব পরিষদের সভাপতি কাজী ইউসুফ আলম, মোসলেম খাঁ, শফিউল আলম, ইসলামপুর মসজিদের ইমাম দিদারুল হক আনসারীসহ অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেছেন বর্তমান লেখক। (০১/১০/৯৭ তারিখ, ইসলামপুর, কাপ্তাই, রাঙামাটি)।

কেন ৪৪০.০৪ বর্গমাইল এলাকা যেখানে উপজাতীয় ও বাঙালীরা থাকে, সেই এলাকা ছাড়িয়ে, কেন্দ্রশাসিত জাতীয় অঞ্চলের (সংরক্ষিত বন, মুক্ত খাস পাহাড়ী অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় অঞ্চল, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি) বিশাল ৪৬৫২.৯৬ বর্গ মাইল এলাকার কর্তৃত্বও সেখানকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীকে, মুসলমানকে বঞ্চিত করে, সারা দেশবাসীকে বঞ্চিত করে কেবলই ০.২২% চাকমার সন্ত্রাসী প্রতিভূ শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, বাঙালী বহিষ্কার, নিজস্ব পুলিশ, প্রবেশের অনুমতি (Inner Line Regulation) ইত্যাদির প্রক্রিয়ায়? আমাদের অকুতভয় সেনা সদস্যরা শ্রম, ঘাম, সময় ও জীবন দিয়ে তথাকার বাঙালীদের সহায়তায় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা করছে, তা আমরা ছেড়ে দেবো কেন? আমরা তো ভুলে যেতে পারি না যে, লেফটেন্যান্ট মুশফিক, ক্যাপ্টেন আরিফসহ আরো হাজারো দেশপ্রেমিক এদেশেরই এক-দশমাংশ 'ল্যান্ড অফ প্রমিজ' পার্বত্য চট্টলার জন্যে জীবন দিয়েছেন। তাহলে সরকার সমগ্র দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে ভারতে লালিত মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীকেই কেবল জানতে দিয়ে কী ধরনের চুক্তি করছে তাদের সঙ্গে? সরকার কি এর পরিণাম বুঝতে পারছে না? একি শান্তির পথে এগোনো, না আরো বড় অশান্তি ডেকে আনা?

এসব প্রশ্নের জবাব সরকারকে অবশ্যই দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দেওয়া, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-ফেনীকে বিপদগ্রস্ত করা, বন্দর হাতছাড়া করা, ভারতকে খবরদারী বিস্তার করতে দেওয়া, বঙ্গোপসাগরের জলসীমা হারানো — এসব মেনে নেবে না দেশের

জনগণ। প্রতিবাদ উঠেছে ও উঠবে, প্রতিরোধ করা হবে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী নয়, সারা দেশের ১২ কোটি মানুষ রুখে দাঁড়াবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে, দেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতার সঙ্গে বেঈমানী করলে জনগণ তা ক্ষমা করবে না কোনোদিন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও ক্ষমা করবেন না। পাবলিক এক্সচেকারের পয়সার হিসাব এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ও পার্বত্য বাঙালীর শ্রম, দেশপ্রেম, রক্ত, হাহাকার আর জীবনের যে ব্যয়, সেটির জন্যে জবাবদিহি করতে হবে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে।

দেশের সংবিধান বিরোধী, রাষ্ট্রের-প্রজাতন্ত্রের ইউনিটারী বা একক চরিত্রবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তি বাহিনী তথা ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া বা আঞ্চলিক পরিষদ ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেবার অধিকার সরকারের নেই। এসব কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং সংবিধান লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কোর্টে মামলাযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেখানকার ভারতীয় তস্কর সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে কেন? কেন "ভিসা' লাগবে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতে? কেন সংবিধানের ৩৬ ধারা, ৪২ ধারা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে বাঙালীর জন্যে, ১২ কোটি মানুষের জন্যে অস্বীকার করা হচ্ছে? কেন ১২ কোটি দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে; সংসদ, জনমত, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে পদদলিত করে এবং Oath of office কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে; পার্বত্য বাঙালীকে উপেক্ষা করে, সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে কেবল ভারত-পুষ্ট সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে তাদেরই মর্জিমাফিক এককভাবে চুক্তি করা হচ্ছে? সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাঙামাটি, পার্বত্য বান্দরবান (১৯৮৮ সালে তিনটি জেলার মর্যাদায় বিভক্ত। দ্রষ্টব্য ঃ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বাংলাদেশ গেজেট, ২ মার্চ ১৯৮৯) আমাদের, এদেশের ১২ কোটি মানুষের। সাজেক, কাসালং, মাইনী, চেঙ্গী, তবলছড়ি, কালা পাহাড়, বন্দুকভাঙ্গা, হরিণা, গোবাইছড়ি, সিতাপাহাড়, রাইংক্ষ্যং, চিম্বুক, মওদাক, মিরিঞ্জা প্রভৃতি রেঞ্জ ও ভ্যালীসমূহ আমাদের। মাইনী রিজার্ভ ফরেস্ট, কাসালং রিজার্ভ ফরেস্ট, মাতামুহুরী রিজার্ভ ফরেস্ট, রাইংক্ষ্যং রিজার্ভ ফরেস্ট, ঠেগা রিজার্ভ ফরেস্ট, সাংগু রিজার্ভ ফরেস্ট আমাদের। কর্ণফলী, কাসালং, মাইনী, চেঙ্গী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ফেনী নদী আমাদের। কাপ্তাই লেইক আমাদের, এই বাংলাদেশের। যারা বা যে সরকার বাংলাদেশের অরণ্য, পাহাড়, সম্পদরাজি, ঝরণা ও হ্রদ ছেড়ে দেবে শত্রুদের হাতে, তাদেরকে বা সে সরকারকে কোনোদিন জনগণ ছাড়বে না। কোনোদিনও না। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। আল্লাহ্ হাফিজ।

রচনাকাল ঃ জমাদিউস সানি ১৪১৮। কার্তিক ১৪০৪। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭।

দৈনিক ইনকিলাব- এ প্রকাশিত। ১১, ১৪,১৫ নভেম্বর ১৯৯৭। সাপ্তাহিক বিক্রম, প্রচ্ছদ কাহিনী, ১১-১৭ নভেম্বর ১৯৯৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্তাক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম গোপন চুক্তির রহস্য কোথায়

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, অরক্ষিত। সেখানকার পাহাড়ে অরণ্যে, চরাচরে আজ মুসলমান বাংলাভাষী জনতার হাহাকার, আহাজারি আর আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে আছে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা দখলকারী আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে কয়েক দফা অতি গোপনভাবে আলোচনা চালানোর পর এখন চাকমা শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, উষাতন তালুকদার প্রমুখের সঙ্গে ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭-এ সম্পাদিত হতে না পারা গোপন অসম দেশখাদক চুক্তিটি ২৬ নভেম্বর ১৯৯৭-এ সমাধা করতে যাচ্ছে। অবশ্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরালের ঢাকায় আগমন স্থগিত হওয়ায় এবং তাকে দিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি চাপ দিতে না পারায় এ চুক্তি সম্পাদন পিছিয়েও যেতে পারে।

কোন্ সংগঠনের নাম শান্তিবাহিনী? যাদের দাবি ছিল ১৯০০ সালের ফিউডাল "হীল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশন" বজায় রাখা। অথচ যারা ১৯৮৯ সালে পেয়েছে লক্ষ গুণ বেশি অধিকার ও সুযোগ। এখন যারা চাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে। এই শান্তি বাহিনী বিগত ২৩/২৪ বছর ধরে প্রথমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে, প্রীতি চাকমার উপদলীয় নেতৃত্বে এবং আজ সন্তু লারমার নেতৃত্বে আর জনসংহতির (পিসিজেএসএস) সাথে সংযুক্ত পাহাড়ী ছাত্র সমিতি (পিসিএস), হীল ওমেন এসোসিয়েশন ইত্যাদির সহায়তায় হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমানকে খুন করেছে। এক হিসাবে শান্তিবাহিনীর হাতে খুন হওয়া মুসলমানের সংখ্যা, বাংলাভাষী বাংলাদেশী মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজারের মত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই খুন হচ্ছে মুসলমান বাংলাভাষীরা। বড় বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছে বহুবার। এর মধ্যে কাপ্তাই থানার চন্দ্রঘোনায় পেট্রোলরত ৭জন সৈনিক হত্যাকাণ্ড, লংগদু হত্যাকাণ্ড, কাউখালী হত্যাকাণ্ড, বরকলের ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ড, পানছড়ি হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার নব খাগড়াছড়িতে ৭ জন সৈনিক হত্যাকাণ্ড, রামগড় থানার ঝগড়াবিল বাজার হত্যাকাণ্ড,

খাগড়াছড়ির লোগাং হত্যাকাণ্ড, নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ার হত্যাকাণ্ড, রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার গুলশাখালী, গাঘাছড়া, মাইনী, বড় মাহিল্লা ও কালাপাকজ্জার ৩৪ বাঙালী কাঠুরের হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির কুমিল্লা টিলার হত্যাকাণ্ড, নাইক্ষ্যংছড়ি পাড়া ও বলিপাড়ার হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলমানরা, বাংলাভাষী মানুষেরা হাজার হাজার হত্যার শিকার হবার ব্যাপারে সবাই এক কথা বলেছে। রাঙামাটির কাপ্তাইয়ের গিয়াসউদ্দিন ব্যাপারী, রিজার্ভ বাজারের জাহাঙ্গীর আলম, পার্বত্য যুব পরিষদের সভাপতি কাজী ইউসুফ আলম, ইসলামপুরের ক্ষুদে ব্যবসায়ী মোসলেম খাঁ, লঞ্চের কেরাণী শফিউল আলম — এরা সবাই শান্তিবাহিনী কর্তৃক মুসলমান হত্যা, বাংলাভাষী মানুষ হত্যার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন বর্তমান লেখকের কাছে ০১/১০/৯৭ তারিখে রাঙামাটিতে। যাহোক, কয়েক হাজার মুসলমান বাংলাভাষী যে শান্তি বাহিনীর হাতে বিগত বছরগুলিতে নিহত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালীদের মতে এই সংখ্যা ত্রিশ হাজারের মতো। বাংলাদেশের আর্মী, বিডিআর, আর্মড পুলিশ, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি এর কয়েক শত সদস্যও শান্তিবাহিনীর সাথে সংঘাতে, শান্তিবাহিনীর এ্যামবুশ-এ প্রাণ দিয়েছে। এছাড়া বাঙালীদের, সেনা সদস্যদের আহত করা, অপহরণ করা, গায়েব করে দেওয়া — এসবও ঘটেছে শত শত ক্ষেত্রে। বাঙালীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র খুনীরা। মা-বোন-বউ-মেয়ের ইজ্জত হরণ করেছে ধরে নিয়ে গিয়ে, কিংবা পরিবারের অন্যান্যদের সামনে অস্ত্রের মুখে বা হাত-পাত বেধে রেখে। মারধর, চাঁদা আদায়, হুমকি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার, গৃহ ও দোকান লুট ইত্যাদি তো লেগেই আছে। এই শান্তিবাহিনী ১০ আগস্ট ১৯৯২ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব লুপ্ত হবার আশংকায় এবং ব্রীদিং স্পেস লাভের মাধ্যমে রিঅরগেনাইজড হবার গোপন স্বার্থে একতরফা সীজফায়ার বা অস্ত্র বিরতি ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে আজ নভেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত তারা ১২০০ বারেরও বেশি এ অস্ত্রবিরতি লংঘন করেছে। তারা অপহরণ, গুম, খুন, চাঁদা আদায়, বেসামরিক মুসলমান বাংলাভাষী হত্যা, বেসামরিক ব্যক্তিকে আহত করা, সেনা সদস্যসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের আহত করা, গুলি বিনিময়, এ্যামবুশ, নানাবিধ সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ নানাভাবে লংঘন করেছে নিজেদের অস্ত্রবিরতি।

বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতে লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট, তথায় হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠাকারী, তথায় ট্রেনিং লাভকারী, তথা থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ-এক্সপ্লোসিভ-মাইন লাভকারী, অর্থ লাভকারী, নৈতিক ও প্রচার-সমর্থন লাভকারী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভকারী, ভারতীয় বিএসএফ-এর কাভার লাভকারী, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র"-এর সার্বিক ও কার্যকর সহায়তা লাভকারী, দেশদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী খুনী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীকে চূড়ান্ত অবজ্ঞা করে, চরম অন্ধকারে রেখে এক অশুভ চুক্তি করতে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? এ কথা খুব পরিষ্কার, আমরা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চাই, আমরা চাই পার্বত্য বাংলাভাষী, পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমান এবং পার্বত্য উপজাতীয়রা এক সঙ্গে শান্তি, সমতা, সমসুযোগ, সহযোগিতা, সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্মানজনক, স্বস্তির সুখী জীবনে বসবাস

করুক। কিন্তু বাংলাভাষীদের স্বার্থ বিকিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করে নিশ্চয়ই কোনো গোপন অসম চুক্তি আমরা ১২ কোটি মানুষ চাইতে পারি না।

যুক্তি, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, সততা, সাংবিধানিকতা, গণতন্ত্র, জনগণের ম্যান্ডেট, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ, জোর করে জাত-শত্রু হয়ে যাওয়া ভারতের এ যাবৎকার এবং বর্তমানের আচরণ, ভূমিকা ও তৎপরতা পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালীদের স্বার্থ ও অস্তিত্বসহ এক কথায় দেশের সামগ্রিক অস্তিত্ব— এসব কিছু আন্তরিকভাবে গভীর বিশ্লেষণ সহকারে বিবেচনায় আনলে আওয়ামী সরকারের পক্ষে এ অসম চুক্তির ন্যায় আত্মঘাতী চুক্তি করা কোনোকালেই সম্ভব হতো না।

এই চুক্তি গায়ের জোরে, ভারতের সমর্থনে এবং সংকীর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণের স্বার্থের তাগিদে এবং অনেকখানি অযোগ্যতা-অজ্ঞতা-জিদ-লুক্কায়িত গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত ঋণ শোধ — এ সবের কারণেই সমাধা করতে যাচ্ছে সরকার, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন আসে সঙ্গতভাবেই। ১২ কোটিরও বেশি মানুষের দেশে শতকরা ৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে কীভাবে টেকনিক্যাল মেজোরিটির জোরে ক্ষমতা দখল করে সরকার এই দেশ-ডোবানো চুক্তি করতে যাচ্ছে?

শুধু আওয়ামী লীগ বাধ্য তাদের দলীয় প্রধান ও তাদেরই থেকে উত্থিত সরকার প্রধানের এই অপরিণামদর্শী আচরণকে সমর্থন করতে। এরা সমর্থন না করলে নিজেরা আস্ত থাকবে না — পদ পদবী, হালুয়া-রুটি, সুযোগ-সুবিধা, লাইসেন্স-পারমিট, মালকড়ি — সব কিছু হারাবে। সমর্থন দিতেই হবে তাই, যুক্তিগ্রাহ্য হোক বা না হোক ; ভাল লাগুক বা না লাগুক ; দেশ থাকুক বা গোল্লায় যাক্।

কিন্তু এ অবস্থা তো অন্যদের নয়। তাই অন্যান্য সকল দল, নেতৃত্ব, কর্মী এবং সাধারণভাবে জনগণের তরফ থেকে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ সংগঠিত, সংঘটিত হচ্ছে। অগ্রসর, সচেতন, বিবেকবান এক বুদ্ধিবৃত্তিক অংশ জন সমাজকে, দেশবাসীকে এ ব্যাপারে কমিউনিকেট করেছেন, কনশাস করেছেন, কনভিন্স করেছেন এবং এ্যাকটিভ করে তুলেছেন।

জনমত সম্পূর্ণ বিপরীতে থাকা সত্ত্বেও, সারা দেশে নজীরবিহীন প্রতিবাদ সত্ত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে হরতাল, কাফনের কাপড় পরে মিছিল, সারাদেশে হরতাল হওয়া সত্ত্বেও, এত বোঝানো সত্ত্বেও সরকার কেন জনমত ও দেশবাসীকে সম্পূর্ণ বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, তাচ্ছিল্য করে, দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিচ্ছে— শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতে আশ্রয় লাভকারী খুনীদের কাছে? কেন তাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে কল্পনাতীত আদর-আপ্যায়ন ও তোয়াজ-খাতির করে, সামরিক হেলিকপ্টারে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে এনে জামাই যত্ন করে এই অসম দেশবিরোধী চুক্তি করা হচ্ছে?

অবস্থা দেখে এও মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতীয় প্রভুদের একক ইচ্ছায় তাদের দালাল শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে চুক্তি হয়তো বা হয়েই গেছে। আগামী দিনে যে কোনো সময়ের বৈঠকে হয়তো বা একটি স্টেজ ম্যানেজড্ শো দেখানো হবে।

আই ওয়াশ হয়তো বা করা হবে। বর্তমান সরকারের ন্যায় একই আওয়ামী–বাকশালী দলীয় সরকার, ১৯৭২-৭৫-এর সরকার চুক্তি করে বাংলাদেশকে ভারতীয় কব্জায় রেখেছিলো এ যাবৎ — সাত দফা গোপন চুক্তি ও ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি করে। আবার, চুক্তি করে তারা বেরুবাড়ী দিয়ে দিয়েছে। আজ ২৫ বছর পার হয়ে গেলেও বেরুবাড়ীর বদলে তিন বিঘা ভারত দেয়নি। কেবল যখন ভারতের ইচ্ছা চার ঘণ্টার জন্যে মানুষ চলাচল করতে দেয় বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতায়। সার্বভৌমত্ব তিন বিঘায় ভারতের। পতাকা ওড়ে তাদের। সেনা সদস্য ও বিএসএফ পাহারা দেয় সেখানে। বাংলাদেশকে কাঁচকলা দেখিয়েছে তারা। এভাবে তালপট্টির ওপর সকল নিয়ম ভঙ্গ করে দখল নিয়েছে আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। ফারাক্কা দিয়ে বাংলাদেশকে শেষ করছে ভারত। ভারতীয় রাজ্যসভায় সদস্যরা, ভারতীয় কর্মকর্তারা, ভারতীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা সেচমন্ত্রী বাংলাদেশকে প্রাপ্য পানি দেয়নি বলে স্বীকার করলেও, মমতা ব্যানার্জীর মতো রাজনীতিবিদ ভারত বাংলাদেশকে পানি চুক্তির মাধ্যমে পানি থেকে বঞ্চিত করে ঠকিয়েছে বললেও, বাংলাদেশের আওয়ামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ক'জন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রী পানি পেয়েছেন বলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন এবং সাফল্যের খুশীতে উদ্বাহু নৃত্য করছেন। এদিকে পদ্মার বুকে চর, মানুষ হেঁটে যায়, বাস–গাড়ী চলে, চায়ের দোকান বসে, জনসভাও হয়, বাচ্চারা ডাংগুলি খেলে। ভারতের কাছ থেকে পানি না পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে চলতিপথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে অর্থাৎ জল বিয়োগ করে নদীতে পানি আনয়নের কথা বলে ব্যঙ্গ করে ক্ষোভ মিটায় লোকেরা। একজন নিবন্ধকার বেশ কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় এক নিবন্ধ লিখে তার সামনে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছিলেন।

ভারত উজান থেকে পানি প্রত্যাহার করে, অন্যত্র চ্যানেলাইজ করে আমাদেরকে দারুণ অন্যায়ভাবে প্রতারিত করছে। কখনো দেখাচ্ছে দীর্ঘদিনের তৃষিত নদীর পানি শুষে নেওয়ার ছেলে ভোলানো ফাজলামো অজুহাত। আর কখনো খেলা দেখাচ্ছে হিমালয়ের বরফ গলেনি এমন ধূয়া তুলে। বাংলাদেশের সরকার পক্ষ গলায় শিকল পরা অবস্থায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ডুগডুগির বাজনা শুনে লাফালাফি করে চলেছেন। এদিকে বাঁধ-গ্রোয়েন দিয়ে ভারত অভিন্ন আরো ৫৪টি নদীর পানি আটকে বা সরিয়ে নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে চতুর্দিক থেকে মেরে ফেলছে। এরপরও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে একান্তই ভারতীয় স্বার্থে, ইচ্ছায় ও দাপটে চুক্তি করা সাজে কি?

মনে পড়ে, ১৯৭১-এর পূর্বে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে যখন "ফারাক্কা মৃত্যুর পদধ্বনি" নাম দিয়ে বি এন আর থেকে বই প্রকাশ করেছিলেন ড. হাসান জামান (অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), তখন বলা হয়েছিল এটি পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত, এটি ভারতের বিরুদ্ধে অহেতুক শত্রুতা, এটি বাঙালীর স্বার্থ বিনাশের গুঢ় স্বার্থে মিথ্যা প্রচারমাত্র। কিন্তু হায়, আজ ফারাক্কা বাঁধ সত্যিই বাংলাদেশের জন্যে মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদেশের চূড়ান্ত মৃত্যুর পদধ্বনি শোনাচ্ছে।

বর্তমান লেখক আরেক ড. হাসানুজ্জামান (অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) তার কয়েক দফা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, তার যাবতীয় পড়াশোনা, খোঁজ-খবর, গবেষণাকর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমিনার করে, বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে, প্রচারপত্র দিয়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-দলের সঙ্গে মত বিনিময় করে পার্বত্য চুক্তির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আরো কিছু সহযাত্রী দেশপ্রেমিকের ন্যায় দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করার জন্যে নিরলস সচেষ্ট আছেন। কিন্তু দেশবাসী শুনেলেও, বুঝলেও সরকারী কাঠামোর যারা শোনার তারা শুনছে কি? কানে তুলো, চোখে ঠুলি কি এখনও তাদের নেই? তারা কি হাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে দেওয়ার গানই গাইছে না?

আবার ওদিকে বিরোধী দলগুলি ও তাদের নেতৃত্ব প্রতিবাদ করলেও, চেঁচালেও প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকর এবং বাস্তবে চুক্তি রোধকারী কিছু কর্মকাণ্ড চালাতে পারছে কি? পারছে কি,বা পারবে কি তারা চুক্তি ঠেকাতে? যদি না পারে তারা, যদি না শোনে সরকার, যদি শেষ পর্যন্ত হয়েই যায় চুক্তি, তবে দেশের যে ক্ষতি হবে তার জন্যে এরা পক্ষ-বিপক্ষ যার যার অবস্থান থেকেই দায়ী থাকবে। তখন অবশ্য কিছুই করা যাবে না। বেরুবাড়ী ও ফারাক্কার ন্যায় পার্বত্য চুক্তি বিষময় ফল দেবে। বাসি হলে গরীবের কথা ফলবে। যেমন ফলেছে আগের বারে ফারাক্কা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী, তেমনি ফলবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া সংক্রান্ত এবারকার ভবিষ্যদ্বাণী। শুধু দেশকে ভালবাসা, শুধু এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাখতে চাওয়া; শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদরাজি ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্বকে দেশের কল্যাণে যথাযথ ব্যবহারের স্বপ্ন দেখা; শুধু বঙ্গোপসাগরের জলরাশির উপর আমাদের অধিকারকে বজায় রাখা এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার গেইটওয়ে থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের একান্ত কাম্য বাসনা লালন করা; শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বদেশবাসী মুসলমান ভাই, বাংলাভাষী ভাইদের ন্যায্য অধিকার ও জীবন রক্ষার লড়াইয়ে সাথী হওয়া; শুধু দেশের সংবিধানের মর্যাদা ও কার্যকারিতা রক্ষা; শুধু আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার আগ্রহ; শুধু দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ — এই বাক্যে এর তাৎপর্যসহ বিশ্বাস করা; এবং সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে হাযির-নাজির জেনে ঈমানী দায়িত্ব, দ্বীনী দায়িত্ব, হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে সংঘটিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমরা। এ না হলে; এই বিপদে দেশ ও মানুষের পাশে না এলে সততা, যুক্তি ও প্রতিরোধের পক্ষে না দাঁড়ালে মানুষ হিসাবে আমাদের সত্যিকার পরিচয়ই লুপ্ত হবে।

তাই প্রশ্ন জেগেছে মনে। ১২ কোটি মানুষের এক সমস্যা সঙ্কুল দেশে, এত ঘন বসতির দেশে মাত্র ০.২২ ভাগ চাকমার উপর চেপে বসা ভারতীয় অর্থ-অস্ত্র-ট্রেনিং-গোলাবারুদ-সমর্থন-পশ্চাদভূমি ও সামরিক সহায়তা লাভকারী সন্ত্রাসী খুনী দেশদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে, সন্তু লারমা, উষাতন তালুকদার, রূপায়ন দেওয়ানের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে কেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার দেশের এক দশমাংশ (৫০৯৩ বর্গমাইল / ১৩২৯৪.৭১ স্কয়ার কিলোমিটার) সর্বাধিক সম্পদ-সমৃদ্ধ,

সম্ভাবনাময়, কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড তুলে দিতে চায়? উত্তর পাওয়া একান্ত দরকার। জানা দরকার, শান্তি বাহিনীর মেজর মলয় (উষাতন তালুকদার, ফিল্ড কমান্ডার) মেজর পেলে (তালুকদার, ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার), মেজর রূপায়ন দেওয়ান (রিপ, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক এবং বিদেশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত), মেজর অশোক (গৌতম দেওয়ান), মেজর মিহির (কালী মাধব), মেজর তাপস চাকমা, মেজর দেবাশীষ চাকমা, মেজর সমেশ চাকমা, মেজর সুধাসিন্ধু খীসা, মেজর উল্লাস, মেজর শংকর, মেজর ধীরেন, ক্যাপ্টেন নৈতিক, ক্যাপ্টেন অজিত চাকমা, মেজর বরুণ, ক্যাপ্টেন কমল, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অনল, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নিবিড়, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট প্ল্যানেট এরা কারা? এরা কোথায় থাকছে, কোথায় ট্রেনিং অস্ত্র, গোলাবারুদ পেয়েছে? ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে এদের কি সম্পর্ক তাও জানতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এত বাঙালী বাঙালী করেও, বাঙালী জাতীয়াতবাদের প্রবক্তা হয়েও কেন পাঁচ লাখ বাঙালীকে শান্তিবাহিনীর হায়েনাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। এভাবে আরো বোঝা যাবে, এই মুসলমান বাঙালীদের সম্পদ লুটপাট, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালানো, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, তাদের নারীদের ধর্ষণ, তাদের শিশুদের বিভৎসভাবে হত্যা করা, তাদেরকে আহত-নিহত করা, তাদের জমি কেড়ে নেয়া, তাদেরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা, তাদেরকে ঐ অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি কুকর্ম শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের দ্বারা এত বছর চলার পরও এখন আবার চুক্তি করে কেন বর্তমানে ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ সরকার এসব কিছু করার বৈধ লাইসেন্স তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে।

সরকার তো এক পক্ষকেই চোখে দেখছে। ভারতীয় স্বার্থ ও শান্তিবাহিনী তাদের কাছে মুখ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে তো অন্য পক্ষগুলিও আছে। সেখানকার বাঙালীদের কেন সরকার চুক্তিতে ডাকেনি? কেন সেখানকার আরো ১২টি উপজাতিকে বাদ দিয়ে সরকার কেবল সকল মাখন এ যাবৎ উদরস্থ করায় পটু ও সিদ্ধহস্ত এবং একচ্ছত্র সন্ত্রাসী চাকমা শান্তিবাহিনীরই সাথে কেবল গোপন আলোচনা ও গোপন চুক্তি করছে? চাকমারা তো সেখানে অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালীদের তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবে কেন তারা একক মোড়ল এবং আওয়ামী সরকারই বা কেন কেবল চাকমা শান্তিবাহিনী তোয়াজে ব্যস্ত?

কেবল চাকমাদের এবং এর মাধ্যমে ভারতকে খুশি করতে চেষ্টা করলে পরিণামে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালীদের মধ্যে বিদ্রোহী ও সশস্ত্র শক্তির আবির্ভাব যে ঘটবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? তাছাড়া কেবল চাকমাদের সঙ্গে চুক্তি তো অন্যদের অধিকার ও সুযোগ হরণ মাত্র। এতো রীতিমত অযৌক্তিক, অন্যায় ও অবৈধ। আবার দেশবাসীও কি কোনো চুক্তি আদৌ চেয়েছে? তারা শান্তির পক্ষে হলেও শান্তির নামে আরো বড় আইনী অশান্তি চায় না। তারা চায় না পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক। সরকারের সাহস থাকলে জনমত যাচাই করে না কেন?

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ২৬ বছর ধরে যে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী দেশ রক্ষা করলো, বিদ্রোহ দমালো, স্বাধীনতা বাঁচালো জীবন দিয়ে, ঘাম ও রক্ত দিয়ে, তাদের কোনো মতামত নেই কেন? এত বাঙালী মারলো, এত মুসলমান হত্যা করলো

যে–শান্তিবাহিনী, তাদের সঙ্গে দরকার না থাকা সত্ত্বেও নতজানু হয়ে গোপন চুক্তি করতে, তাদের হাতে দেশের এক-দশমাংশ তুলে দিতে সরকারের এতটুকু বিবেকে বাঁধছে না?

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এই গোপন চুক্তিতে যারা ইনসার্জেন্ট বা বিদ্রোহী পক্ষ; এদের নেতা সন্তু লারমা, উষাতন তালুকদার, রূপায়ন দেওয়ান আর এদের সহযোগী উপেন্দ্র লাল চাকমা বা হংসধ্বজ চাকমা — এদেরকে মোকাবিলা করতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবেচনায় তেমন প্রতিনিধি, যেমন এক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী, মেজর জেনারেল আবদুস সালাম এদের কাউকে বাংলাদেশ সরকার স্বীয় পক্ষে রাখেনি কেন? সালাম সাহেবের কথা উঠলেও কেন শান্তি বাহিনী মানেনি? লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খান, যার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তিনি তো শাসক দল আওয়ামী লীগের সদস্য, আওয়ামী লীগের এমপি, আওয়ামী লীগের জ্বালানী মন্ত্রী — তাকেও কেন রাখা হয়নি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনায়, চুক্তির খসড়া তৈরিতে ও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে? আবার চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বর্তমানে খাগড়াছড়ি রিজিওনের বিগ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আশফাক কিংবা রাঙামাটি রিজিওনের ৩০৫ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জহিরুল আলম — এদের যে কাউকে রাখা যেত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যথাযোগ্য আলোচনার স্বার্থে। কিন্তু তা না করে কেবল দলীয় চীফ হুইপ অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং প্রায়শঃই যিনি বলেন যে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর ভারতের অধিকার আছে সেই যোগ্যতাশূন্য চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন (যিনি ১৯৯৬-এ ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে চট্টগ্রামে সর্বাধিক তৎপর ছিলেন)কে কিভাবে সরকারী পক্ষে আলোচনায় সদস্য করা হল? ফলতঃ শান্তিবাহিনীর ইচ্ছা পূরণ তো হলই, তারা পুরোপুরি কর্তৃত্বও করলো। চুক্তিও গেল একতরফা তাদেরই পক্ষে। অন্ততঃ অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে।

আওয়ামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, তার ফুফাতো ভাই এবং তার দলীয় এক স্তাবক নেতা জানলেই কি চলবে গোপন চুক্তির শর্তাদি? দেশবাসীর কি কোনো অধিকার নেই? তারা কি কিছু জানবে না? এ কেমন কথা?

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা বলছেন, বিএনপি সদস্যরা এসে সহযোগিতা করলেই জানতে পারতো চুক্তিতে কি কি আছে। বিস্মিত হতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কথা ও বিবেচনা বোধ দেখে! তিনি ও তার লোকজন রাত-দিন বিএনপির নেত্রী ও অন্যান্যদের 'চোর' বলে ডাকবেন, তাদের বিরুদ্ধে সর্ববিধ হামলা-মামলা চালাবেন, সব কিছু স্বেচ্ছাচারীভাবে গোপনে করবেন আর অন্যদিকে সহযোগিতার কথা বলবেন, তাতো হয় না।

তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও তার লোকজন বা মন্ত্রীরা কিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে তাদের সঙ্গে এসে বিএনপি জানলেই সমাধান হয়ে গেল? দেশ কি প্রধানমন্ত্রীর দল ও বিএনপির পৈত্রিক সম্পত্তি যে, কেবল তারা দু'পক্ষ জানলেই হবে এবং আর কারো জানার কোনো অধিকার নেই? এতদ্ব্যতীত বিএনপি তো দেশবাসীকে গোপন চুক্তির কথা

জানানোর দাবিই তুলেছে। আর আসল ক্ষমতার অধিকারী তো সংবিধান অনুযায়ী জনগণ। এত সংবিধানের দোহাই দেন অথচ সেই সংবিধানের ৭(১) নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণ কর্তৃত্বের অধিকারী ; এই অনুচ্ছেদ ও সংবিধানের প্রস্তাবনা মতে জনগণের ইচ্ছায় সংবিধান অনুযায়ী সরকার দেশ চালাবে। জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি এই সংবিধানের সঙ্গে অসমঞ্জস যে কোনো আইন বাতিল হয়ে যাবে (৭ অনুচ্ছেদের ২ উপ অনুচ্ছেদ)। অথচ সেই জনগণকে, তাদের মতামতকে, তাদের ম্যান্ডেটকে, তাদের স্বার্থকেই তোয়াক্কা করছেন না। জনগণকে রেখেছেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আন্দোলন ও প্রতিরোধ দেখে বলছেন, বিএনপি জানলেই হলো। দেশ কি দলাদলি করে টোঁপের কায়-কারবার করে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপার? ভোটের সময় কি বলেছিলেন? কীভাবে হাত জোড় করে, তসবিহ নিয়ে, পট্টী মাথায় দিয়ে, ক্ষমা চেয়ে, চোখের পানি ফেলে, একটিবার মাত্র এতিমকে ভোট দেয়ার কথা বলেছিলেন — মনে নেই সেসব কথা? শপথ করেছেন তো সংবিধান রক্ষার, দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার, স্বীয় সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু না করার। এখন ভুলে গেছেন কি করে?

আরো বহু প্রশ্ন আছে। Treaty বা চুক্তি তো করবেন বিদেশের সঙ্গে। নিজের দেশের একেবারে হাতে গোনা বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতীয় দালাল সন্ত্রাসী, খুনীর সঙ্গে চুক্তি হয় কি করে?

আবার চুক্তি যখন করছেন, তা এত গোপনে কেন? কেন কেউ জানবে না তা পূর্বাহ্নে, তা সমাধাকালে? কেন প্রধানমন্ত্রী, তার ফুফাতো ভাই ও দলীয় এক নেতা জানলেই চলবে? যদি চুক্তিতে আপনাদের চিৎকার মতো খারাপ কিছু, দেশের স্বার্থ বিরোধী কিছু না থাকে তাহলে এত লুকাচ্ছেন কেন? সন্দেহ তো এ জন্যই হচ্ছে। তলে তলে কারবার সেরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তি বাহিনীর নামে ভারতের হাতে তুলে দিলে তখন দেশের কি হবে? তখন কার কি করার থাকবে? বড় মুখ করে তো বেরুবাড়ী দিয়েছিলেন। বদলে পেয়েছেন অশ্ব ডিম্ব। এই আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব বেরুবাড়ি দেওয়া ছাড়াও ১৯৭৪ সালে ৪১ দিনের জন্যে কেবল পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার জন্য ভারতকে সম্মতি দিয়েছিলেন। তার ফল তো দেখাই যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ মরুভূমি। এবার শেখ হাসিনা ৩০ বছরের জন্য ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি করে আরবিট্রেশন, গ্যারান্টি ক্লজ — সব বাদ দিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে এখন দেশের গলায় ফাঁস পরিয়েছেন। পানি আর এলো না। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলাদেশকে শেষ করে দিতে চাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হয়েও আজ ভারতের প্রদেশের মর্যাদায়, তাদের সমতলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি দাদার সঙ্গে কথা বলছে, তার কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। বাংলাদেশ কি ভারতের প্রদেশ? কেন বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের লেজে ধরা? কেন সরাসরি দিল্লীর সঙ্গে বসতে পারে না? এভাবে গ্যাস, বিদ্যুৎ, ট্রানজিট, করিডোর — সব ব্যাপারে বাংলাদেশের লেজে-গোবরে অবস্থা, ভারতের কাছে নতজানু নীতি। পানি চুক্তিতে ঠকার পিছনে স্বার্থান্ধ মতলববাজ মঞ্চ আমলার অযোগ্যতা ও কারসাজি ছিল। এবার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা কালেও খলনায়ক আমলাটি কর্তৃত্ব করছে। এ লোক যেমন ফারাক্কা বিষয়ে

বিশেষজ্ঞ নয় তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। অথচ কলকাঠি ঠিকই নাড়ছে। সেবা করে চলেছে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সংকীর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের এবং ভারতীয় প্রভুর। "বী এ রোমান হোয়াইল ইন রোম" তত্ত্বের সার্থক প্রবক্তা মঞ্চ-নায়ক আমলা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা দেশ ডুবিয়ে ছাড়ছে ও ছাড়বে। রাস্তায় মঞ্চ বানিয়ে যা পাবার তা তো পাওয়াই গেছে। এখন এই আগাছা আমলা অংশকে ঝেড়ে ফেললে আওয়ামী লীগ সরকারের মঙ্গলই হবে।

আরো প্রশ্ন আছে। সংবিধান অনুযায়ী লব্ধ ইউনিটারী রাষ্ট্রের চরিত্র কি সংবিধান লংঘনপূর্বক বদলে ফেলতে পারে আওয়ামী সরকার? যদি না পারে, তাহলে কীভাবে তারা সংবিধানকে শিকেয় তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতীয় স্বার্থের যোগানদার শান্তি বাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছে তাদেরই দাবী অনুযায়ী স্পেশাল স্টেটাস দিয়ে? আমাদের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থনে সংবিধান না পাল্টে কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া যায়? কী করে সেখানে রিজিওনাল কাউন্সিল করা যায়?

দেশের অন্যান্য উপজাতি বা সংখ্যালঘুরা বা দেশের অপর কোনো অঞ্চল যদি এ দ্বারা উৎসাহিত হয়, তাহলে কি হবে? তাদের এমন দাবীও কি মেনে নেওয়া হবে? ইতোমধ্যেই তো সিলেটে মনিপুরী ও খাসিয়াদের নেতৃত্ব দানের জন্যে, তাদের উপর বঞ্চনার ধূয়া তুলে তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে একটি খাসিয়া সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে লারমা ভ্রাতৃদ্বয়ের কায়দায়। এম.এন. লারমার মতো সিলেটের এই যুবকও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। একদিকে আসাম থেকে, শিলচর থেকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, পত্র-পত্রিকা সিলেটকে তাদের বলে দাবী তুলেছে, 'সিলেট দখল' আন্দোলন গড়ে তুলছে। অন্যদিকে সরকারও মাগুরছড়ার নাটক করে, রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিধ্বস্ত রেখে সিলেটে বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ গড়ে উঠতে সহায়তা দিচ্ছে। সিলেটের ঐ যুবক খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতা প্রয়াত টিলসন প্রধানের ছেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পাঠ শেষ করা ঐ পিভিশন প্রধান সুছিয়াং সিলেট অঞ্চলের খাসি, মনিপুরি, গারো, ত্রিপুরা, হাজং, ল্যাংগাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী দলের সমন্বয়ের কথা বলে "বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম" গঠন করে নিজে তার আহ্বায়ক হয়েছে। দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় এর উপরে সংবাদ, এর ছবি ও সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। এবার সিলেটে আরেক বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় দেখা দিলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। সিলেটের যাবতীয় সম্পদরাজি এবং তামাবিলে ইউরেনিয়ামের সম্ভাবনা — ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের চোখ পড়েছে গভীরভাবে। যেমন এই হায়েনাদের আরো আক্রমণ চলছে দেশের এক বিশাল অঞ্চলে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন নামে। তাহলে এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের আর থাকবে কি? ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের অখণ্ড ভারত ও রামরাজত্ব ; ভারতীয় বিজেপি-শিবসেনার, আদভানী-বাল থ্যাকারের "রাম আউর রোটি" তত্ত্ব, "গুজরাল ডকট্রিন" সব কিছু মিলে-মিশে একাকার হয়ে বাংলাদেশকে শেষ করতে উদ্যত। সত্যিই নেহরুর কথা মোতাবেক দেখা যাচ্ছে, বিভক্ত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বাংলা তারা মেনে নিয়েছেন, ঐ

পথেই আবার অখণ্ড ভারত গড়ে তোলা যাবে বলে। আর আমাদের সরকার এবং ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও উঠে-পড়ে লেগেছেন। ভারতীয় 'র'-এর টাকায় যারা সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন, কিংবা দেশে ও ভারতে যারা নানা ধান্ধা করে বেড়াচ্ছেন, যারা ইসলামের কথা শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, সেই দাদাপন্থী বুদ্ধিজীবীরা একইভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো দুই বাংলা এক করার কথাও বলছেন, আবার ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ভুল ছিল বলে সাতচল্লিশ-পূর্ব অবস্থায় ফেরৎ যেতে চাইছেন। এ দেশের ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ওপারের দাদাদের তুলনায়ও এক ডিগ্রী অধিক অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার সৈনিক সেজেছেন। এই ডামাডোলের মধ্যে পড়ে সুযোগ-সন্ধানী ও ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ বুদ্ধিজীবী কেউ একজন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে 'শহীদ' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। একজন খুনী, দেশদ্রোহী, ভারতের দালাল আজ শহীদ। আজকাল বাংলাদেশে হিন্দু শহীদও পাওয়া যায়। এমনকি নাস্তিক শহীদও পাওয়া যায়। নাস্তিকরাও মৃত নাস্তিককে শহীদ বলতে পিছপা হয় না। যদিও নাস্তিকরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, ইসলামকে ঘৃণা করে। অথচ 'শহীদ' শব্দটি কেবল ইসলাম ধর্মেরই পরিভাষা। ইসলামের cause-এর জন্যে যে জীবন দেয়, সেই কেবল শহীদ, অন্য কেউ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যে গোপন চুক্তি করছে, সে ব্যাপারে আরো প্রশ্ন আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকার ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল হচ্ছে জাতীয় অঞ্চল। কেবল ৪৪০.০৪ বর্গমাইল হচ্ছে বসতি এলাকা। এখন শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করে রিজিওনাল কাউন্সিল ও স্পেশাল স্টেটাসসহ সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে ওই ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল জাতীয় অঞ্চল যার মধ্যে রয়েছে বনাঞ্চল, পাহাড়ী অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল, কর্ণফুলী হ্রদ, খাস জমি, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও শিল্পাঞ্চল, খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা — এগুলির উপর বাংলাদেশ অর্থাৎ জাতীয় সরকার বাস্তবে কর্তৃত্ব হারাবে না কি?

সমগ্র বাংলাদেশের উপর বিশাল জনসংখ্যার চাপ যাচ্ছে। এখন দেশের ১২ কোটি মানুষকে গড়ে ৩০০০ জন প্রতি বর্গমাইলে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি বর্গমাইল ১৯০ জন রাখার কোনো মানে হয়? আরো এক কোটি সমতলবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠাঁই করে দেওয়া যায় অনায়াসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সময় ছিল চট্টগ্রাম জেলার ভিতর। ১৮৬০ সালে আলাদা করা হয়েছে। সারা জীবন এটি ছিল বাংলাদেশের ভিতরে, সেই প্রাচীন হরিকেল জনপদ থাকা অবস্থায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের কন্টিগিউআস্ টেরিটোরি। কাজেই, কেন বাংলাদেশীরা নিজ দেশের এক অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে, বসবাস করতে, স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না? সংবিধানের ৩৬ এবং ৪২ ধারার মৌলিক অধিকারের বলে কেন তারা সেখানে জমি-জায়গা কিনতেও পারবে না? কেন তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকবে? কেন তারা চাকমা শান্তিবাহিনীর দ্বারা অত্যাচারিত হবে, হত্যার শিকার হবে? কেন তারা নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবে? কেন বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ হয়েও, চাকমা ও অন্যান্য উপজাতির তুলনায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সেখানে একজন চাকমার প্রাপ্ত সুবিধার ২১ ভাগের এক ভাগ পাবে? কেন তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হবে? সংবিধানের মৌলিক

অধিকারের ২৯ এবং ৩১, ৩২ অনুচ্ছেদের সুযোগ কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী মুসলমানরা পাবে না?

শান্তিবাহিনীর ও জনসংহতির স্বায়ত্ত্বশাসনের সঙ্গে আরেকটি দাবী হচ্ছে বাঙালী উচ্ছেদ। কোন্ সাহসে চাকমা সন্ত্রাসী ভারতীয় দালাল শান্তিবাহিনী এই দাবী তোলে? আর কেনই বা তাতে সায় দেওয়া হয়? চাকমারাসহ কোনো উপজাতিই এ দেশের আদিবাসী নয় (দেখুন, বর্তমান লেখকের প্রকাশিত গবেষণাকর্ম– "পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ চাকমা প্রতারণা, লুক্কায়িত স্বার্থ এবং প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি", ১৯৯৭)।

তারা আরাকান বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, কেউবা আরো দূর থেকে এসেছে। তারাই অনুপ্রবেশকারী, অভিবাসী, পরদেশী, তারা এখানকার ভূমিপুত্র নয়। কোন্ সাহসে বাংলাদেশের রাজধানীতে চুক্তি করতে বসে শান্তিবাহিনী বাঙালীদেরকে নিজ দেশে 'বহিরাগত', 'সেট্লার' বলে অভিহিত করে এবং বাঙালীদের বহিষ্কারের দাবী তোলে? কেন সরকার এ অবস্থাকে সহ্য করে?

এখানেই শেষ নয়। এই চুক্তির মাধ্যমে আরো সমস্যা হবে। ভারতীয় চাকমারা এখানে চলে আসবে এবং চাকমা মেজোরিটি তৈরি করে কেবল "জুম্মল্যান্ড" নয়, বরং বাংলাদেশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ভারতীয় সামরিক সহায়তায় বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন "চাকমাল্যান্ড" বানিয়ে ফেলবে। বস্তুতঃ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের, গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এবং ভারতীয় এ্যানালিস্ট ও পত্র-পত্রিকার ভাষায় "জুমল্যান্ড" বদলে গিয়ে "চাকমাল্যান্ড" কথাটি এসে গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

শান্তিবাহিনীর দাবী অনুযায়ী তাদরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর একচ্ছত্র অধিকার, কর্তৃত্ব ও মালিকানা দেওয়া যায় না। এটি সংবিধান বিরোধী, মৌলিক অধিকার বিরোধী, দেশবাসীর অধিকার হরণের সামিল। ভূমির উপর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে তথাকথিত শান্তিচুক্তির ফলে রিজিওনাল কাউন্সিলের কাছে যে পরিমাণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হবে, যেসব বিষয় তাদের হাতে চলে যাবে তার ফলে সেখানে শান্তিবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে। বাঙালী মুসলমান ও অন্যান্য উপজাতি নিগৃহীত হবে, হত্যা ও বহিষ্কারের শিকার হবে। পরিণামে আরো গোলযোগ, হানাহানি, গণহত্যা এবং এমনকি গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

এই চুক্তির ফলে কাপ্তাই হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্থাপনাসহ অন্যান্য বিশাল রাষ্ট্রীয় স্থাপনাসমূহ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ-খনিজ-মৎস্য সম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপস্থিতিতে চট্টগ্রামের পুরুত্ব (Thickness)-এর সুবিধা ইত্যাদি হারাবে বাংলাদেশ। ভারত সাত বোন রাজ্যের ল্যান্ড ব্লকড্ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। ঐ অঞ্চল থেকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সম্পদরাজি এক্সপ্লোর করার সুবিধা পাবে। সাত বোন রাজ্যের বিদ্রোহ দমনের সুযোগ পাবে। কলকাতা বন্দর নিয়ে ভারতের অসুবিধা দূর হবে। চট্টগাম বন্দরের উপর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারত ত্রিপুরা-মিজোরাম থেকে এসে সোজা বঙ্গোপসাগরে যাবার পথ বের করবে। বঙ্গোপসাগরের জলরাশির উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। মায়ানমারের সঙ্গে স্থলপথে বাংলাদেশের

সংযোগ সম্ভাবনা ভারতীয় প্রভাবাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের কারণে বিচ্ছিন্ন ও তিরোহিত হবে। চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতে বা যুদ্ধে চিকেন-নেক শিলিগুড়ি করিডোর হারালে বা বিধ্বস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে চীন থেকে দূরে ভারত একটি বড় পশ্চাদভূমি পাবে। সাত বোন রাজ্যে সামরিক ও অন্যান্য সরবরাহ ও যাতায়াত সে স্থল ও সমুদ্র পথে করতে পারবে এখনকার মারাত্মক অসুবিধা কাটিয়ে উঠে।

এদিকে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল সম্ভাবনাময় সম্পদরাজি হারাবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য স্থাপনাগুলি হারাবে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের খপ্পরে চলে যাবে। চট্টগ্রাম পোর্টের উপর বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ হারাবে, ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। এদিকে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন জোরালো করে ভারত খুলনার চালনা বন্দরকেও নিয়ন্ত্রণে অভিলাষী। তাহলে বাংলাদেশের থাকলো কি? বাংলাদেশ এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতের থাবায় পড়ে কাশ্মীর, সিকিম, হায়দরাবাদ, জুনাগড়, মানভাদারের অবস্থায় চলে যাবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর দিয়ে বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেইটওয়ে। দূরপ্রাচ্যেও বাংলাদেশ যেতে পারে। ওদিকে বার্মা বা মায়ানমার দিয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সম্ভাবনাময় এশিয়ান হাইওয়ে করে বাংলাদেশ সহজেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ মায়ানমারের পথে ভারতের কোনো খবরদারীরও সুযোগ নেই। এসব সুযোগ সব নষ্ট হবে শান্তিচুক্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হলে। ভারত যে কত ছোটলোকী, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিবেশীদের ব্যাপারে চণ্ড নীতি প্রদর্শন করতে পারে তার প্রমাণ তো এই মাত্র ক'দিন আগেই দেখা গেল। নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রানজিট-এর বিষয়টি চালুর দিনই ১৫ মিনিটের মাথায় বাতিল করে দিল ভারত একতরফাভাবে, গায়ের জোরে। বাংলাদেশের নতজানু সরকার বাহাদুর কিছুই বলতে পারলো না।। আর এমনটি হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় এজেন্ট শান্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তথায় আমাদের সরকারের আদৌ কিছু করার থাকবে কি? ভারতীয়রা যেমন জানিয়েছে তাদের দরকার ট্রানজিট-করিডোর, বাংলাদেশের গ্যাস-বিদ্যুৎ, চট্টগ্রাম পোর্ট, তেমনি শান্তিবাহিনীর নেতারাও, চাকমা বুদ্ধিজীবীরাও একইভাবে ভারতের পক্ষে দাবী উঠিয়েছে। এছাড়া এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ দেশের কিছু দেশদ্রোহী ভারতীয় দালাল বুদ্ধিজীবী। এই ত্রিচক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে এবং এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার, পোর্ট, বঙ্গোপসাগরের আমাদের পানি সীমাকে ভারতের দখলে নেবেই।

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তির আরেক দিক হচ্ছে, বাংলাভাষীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতে সন্তু লারমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রিজিওনাল কাউন্সিলের অনুমতি লাগবে। এটি কি এক দেশের মধ্যেই 'ভিসা' ব্যবস্থার সমার্থক নয়? অথচ আশ্চর্য, চাকমারা সারা বাংলাদেশে যেখানে ইচ্ছা যাবে, চাকরী করবে, ব্যবসা করবে, কোটার জোরে ছাত্রত্ব-বৃত্তি-চাকরী-ঠিকাদারী-ব্যবসা আদায় করবে। কিন্তু নিজ দেশে বাংলাভাষীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে পারবে না। কেন এমনটি মেনে নেওয়া হবে? বাংলাদেশ কি ভারতীয় ও শান্তি বাহিনীর হায়েনাদের কাছে গরীবের বউ, যে যখন ইচ্ছা ইজ্জত নিয়ে টান দেবে?

চাকমারা, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এখন মহানন্দে আছে। তারা এত বছর যাবৎ এককভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাখন খেয়েছে উপজাতীয় ও পাহাড়ীদের নাম ভাঙ্গিয়ে, এখন তারা ভারতেও সুবিধা পাচ্ছে, বাংলাদেশেও সুবিধা পাচ্ছে এবং এখানে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) একজন বাঙালী অপেক্ষা একুশ গুণ বেশি সুবিধা পাচ্ছে। এরপর তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের একক কর্তৃত্ব মুফ্‌তে পেয়ে ঐ অঞ্চলে "চাকমাল্যান্ড" কায়েম করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ সংবিধানের 'প্রজাতন্ত্র'-এর সংজ্ঞা, 'জাতীয়তা'র সংজ্ঞা, সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারের ৩৬ নাম্বার ও ৪২ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তারা কি উপরোক্ত অবৈধ সুযোগ ছিনতাই করতে পারে? বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে পশ্চাদপদ অংশের উন্নয়ন প্রশ্নে ২৮ (১, ২, ৩) অনুচ্ছেদ বাধা হবে না বলে যে ঘোষণা রয়েছে, সেটির সুযোগ তো চাকমারা পেতে পারে না। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা ৭২% শিক্ষিত, বাঙালীরা ২০%। কোথাও বা ১০% এরও কম। অন্যান্য উপজাতিদের সামান্য কিছু ব্যতিক্রম (মারমা) বাদে একই অবস্থা। অর্থনৈতিকভাবেও চাকমারা এগিয়ে, চাকরী-বাকরীতেও। তাহলে পশ্চাদপদ অংশ সেখানে তো বাঙালীরা; পাংখো, বোম ও অন্যরা। সুতরাং পশ্চাদপদ অংশের উন্নয়ন করতে হলে চাকমাদের নয়, পার্বত্য বাঙালী ও ক্ষুদে উপজাতিগুলিরই করতে হবে।

এছাড়া এতগুলি বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সকল থানায়, ইউনিয়নে এবং আরো পরের স্তরের যে অভূতপূর্ব উন্নতি করলো বাংলাদেশের সরকার বহু হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তার ফল চাকমারা ভোগ করে এখন কেন ঐ উন্নত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করবে? এই যে শিক্ষার হার এত বাড়লো, আধুনিকতা এলো; এই যে এত হাসপাতাল হলো, মর্টালিটি রেইট কমলো, আয়ু বাড়লো; এই যে স্কুল, কলেজ, মিলনায়তন, মার্কেট, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় স্থাপনাসমূহ হলো; এই যে স্টেডিয়ামগুলি হলো; এই যে সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি হলো; এই যে বিশাল রোড নেটওয়ার্ক হলো; এই যে কর্মের এত সংস্থান হলো; এই যে সামরিক বাহিনীর ভাষায় শান্তি রক্ষার পাশাপাশি ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, শিক্ষা, সচেতনতার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল কাজ করা হলো এবং এখনও করা হচ্ছে— এগুলির পর চাকমারা বঞ্চনার দাবি তোলে কীভাবে? বর্তমান লেখক নিজে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা কেন্দ্রগুলি এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে ঘুরে চাকমাদের অবস্থাও দেখেছেন আর সেখানকার বাঙালী ও অন্যান্য উপজাতির অবস্থাও দেখেছেন। বলাবাহুল্য, বাঙালীদের মুখে হাসি নেই। আতঙ্কে, টেনশনে, অনিশ্চয়তায় ও আসন্ন সমূহ বিপদের সম্ভাবনায় তারা পাগলপারা হয়েছে। ওদিকে দাপটের সাথে আছে চাকমারা। লেখক আরো দেখেছেন, ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৯৩, ১৯৯৫-এর তুলনায় ১৯৯৭-এ রাস্তা-ঘাট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কি অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। এত কিছুর পরও ভারতীয় চরদের, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের কল্প-কথাকে মেনে নিতে হবে কেন? ১৯৮৯ সালেই তো এরশাদ সরকার চাকমাদেরকে আইন করে স্থানীয় পরিষদ করে স্থানীয়ভাবে এত কর্তৃত্ব দিয়েছে যে, তাদের দাবির বাড়াবাড়ি আজ চরমে উঠেছে।

খাগড়াছড়ি সাবডিভিশন (বর্তমানে জেলা) মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং ১৯৭১-১৯৯২ এই বাইশ বছর ধরে আওয়ামী লীগের খাগড়াছড়ি শাখার সভাপতি আলহাজ্জ্ব দোস্ত মোহাম্মদের ভাষায়, ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে চাকমাদের বিপরীতে তিনি যেন "মমি করে শো-কেসে রাখা" অবস্থায় ছিলেন (বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ — খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউস, ৩০/৯/৯৭)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপন চুক্তির মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তথায় অত্যন্ত গভীর অরণ্য ও পাহাড়ী অঞ্চলের ও সীমান্ত প্রদেশের ভূখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে খুবই জরুরী ৭৩টি হেলিপ্যাডের অবস্থা কি হবে? বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একবার ফিরে এসে যাতে সেখানে না যেতে পারে, সেজন্যে হেলিপ্যাডগুলিই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারপর পায়ে হেঁটে বা যেভাবেই হোক সেনাবাহিনী সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করলে এ্যামবুশ করে শেষ করা হবে। পিছনে কাভার দেবে ভারতীয় সেনাশক্তি।

আবার, শান্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব পেলে খাগড়াছড়ি জেলার পশ্চিম পাশে ভারতের ত্রিপুরা বর্ডারের ২৩৭ কিলোমিটার; রাঙামাটি জেলার পূর্ব পাশে ভারতের মিজোরাম বর্ডারের ১৭৬ কিলোমিটার— এ বিশাল এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ওদিকে রাঙামাটি জেলার কিছু অংশ এবং বান্দরবান জেলার পূর্ব পাশে মায়ানমারের সাথে যে ২৮৮ কিলোমিটার বর্ডার, সেটিও কন্ট্রোল করবে শান্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাশক্তি। খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় থানার ফেনী নদীর ৩০/৩৫ ফুট পানি-সীমার ওপারের দিক থেকে ভারতীয় সামরিক শক্তি অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ পাবে। তাই, কীভাবে বাংলাদেশের আওয়ামী সরকার এ আত্মঘাতী চুক্তি স্বাক্ষর করছে, তা বোঝা দুষ্কর। মনে রাখতে হবে, চোরাচালানী, অস্ত্র আনাগোনা, নারী পাচার, ড্রাগ ট্রাফিকিং — এ অবস্থায় চরমে পৌঁছাবে। বাংলাদেশ হবে এক শকুনের ভাগাড় — পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে।

শান্তিবাহিনীর ৪৫টি সশস্ত্র অবস্থান বা ক্যাম্প এখন ঘিরে আছে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং পরোক্ষভাবে কিছুটা দূর থেকে হলেও বান্দরবানের বর্ডারিং এরিয়ার সন্নিকটস্থ ভারতীয় অংশ থেকে। এগুলি দিয়ে তখন ভারতীয় সেনাশক্তি বাংলাদেশে ঢুকবে। শান্তি বাহিনী এবং ভারতের শান্তিবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকরা (যেমন তথাকথিত হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরাম) এখনই সরাসরি ভারতীয় হস্তক্ষেপ দাবি করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে। বোঝাই যায়, চুক্তির পর শান্তি বাহিনীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এলে এদের চাপ কি পরিমাণ বাড়বে।

প্রকাশ্যে শান্তিচুক্তি হবার আগেই বেশ কিছু দিন (গত কয়েক বছরের হিসাবগুলি বাদ দিয়ে) ধরে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, রামগড়, মানিকছড়ি, পানছড়ির বাংলাভাষী মুসলমানদের উৎখাত করে, এ দেশের আসল নাগরিকদের বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, বাগান-পুকুর, দোকান-পাট থেকে উচ্ছেদ করার কাজ চলছে নিষ্ঠুরভাবে। সম্পত্তিশূন্য, কপর্দকহীন, ঘরবাড়ী হারা হয়ে যাচ্ছে বাংলাভাষীরা। হাজার হাজার পরিবার, রাতারাতি আশ্রয়হীন ভিক্ষুক হয়ে যাচ্ছে। এরা গুচ্ছগ্রামে মানবেতর জীবনে যাচ্ছে বা বহিষ্কৃত হচ্ছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা থানা এলাকা থেকেও বাঙালীদের ব্যাপক হারে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরা থেকে আগত উপজাতীয় শরণার্থীদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাঙালী শাসন কর্তৃপক্ষই শান্তির নামে শান্তিবাহিনীকে খুশী করতে একাজ করছেন। এ-ও দেখা যাচ্ছে, এমন উপজাতীয়কে এমন জায়গায় নির্দ্বিধায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে সে আদৌ ছিল না। তাছাড়া ভারতের অনেকেও এ সুযোগে চলে আসতে পারছে। এছাড়া এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটিতে মসজিদ দখল হচ্ছে, মাদ্রাসা দখল হচ্ছে। চাকমারা এসব করছে। তারা বলছে মসজিদ ভেঙ্গে কিয়াং বানাবে।

দেখা যাচ্ছে, শান্তিবাহিনীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার আগেই বাঙালীরা যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিষ্ঠুর উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে, তাহলে শান্তিবাহিনীর দখল এসে গেলে তা যে কোন্ মাত্রায় উঠবে, সেটি সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাভাষী ও মুসলমান-মুক্ত হতে যাচ্ছে। এরপর যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হয় রিজিওনাল কাউন্সিলের কর্তৃত্বে; যদি শান্তিবাহিনীর দাবী মোতাবেক চুক্তিতে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাদের কর্তৃক পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত নিয়োগ দানের অধিকার, তাহলে আর দেখতে হবে না। শান্তিবাহিনীর সদস্যরাই অচিরে সাব-ইন্সপেক্টরসহ পুলিশের পদসমূহ দখল করে সম্পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতীয়দের উপর, বাংলাভাষী মুসলমানের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তাদেরকে নিধন অথবা বহিষ্কারের কাজ সম্পাদন করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী এত দিনও চাঁদা আদায় করছিলো কোটি কোটি টাকা। এখন তারা রীতিমতো ট্যাক্স কালেক্ট করছে। প্যারালাল গভর্নমেন্ট বসেছে সন্তু লারমার। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ির দুদুকছড়িতে এখন সন্তু লারমার শান্তিবাহিনী সরকারের রাজধানী চলছে। আর ঢাকায় চলছে অবশিষ্ট বাংলাদেশের রাজনীতি। দৈনিক ইনকিলাবের এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে এমন চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে (১৮ নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্যবাহিনীও উইথড্র করা হচ্ছে। সরকার যেমন বলছেন সংবিধান লঙ্ঘন করে কিছু করবেন না এবং চুক্তি হবেই, অথচ বাস্তবে সংবিধানকে পদদলিত করছেন; তেমনি সরকার মুখে অস্বীকার করলেও বাস্তবে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন ধরে। রাঙামাটির বরকল, খাগড়াছড়ির লোগাং, খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙা, সদর থানার কুমিল্লা টিলা, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, মারিস্যার সেনা ক্যাম্প এবং বান্দরবান জেলার কিছু সেনা চৌকি তুলে নেওয়া হচ্ছে। আরো অনেক প্রত্যন্ত প্রদেশে থেকে সেনা প্রত্যাহার চলছে। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, দুদুকছড়ি ও পানছড়ি থেকে ১৩টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ জন্যেই এসব জায়গায় শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির হাজার হাজার সশস্ত্র সদস্য অবস্থান নিয়েছে। সন্তু, রূপায়ন, উষাতন চালাচ্ছে দুদুকছড়ি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব। পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও অন্যান্য সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিও আছে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জলপাই রঙের সামরিক পোশাক পরে ঘোরা-ফেরা করছে। দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে—"পানছড়ির দুদুকছড়িতে ভারতের ঊর্ধ্বতন

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সেনা বিশেষজ্ঞরা অবস্থান নিয়ে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছে এবং বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও রণকৌশলগত দিক নির্ণয় করছে"। মাটিরাঙায় শান্তি বাহিনীর দখল খুবই পোক্তভাবে হয়েছে। ইউনিয়ন নির্বাচন তারা কন্ট্রোল করছে। মাটিরাঙা থানার শহরের পাশে ওয়াসু, সাতমারা,তৈ কাথাং ও দলদলি মৌজা সম্পূর্ণ শান্তিবাহিনীর দখলে চলে গেছে (দৈনিক দিনকাল, ২১ নভেম্বর ১৯৯৭। মাটিরাঙা সীমান্ত থেকে প্রেরিত প্রফুল্ল দত্ত এবং অলি আহমদের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য) এদিকে খাগড়াছড়ি থেকে আরো আট হাজার বাঙালী পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। বাঙালীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে (দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৭। লীড এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

এমতাবস্থায় বর্তমান লেখকের মনে পড়ছে ০১-১০-৯৭ তারিখ রাঙামাটির কাপ্তাই লেইক পেরিয়ে ইসলামপুর নামক মানবেতর গুচ্ছগ্রামে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়ে আসা মানুষদের ভীড়ে মোসলেম খাঁ (ক্ষুদে ব্যবসায়ী)-এর উক্তি। তিনি বলেছিলেন, শান্তি চুক্তির পরও বিপদ হবে। সরকারের শান্তিচুক্তি নিয়ে তাদের সন্দেহ রয়েছে। তিনি ও তার সঙ্গে লোকেরা প্রশ্ন রেখেছিলেন, সরকার কেন বাঙালীদের, মুসলমানদের বাদ দিয়ে কেবল শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করছে। তারা উপজাতি-বাঙালীর সমতার দাবি তুলেছিলেন আলাপ চলাকালে। যাহোক, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার প্রসঙ্গে মোসলেম খাঁর উক্তি ছিল ঃ "সেনাবাহিনী চলে গেলে পাবলিক কেন, কুকুরও থাকতে পারবে না" (লেখকের সঙ্গে আলাপকালে, ০১-১০-৯৭ তারিখে রাঙামাটির ইসলামপুর গুচ্ছগ্রামে)।

আজ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে হবার আগেই, সামরিক বাহিনী খানিকটা প্রত্যহার করতে না করতেই বাঙালীদের উপর অত্যাচার চরম মাত্রায় পৌছেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, ঠিকাদার, বাস-ট্রাক-টেম্পো-মটর সাইকেল সবকিছু থেকে পুরোদস্তুর নিয়মিত ট্যাক্স উঠানো হচ্ছে আগের চেয়েও বেশি। কোনো ট্রাক-বাস আজ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটিতে চলতে পারে না। শান্তিবাহিনীর টোকেন ছাড়া। দুদুকছড়িতে শান্তিবাহিনীর সচিবালয় বসেছে (দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৭)।

এরপর অচিরেই যদি চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে যায়, তাহলে পার্বত্য মুসলমানরা, বাংলাভাষীরা সেখানে থাকতে পারবে না একেবারেই। সন্তু, রূপায়ন উষাতনই নয়; লিয়াজোঁ কমিটির নেতা হংসধ্বজ চাকমা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা, রিফিউজী রিহেবিলিটেশন টাস্ক ফোর্সের নেতা অক্ষয় কুমার চাকমাই নয়; নয় কেবল প্রসীত খীসা, সঞ্চয় চাকমা। এদের থেকে শুরু করে খাগড়াছড়িতে বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ কালে মেজর জয়েস চাকমাও এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন (৩০/৯/৯৭ তারিখ সকালে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে)। শান্তিবাহিনীর উপরস্থ ও অধীনস্ত সকল সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদীই মুসলমান ও বাংলাভাষী-মুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আদতে তাদের স্বাধীন জুম্মল্যান্ড বা চাকমাল্যান্ড গঠনে বদ্ধপরিকর। লক্ষণীয় যে, জনসংহতির আদি পাঁচ দফার মধ্যে ছিল ৪৭ দফা বিস্তৃত দাবী। এখন ঐ মূল পাঁচ দফা উনিশ দফা পর্যন্ত গড়িয়েছে। দিনে দিনে নিত্য নতুন দাবি উঠাচ্ছে তারা। অতএব, যদি অশুভ চুক্তি করে ফেলা হয়, যদি শান্তিবাহিনীর কাছে মাথানত করা হয়, যদি ভারতীয়

চক্রান্তের বাস্তবায়ন ঘটানো হয় পূর্ণ মাত্রায়, যদি শান্তিবাহিনী নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া হয়, যদি সন্তু পায় মন্ত্রীর মর্যাদা, যদি পুলিশ ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর তাদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদি বাঙালী উচ্ছেদ অব্যাহত থাকে, যদি শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র সমর্পন পুরোপুরি না ঘটে, যদি সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তাহলে এত কিছুর পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের থাকবে, ভারতীয় কব্জায় যাবে না— এমনটি ভাববে কেবল আকাট মূর্খ বা অতি মতলববাজ কেউ।

কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবার আগে এই শেষ মুহূর্তে হলেও দেশবাসী এগিয়ে আসুন। প্রতিরোধ করে, লড়াই করেই রক্ষা করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে। সর্বোচ্চ গণ প্রতিরোধ সংগ্রাম ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ্ হাফিজ।

রজব ১৪১৮ হিজরী, অগ্রহায়ণ ১৪০৪ বাংলা, নভেম্বর ১৯৯৭ ঈসায়ী।

পার্বত্য জেলা বাঙালী ছাত্র আন্দোলন পরিষদ-এর 'রক্তাক্ত জনপদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ। জাতীয় প্রেস ক্লাব, ভিআইপি লাউঞ্জ, ২৪ নভেম্বর ১৯৯৭, সোমবার, বিকাল ৩-৩০।

সাপ্তাহিক বিক্রম, একাদশ বর্ষ শুরু সংখ্যা, ২-৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ শান্তিবাহিনী ও ভারতীয় অবৈধ সংযোগ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

ভারতীয় অবৈধ সংযোগ ঃ পিছন থেকে আজ অবধি

পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিরাগত উপজাতীয়রা বিশেষতঃ চাকমারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এর বিরোধিতা করেছিল। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান পাকিস্তানের সঙ্গে নয়, বরং হিন্দু ভারতের সঙ্গে যুক্ত দেখতে ও করতে চেয়েছিল। আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায়সহ চাকমাদের মূল অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। চাকমাদের এই আপাতঃ পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ভূমিকায় এক পরম্পরা ও সঙ্গতি ছিল। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তান থেকে সেকালে এবং বাংলাদেশ থেকে একালে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতার আবরণে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ভারতের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল একমুখী। অর্থাৎ ভারতের অবৈধ সহায়তা নিয়ে হয় বিচ্ছিন্ন-স্বাধীন হওয়া, নতুবা ভারতের সাথে মিশে যাওয়া।

এটি আজ ইতিহাস যে, বহু দাবির ফলে লব্ধ ১৯০৫-১৯১১ এর পর্যায়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত এতদঞ্চলের মুসলমানদের বৃহত্তর সত্তাকে ধ্বংস করেছে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু চক্র ও কংগ্রেস, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির চরম প্রাধান্যশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত হয়নি লেজিসলেটিভ এসেমব্লিতে বারংবার ভোটে সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও কেবলই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের সঙ্গে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ, ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন ও বিশেষতঃ লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর সম্পর্ক, যোগাযোগ ও শেষোক্ত জনের প্ররোচনায় লেডি কর্তৃক তার স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তারের প্রেক্ষাপট, মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল করার উৎকোচসহ বাউন্ডারী কমিশনের স্যার সিরিল রেডক্লীফের ভূমিকা ইত্যাদির কারণে। কেবল অসম্পূর্ণ পাকিস্তানই নয়, 'মথ ইটেন এ্যান্ড ট্রাংকেটেড' বাংলাদেশও আমরা ১৯৪৭ সালে পেয়েছি যুগপৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ ও হিন্দু ব্রাহ্মণবাদী দলের ভূমিকার কারণে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রক নেহরু অবশ্য ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তার বক্তব্য ও পত্রে একথা না

লুকিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, বিভক্ত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বাংলা তারা মেনে নিয়েছেন কেবল ঐ পথেই পুনরায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন বলে।

আর বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা নেতারা ঐ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা কর্মসূচীরই সহায়ক শক্তি। একথা এরা তাদের গৃহীত অবস্থান, ভূমিকা, আচরণ এবং পূর্বাপর যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড দ্বারা একেবারেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই অবস্থা অবশ্যই বরাবর দ্বিমুখী সূত্র ও সহযোগিতাই নির্দেশ করেছে। যেমন চাকমারা উৎসাহ প্রদর্শন ও তৎপরতা চালিয়েছে, তেমনি সহযোগিতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত মাতব্বরী প্রদর্শন করেছে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের প্রতিটি সরকার একের পর এক সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আজ ১৯৯৭ সাল অবধি।

উনিশ শত চল্লিশের দশকের শুরু থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন অনেক উপজাতীয় নেতা দিল্লী, বোম্বে (মুম্বাই) ও কলকাতা সফর করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাকমা নেতা দু'জন ছিলেন স্নেহ কুমার চাকমা এবং কামিনী মোহন দেওয়ান। এ দু'জন নেতা কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, আচার্য কৃপালিনী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুলেছিলেন। এ সময় কংগ্রেস নেতা এ.বি. ঠক্কর সহ অন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিধিদল নিয়ে এসে সেখানকার উপজাতীয়দের ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে প্রকাশ্যে প্রবল প্রচারণা চালায়। কিন্তু একদিকে কংগ্রেস ভারতের পক্ষে আরও অনেক সুযোগ রেডক্লীফের সীমানা কমিশন থেকে হাতিয়ে নেওয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরাসরি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৬ সালে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চাকমা উপজাতীয় নেতারা "The Hillmen Association" গঠন করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি উঠান যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে একান্তই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলে যেন কুচবিহার, ত্রিপুরা, খাসিয়ার ন্যায় রাজা-শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে একটি আলাদা কনফেডারেশন গঠন করা হয়, যেটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত হবে।

যাহোক, স্যার সিরিল রেডক্লীফ এওয়ার্ড বা রেডক্লীফ রোয়েদাদ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম তৎকালীন পূর্ব বাংলার সঙ্গে থেকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেই থেকে আজ অবধি চাকমা নেতারা বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেনি। ষাটের দশকে কাপ্তাই হ্রদ প্রকল্প সৃষ্ট সমস্যার সমাধান প্রয়াস সত্ত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কাজ সত্ত্বেও চাকমা নেতারা নিজেদেরকে এ অঞ্চলের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত করেনি। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধিতাও সেজন্যে ঘটেছে তাদের তরফ থেকে। আর চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তো ব্যক্তিগতভাবে আজো পাকিস্তানপন্থী। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশী জাতিসত্তার বদলে বাঙালী জাতিসত্তার বিষয়টিকে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা দিলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (১৯৭২-৭৫ এ সংসদ সদস্য) এর প্রতিবাদ করেন, শেখ মুজিবের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যান, স্মারকলিপি দেন। এসব প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনকালেই আন্ডারগ্রাউন্ড-এ গিয়ে

১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী তারিখে সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। সেই ১৯৭৩ সালেই এই শান্তিবাহিনী মোকাবিলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের শৃঙ্খলা, অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্যে শেখ মুজিব বিধি করে তথায় পুলিশ ডেপ্লয় করেন। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব সরকার আর্মী ডেপ্লয় করেন, যা আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে (দ্রষ্টব্য— "The Chittagong Hill Tracts : Falconry In The Hills", Edited by Khaled Belal. Compiled by Mirza Zillur Rahman and G. M. Mesbahuddin Bahar, Chittagong, March, 1992, p.20)। এছাড়া দেখুন, সুনীতি বিকাশ চাকমা, রণবিক্রম ত্রিপুরা, চা থোয়াই অং মারমা, আবদুল অদুদ ভুঁইয়া সম্পাদিত, "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামঃ এখনো ষড়যন্ত্র— আজকের প্রেক্ষাপট ও কিছু কথা", চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ২১-২২)। শেখ মুজিবের ভ্রান্ত নীতির কারণে, উগ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে চাকমা সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গড়ে উঠলেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দিতে যাননি। যদিও তার সরকার মুজিব বাহিনীর শেখ মণির সহযোগিতামূলক কাভার দিয়ে ভারতীয় জেনারেল উবান ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-কে পার্বত্য চট্টগ্রামে "অপারেশন ঈগল" চালাতে দিয়ে একদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের দমনে সহায়তা দিয়েছেন, অন্যদিকে ঐ অপারেশনের সুযোগে চাকমা ইনসার্জেন্টরা ভারতীয়দের সহানুভূতি, সহযোগিতা, পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রের বখরাসহ বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন চালানোর ক্ষেত্র তৈরির উপযোগী প্রেক্ষাপট পেয়েছে। যদিও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম. এন. লারমা) ১৯৭৫ সালে বাকশালেও ঢুকেছিলেন এবং এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্য এগিয়ে নিয়ে যাবার মতলবে ছিলেন, তথাপি ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্টের পটপরিবর্তনের পর তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ১৯৭২-৭৫-এ নিজেদের তাঁবেদার সরকার থাকায় ভারত এম. এন. লারমাকে ও শান্তিবাহিনীকে হাতে রেখেও বেশি বাড়তে দেয়নি। ১৯৭৫-এর অগাস্টের পর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী অনুভূতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা-নীতি-সিদ্ধান্ত-কর্মকাণ্ড-বৈদেশিক নীতি এবং ভারতের কাছ থেকে পানি, অস্ত্র, সম্পদ, সীমানাসহ যাবতীয় বিষয়ে ন্যায্য হিস্যা লাভ– এসব ব্যাপারে স্বাধীন, সম্পন্ন, স্বাতন্ত্র্যসূচক মোড় পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারত শান্তিবাহিনী ও লারমা নামক তুরুপের তাসকে ব্যবহার করা শুরু করে জোরেশোরে। যদিও ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৭ — এই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার বহু হাজার কোটি টাকা (২২ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা) ব্যয় করেছে; সম্পদ, মানব সম্পদ, সুযোগ, দক্ষতা ইত্যাদি প্রযুক্ত ও ব্যবহার করে, কাজে লাগিয়ে আজকের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন এনে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয়েছে ওখানকার বাংলাভাষী বাঙালী মুসলমান জন অংশ এবং পুরো জাতিকে বঞ্চিত করে।

তবুও বিচ্ছিন্নতার ষড়যন্ত্র এবং শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, লুটপাট, হত্যা আর ভারতীয় স্বার্থ সংযোগ তিরোহিত হয়নি। বরং তা ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আজ মহীরুহ হয়ে গেছে রাতরাতি। ১৯৯২-এর দিকে পার্বত্য অঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাস-অত্যাচার, ভারতে বাধ্যতা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে

তাড়িয়ে নেওয়া রিফিউজী বা শরণার্থীদের প্রতারিত হবার বোধ ও মরণাপন্ন অবস্থা, বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমা ঘোষণা ও অভূতপূর্ব সুযোগের পুনর্বাসন কর্মসূচী, পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর শান্তিরক্ষা কৌশল ও চাপ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যৌথ ফল, শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও খুনোখুনি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তথায় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও শান্তিবাহিনী অলমোস্ট ডাই-ডাউন করছিল। এসময় শান্তিবাহিনী একতরফা সীজফায়ারের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

সেই মরণ দশা থেকে, বিরোধী দলের ভাষায়, ভারতীয় সহায়তায়, আমলা বিদ্রোহের সমর্থনে এবং স্রেফ ভোট ও নির্বাচন জালিয়াতি করে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ নতুন করে শান্তিবাহিনী, জনসংহতি ও সন্তু লারমা গোষ্ঠীকে নবজীবন দেয়। ভারতীয় স্বার্থে ও নির্দেশে এবং নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা-স্বার্থ রক্ষার তাগিদে জামাই আদর করে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে এনে গোপন চুক্তি করে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তিবাহিনী তথা ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভারত তার সাতবোন রাজ্যে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে যেভাবে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন দমাচ্ছে কেবল নিষ্ঠুরভাবে, ঠিক তেমনি উল্টোভাবে বাংলাদেশে চাকমা বিচ্ছিন্নতা বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে এবং আরো বেশি কূটকৌশল, প্রতারণা, মিথ্যাচার, গায়ের জোর আর আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ভঙ্গ করে সমর্থন দিচ্ছে। আর এদেশে ভারতের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ সরকার ভারতীয় নির্দেশে ও যোগসাজশে চাকমা বিদ্রোহীদের সাথে গোপন চুক্তি সেরে ফেলছে।

পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, কামিনী মোহন দেওয়ান, স্নেহ কুমার চাকমা কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ভুক্তির স্বপ্ন ছেড়ে দেননি। ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলে ভারতীয় কংগ্রেস নেতা এ. বি. ঠক্করের প্ররোচনায় রাম-রাজত্বের মোহে উম্মাদ চাকমা নেতারা রাঙ্গামাটিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের সামনে ভারতীয় অশোকচক্রের পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় কি ঘটে তা একজন চাকমা লেখকের ভাষায় শোনা যাক্ ঃ "এত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতীয় পতাকা উড়ানো হলেও সঙ্গে সঙ্গেই রশির গিঁট খুলে নিজেই পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। ফ্ল্যাগ পোল থেকে নিজে নিজে খুলে পড়ায় সেদিন অনেকেই বলেছিলেন — মনে হয় এই মাটিতে ভারতীয় পতাকা কোনোদিন উড়বে না। অগত্যা এক তরুণ বালকের বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার মত কয়েকবার চেষ্টা, পরিশেষে তিন চার গিট দিয়ে ভারতীয় পতাকা উড়ানো নিশ্চিত করলেও এ. বি. ঠক্কর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারেননি" (এস. বি. চাকমা, "উপজাতীয় নেতৃত্ব ঃ সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিকথা")। এ সময় তিনদিন ধরে রাঙামাটিতে ভারতীয় পতাকা উড্ডীন থাকার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এসে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে তথায় পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে। এ সময় উপজাতীয় নেতারা বিশেষত চাকমা নেতারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহকরতঃ স্বল্পকাল মধ্যে ভারতে আশ্রয় নেন।

কাজেই সেই যে ১৯৪৭ সাল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতভুক্তির স্বপ্ন ছিল কংগ্রেস নেতা ও চাকমা নেতাদের মনে, মগজে ও কাজে, সেই স্বপ্নই এম. এন.

লারমার পথ ধরে আজ তারই ছোট ভাই সন্তু লারমার এবং শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

আরেকজন চাকমা লেখক প্রদীপ খীসা শান্তিবাহিনীকে পুরোপুরি সমর্থন করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনকে সমর্থন করেও খুবই খোলাখুলি জানিয়েছেন যে, চাকমা শান্তিবাহিনী (এসবি) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস বা পাচজসস) ভারত-নির্ভর, ভারতে আশ্রয় লাভকারী, ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা লাভকারী এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing) -এর সমর্থনপুষ্ট। ১৯৭৫-এর ঘটনার পর RAW নিজেই নাকি জনসংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। RAW-এর সমর্থনের ফলেই নাকি 'লম্বা গ্রুপ' (দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী) বা 'লারমা গ্রুপ' শক্তিশালী হয় এবং 'বেঁটে গ্রুপ' (স্বল্পমেয়াদী লড়াইয়ে বিশ্বাসী) বা 'প্রীতি গ্রুপ' কোণঠাসা হয়ে 'হতাশার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়' (প্রদীপ্ত খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, অগাস্ট ১৯৯৬, পৃঃ ৫০-৫৬)।

সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের উপদেষ্টা এবং বর্তমানে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ভারতের ত্রিপুরাকেন্দ্রিক নেতা আর শান্তিবাহিনীর সঙ্গে গোপন চুক্তির ব্যাপারে বিরাট মাতব্বর উপেন্দ্র লাল চাকমা এবং ভাগ্যচন্দ্র চাকমা কলকাতার মাসিক "আলোকপাত" পত্রিকায় পরিষ্কার জানিয়েছেন, তারা কি চান। তারা প্রকাশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির জন্যে তাদের আকাঁক্ষার কথা জানিয়েছেন। তাদের ভাষায়ঃ

"স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মুজিবকে এত সাহায্য করল ভারত। অথচ আমরা (চাকমারা) প্রো-ইন্ডিয়ান বলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ দুই সরকারই আমাদের উপর অত্যাচার করল। দেশভাগের সময় নেহরুকে এত অনুরোধ করলাম, আমরা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য, নেহরু শুনলেন না; '৭১-এ ইন্দিরা গান্ধী পারতেন অন্তত চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে; তাও করলেন না। অথচ 'ভারতকে ভালবাসি' শুধু এই কারণেই চাকমাদের এত দুর্দশা" (মাসিক আলোকপাত, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এখানে "চাকমাদের এত দুর্দশা" কথাটি কেবল সর্বৈব মিথ্যাচার। কেননা এতগুলি বছর যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে প্রদত্ত যাবতীয় সম্পদ ও কোটার সুযোগ থেকে সবচেয়ে বেশি মাখন উদরস্থ করেছে চাকমারাই, বাঙালী ও অন্যান্য উপজাতিকে বঞ্চিত করে।

যাহোক, আরো উল্লেখ্য যে, সাতচল্লিশ সালের ১৫ অগাস্ট দেশ বিভাগের সময় 'চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা উড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, আমরা হিন্দুস্থানের সঙ্গে থাকতে চাই, পাকিস্তানের সাথে নয়'। সেই একইভাবে ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তৎকালীন চাকমা নেতারা চেয়েছিলেন 'যদি ভারতের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে দেওয়া যায়' (মাসিক আলোকপাত, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ভারত ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সম্পৃক্ততা ঃ বহু চিত্র, স্বীকারোক্তি ও বিশ্লেষণ

চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী কেন্দ্রীয় নেতাদের, শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির নেতাদের, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রধান এবং পার্বত্য গোপন চুক্তির ক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়ায় অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা ও অপর নেতা ভাগ্যচন্দ্র চাকমার স্পষ্টতম স্বীকারোক্তি কলকাতার পত্রিকা থেকে পাঠ করার পরও কি কারো কোনো সন্দেহ আছে যে, শান্তিবাহিনী, জনসংহতি, পার্বত্য ছাত্র পরিষদ, হীল ওমেন এসোসিয়েশন, গণ লাইন, গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রাপ) কি চায়! জনসংহতির পাঁচ দফা, এর ভিতরের সাতচল্লিশ দফা, এর পর নিত্য-নতুন দেওয়া আরো বহুবিধ ও বহু সংখ্যক দফা-দাবী মিটিয়ে গোপন চুক্তি যা সমাধা হচ্ছে, সেটির খবর আজ ০২/১২/৯৭ তারিখের আওয়ামী লীগ সরকারের অন্ধ সমর্থক 'ভোরের কাগজ', 'জনকণ্ঠ', 'আজকের কাগজ', 'সংবাদ'সহ সরকার বিরোধী 'ইনকিলাব', 'দিনকাল', 'সংগ্রাম'-এ প্রকাশিত হয়েছে। 'ভোরের কাগজ' "চুক্তিতে যা থাকছে" শিরোনামার রিপোর্টে যথেষ্ট বিস্তারিত জানিয়েছে। এরপরও কেউ যদি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিবাহিনী তথা ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে তিনি হয় মূর্খ, নচেৎ মতলববাজ। স্বয়ং সন্তু লারমা, রক্তোৎপোল, রূপায়ন দেওয়ান—এরাই খুশীতে বাগ্ বাগ্ হয়ে চুক্তি সম্পর্কে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলেছে।

এরশাদের ১৯৮৯ সালের আইনের মাধ্যমে বিরাট কনশেসনের পর এবার জনসংহতির পাঁচ দফা, এর ভিতরের সাতচল্লিশটি উপ-দফা, নতুন দফা-দাবী—সবকিছু খুব ভালভাবে মেনে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এসব কিছু করা হয়েছে গণতন্ত্র ও জাতীয় সংসদকে শেষ করে দিয়ে, সংবিধানকে পদতলে পিষ্ট করে, মৌলিক অধিকারকে ধ্বংস করে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, গায়ের জোরে, গোপনে, জিদে ও অজ্ঞতায়, ভারতকে তুষ্ট করে ক্ষমতায় থাকার অভিলাষে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শান্তিবাহিনীকে যে ভারতই আশ্রয়, অর্থ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, সমর্থন, প্রচার সুযোগ, বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ দেওয়া, ভারতীয় বিএসএফ-এর কাভার, ভারতীয় 'র'-এর তত্ত্বাবধান ও সমর্থন ইত্যাদি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর শান্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়ে সে অঞ্চল ও চট্টগ্রাম বন্দরকে নিজে কব্জা করতে চাচ্ছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় যোগাযোগ, এক্ষেত্রে ভারতীয় সমর্থন, তত্ত্বাবধান, উসকানি ও কাজে লাগানোর বহু প্রমাণ রয়েছে।

চিন্ময় মুৎসুদ্দী তার বইয়ে জানান, ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ভারতের তাবেদার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের উৎখাতের পর থেকেই ভারত সরাসরি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তার ভাষায়, "ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহী হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে যোগাযোগ করল। . . . . . . লারমা কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় এসে আত্মগোপন করলেন" (চিন্ময় মুৎসুদ্দী, "অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা

বাজার, ১৯৯২, পৃঃ ১৪)। এ প্রসঙ্গে আরেকজন লেখক জানান, "With the political change-over in mid-1975 M.N. Larma went underground and crossed over to India to lead the armed insurgency" (M.R. Shelley, General Editor, "The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story", Dhaka: Centre For Development Research, December1992, p. 22)। একইভাবে চিটাগাং হীল ট্র্যাক্টস কমিশনের ভাষায়, "It is widely Known that the Indian Government of Indira Gandhi gave active support to Shanti Bahini insurgents allowing them to operate from bases in India" (Life is not our's : Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, p.16).।

ভারত যে শান্তিবাহিনীকে পুষছে; সমর্থন, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিচ্ছে ; শান্তিবাহিনী যে সন্ত্রাস চালিয়ে, জোর করে চাকমাদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে ত্রিপুরা ও মিজোরামে শরণার্থী ক্যাম্পে ভারতীয় খবরদারীতে আটকে রাখছে এবং সেখান থেকে বাধ্যমূলকভাবে রিক্রুট করছে শান্তিবাহিনীর সদস্য, তা আর গোপন কোনো বিষয় নয়। "The Chittagong Hill Tracts : Falconry in the Hills" গ্রন্থের (Edited by Khaled Belal. Compiled by Mirza Zillur Rahman and G.M. Mesbahuddin Bahar, Chittagong March 1992) পাতায় পাতায় তার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। এ জন্যে দেখা যায় ঐ বইয়ের পৃষ্ঠাঃ ১০-১১, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৬,৫৮, ৭৭, ৮২, ৮৬-৮৭, ৯১, ১০২, ১০৬।

উপরে উল্লিখিত বইয়ে প্রকাশিত সৈয়দ মর্তুজা আলীর প্রবন্ধের শিরোনামা হচ্ছে ঃ "Shanti Bahini : Name of an Across-Border Conspiracy." এতে বলা হয় যে ঃ "It is needless to mention that the Shanti Bahini continue to thrive so long they receive assistance and other logistic support from the neighbouring country (A Monthend Newspaper ORATION, 2 February 1992, p. 56 of the present book).

সাপ্তাহিক সুগন্ধার ৭ অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যায় শান্তিবাহিনী যে ভারতপন্থী তা জানানো হয়েছে। দৈনিক মিল্লাতের ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যায়ও শান্তিবাহিনী যে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে এবং ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। দৈনিক মিল্লাতের ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যায়ও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। দৈনিক সংগ্রামের ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যায় ভারতের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর যোগাযোগের reference রয়েছে। সাপ্তাহিক আগামী-এর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ "শান্তিবাহিনীর সদস্যরা উপজাতিদের জোর করে সীমান্ত পার করে ভারতে নিয়ে যেতে থাকে। এতে তাদের দু'টি ফায়দা হলো (এক) শরণার্থীদের দেয়া খাদ্য ও অর্থের সিংহভাগ তারা পেতো, (দুই)

বিশ্বের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারলো যে, তাদেরকে বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা ভারতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা জোরদার করে" (দ্রষ্টব্য ঃ ঐ)। সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ-এর ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্পষ্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরায় কীভাবে শান্তিবাহিনীর নেতারা বাড়ী-ঘর বানিয়েছে। পত্রিকায় আরো জানানো হয়েছে ঃ "সেই উপেন্দ্র বাবু (উপেন্দ্র লাল চাকমা) এখন শান্তিবাহিনীর নেতা হিসেবে সীমান্তের বাইরে অবস্থান নিয়েছেন" (সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১)।

দৈনিক সংগ্রামের ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ "প্রথমে শান্তিবাহিনী তৎপরতা শুরু করে স্থানীয়ভাবে তৈরী অস্ত্র নিয়ে। পরে ভারতে তৈরী চেক রাইফেল থেকে শুরু করে মেশিনগান পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তাদের সরবরাহ করা হয়। যখনই তারা নতুন অস্ত্র পেয়েছে তখনই তাদের হামলা ও হত্যাকাণ্ড বেড়েছে"।

"নিরাপত্তা বাহিনী সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় এবং জনসমর্থন হ্রাস পাওয়ায় শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অবস্থান এখন সীমান্তের ওপারে ও গহীন জঙ্গলে"।

সাপ্তাহিক সন্দ্বীপের ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় "শান্তিবাহিনী দমনে ভারতীয় সহযোগিতা প্রয়োজন" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

"কয়েকশ' শান্তিবাহিনীর সদস্য কি করে গোটা পার্বত্য এলাকাকে অশান্ত করে দেয়, তছনছ করে আজ এটাই প্রশ্ন। তাদের মোকাবেলা করার জন্য হাজার হাজার নিরাপত্তা কর্মী তৎপর। বছরের পর বছর তারা সেখানে নিয়োজিত। অনেক নিরাপত্তা কর্মী প্রাণ দিয়েছেন শান্তিবাহিনীর হাতে।.... শান্তি বাহিনীর ভয়ে এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ২৫ হাজার চাকমা আশ্রয়রত। ভারত দাবী করে এর সংখ্যা ৫৭ হাজার। বাংলাদেশ বলেছে মোটেও ঠিক নয়। শান্তিবাহিনী সুকৌশলে চাকমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তারা এ থেকে ফায়দা নিতে চায়। এর পেছনে রয়েছে ভারতের প্রত্যক্ষ কারসাজি। ভারতের সহযোগিতা না পেলে শান্তিবাহিনী একদিনও টিকে থাকতে পারবে না। ভারত তাদের প্রশিক্ষণ দেয়, খাবার দেয়, অর্থও যোগান দেয়। রাজনৈতিক প্রচারণা চালানোর সুযোগও দেয় তারা। ভারত ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে চাকমাদেরকে বিদেশে পাঠায় বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য। ভারতের পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার ছাপা হয়েছে ভারতীয় এলাকায় শান্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেয়ার ছবি ও খবর"।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বকোণ-এর ৫ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার জীবংগাছড়া গ্রামের ৩৬ বছর বয়স্ক নিরুপম চাকমা বিরোধ হওয়ায় শান্তিবাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন। রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দৈনিক পূর্বকোণের প্রতিনিধিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তিনি ১৯৭৪-৭৫ সালে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তার মন্তব্য হচ্ছে ঃ "কিন্তু শান্তিবাহিনীর নেতারা জনগণের মুক্তির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। এতে জনগণের দুর্দশা বাড়ছে। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ সাধারণ পাহাড়ী

জনগণকে শোষণ করে ভারতে বড় বিল্ডিং-এর মালিক হচ্ছে। জনগণের নিকট হতে জোরপূর্বক চাঁদা নিয়ে নিজ নিজ স্ত্রীদের শরীর স্বর্ণালংকারে ভরিয়ে দিচ্ছে। তাই জনগণের পক্ষ হয়ে শান্তিবাহিনীর বিরোধিতা করছি"।

শান্তিবাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারতীয় RAW। স্বয়ং শান্তিবাহিনীর নেতার স্বীকারোক্তি এটি। সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত ও বার্তা সংস্থা পরিবেশিত সংবাদে জানা গেছে, এরশাদের এক সময়কার উপদেষ্টা এবং বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থানকারী জনসংহতি সমিতি নেতা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা শান্তিবাহিনী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সংগঠনের নেতৃত্ব এখন ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হাতে' (সুনীতি বিকাশ চাকমা, রণ বিক্রম ত্রিপুরা, চা থোয়াই অং মারমা, আবদুল অদূদ ভূঁইয়া সম্পাদিত "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ এখনো ষড়যন্ত্র", চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ১৬১)।

বস্তুতঃ ভারত শান্তিবাহিনীর জন্মদাতা, পৃষ্ঠপোষক, নিয়ন্ত্রক, আশ্রয়দাতা, উস্কানিদাতা এবং তাদের মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধারকারী। শান্তিবাহিনীর 'mentor' ভারত; শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প সীমান্ত পেরিয়ে 'alien soil'-এ বা বিদেশী ভূখণ্ডে। শান্তিবাহিনীর "safe sanctuaries" হচ্ছে "far across the border"-এ (Friday, 15-21 February 1991)। এগুলি ভারতের ত্রিপুরায় ও মিজোরামে।

কুরিয়ার পত্রিকায় লেখা হয় যে, শান্তিবাহিনী (SB)-এর সশস্ত্র সদস্য recruit করা হয় মূলতঃ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী ক্যাম্পগুলি থেকে। কুরিয়ার-এ আরো জানানো হয় ঃ

"There are about 30 secret SB training camps at Ayelmara, Shilachari, Uluchari, Joytonbari, Aminnagar, Pakjin, Marapara, Mowajam, Punkhal, Bhalukchara, Tripura ghat, Kajaichari, Mijoram, Narayanbari, and Pekhon. Except Pekhon under Arakan Province of Burma, all other training camps are reportedly located either in Tripura or in Mijoram.

"Shanti Bahini's Sylhet Headquarters is understood to be situated at Bowalkhali in Tripura, three miles south of Indian Kachuchari border outpost. At Narayanbari is located the SB Headquarters. Shantu Larma is the Supreme commander of the Shanti Bahini while Sunil Chakma is the field commander" (Courier, February 15-21, 1991).

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি.-তে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার ফোরামের "Chittagong Hill Tracts : Problems and Solutions" শীর্ষক সেমিনারে বলেন, India is using the Hill Tract problem as a leverage to interfere in Bangladesh affairs (The Daily star, 11 February. 1991).

ডায়লগ পত্রিকার ২২ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায়ও শান্তিবাহিনীর ভারতকেন্দ্রিক ভিত্তির সত্যতা তুলে ধরা হয়।

দি ডেইলী স্টারের ১৮ নভেম্বর ১৯৯১-এর এক রিপোর্ট বলা হয় ঃ "Hardline Shantibahini men aided by the Indian Border Security Force (BSF) have taken preventive measures like the setting up of outposts along the border to stop fellow insurgents from availing the amnesty by the Bangladesh government, sources said" (Hardliners, BSF block SB surrender, The Daily Star, 19 November 1991).

মর্নিং সান পত্রিকায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের বিএসএফ-এর যোগসাজশ ও যৌথ আক্রমণ পরিচালনার উল্লেখ করে এক প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ "They alleged that the armed activists of the outlawed Shantibahini had been committing acts of terrorism in the region in direct collaboration with the Indian Border Security Force (BSF) (Morning Sun, 13 November 1991).

শান্তিবাহিনী যে ভারতীয় বি.এস.এফ-এর প্রত্যক্ষ মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা চালাচ্ছে তার আরো প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। তথ্য নিম্নরূপ ঃ

"শান্তিবাহিনীর একজন গ্রেফতারকৃত সদস্য সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে গত ২৯ জুন (১৯৯১) রামগড়ের খাগড়াবিলে যে হামলা চালিয়ে ১০ জন ঘুমন্ত মানবকে হত্যা করা হয়েছিলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর প্রত্যক্ষ মদদেই তা সংঘটিত হয়। পরবর্তী টার্গেট রামগড় বাজার আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বে পুনরায় বিএসএফ তাদের একজন সদস্যকে নদী পার করে সীমান্তের এপারে পাঠায় সব কিছু দেখে শুনে যাবার জন্যে এবং কর্তব্য সেরে ফিরে যাবার সময় সে বিডিআরের হাতে ধরা পড়ে" (প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ; এখনো ষড়যন্ত্র, পৃঃ ১৩৬)।

সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগসাজশ এবং শান্তিবাহিনী যে ভারতীয়দের হাতের ক্রীড়নক—এ উভয় সত্য ফুটে উঠে সাপ্তাহিক "Friday" পত্রিকার এক প্রতিবেদনে। এতে বলা হয় ঃ "মানবেন্দ্র লারমা ১৯৭৫ সালে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (RAW)-এর কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন" (Friday, June 3, 1988)। একই পত্রিকা আরো জানায়, "The attempt of M.N. Larma to negotiate a settlement with Zia was failed as the armed wing of the Jona Sanghati Samity was compelled to initiate armed operation under Indian pressure in mid 1976" (Friday, June 3, 1988).

আরেকজন লেখক ভারতের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর যোগসাজশ তুলে ধরে বলেন ঃ "The transborder security dimension of ethnic conflicts engineered by a small group of disgruntled members of a tribe arises out of reported Indian involvement. The first reported involvement was

during the Mujib Government (1972-75) when a joint Indo-Bangladesh operation against the insurgents was planned. But the plan could not be carried out because of a sudden political change in Bangladesh in mid-1975. Since then India gave active support to the insurgents allowing them to operate from bases well within its borders. At present there are more then 25 camps in Tripura and six to ten camps in Mizoram. Besides moral and material support from India, the SB insurgents also get tactical advice from relevant quarters in India. Even as late as December 1991 Upendra Lal Chakma (referred to above) was reported by the Indian press to have admitted that the leadership of SB was now in the hands of Indian intelligence officials". There have also been reports of SB raiding Bangladesh Rifles (BDR) camps along the border and deep into Bangladesh territory under cover provided by Indian Border Security Forces (BSF)" (M.R. Shelley, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh The Untold Story, p. 126).

লর্ড ডেভিড এনালস্, যিনি এশিয়ান কমিটি ফর দি বৃটিশ রিফিউজী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি ১৯৯২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফরে এসে শান্তিবাহিনী কর্তৃক নিরীহ মানুষ হত্যার বিষয়টি দেখতে পেয়ে 'strongly condemn' করেছিলেন এবং তিনি ডেইলী স্টারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শান্তিবাহিনী যে 'aided and assisted by forces beyond the borders' হচ্ছে, তা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছিলেন (Lord David Ennals-এর সাক্ষাৎকার, The Daily Star, Dhaka, Weekend, Friday, May 22, 1992)।

ভারতীয় কুটিল সম্পৃক্ততার আরো চিত্র ঃ স্বীকারোক্তি ও তথ্য বিশ্লেষণ

১৯৭৬ এর দিকে বিরাট অনিশ্চয়তার মুখে ভারতীয় "let loose" করা শিখণ্ডী হওয়া সত্ত্বেও শান্তিবাহিনীর নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জিয়া সরকারের সঙ্গে আপোষে যেতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে শান্তিবাহিনীতে অন্তর্দ্বন্দ্বও দেখা দেয়। ভারত এবং 'র' চায়নি বাংলাদেশ বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তাদের তুরুপের তাসের খেলা বন্ধ হয়ে যাক। তাতে করে এতদঞ্চলে তাদের ভূ-কৌশলগত এবং আর্থ-রাজনীতিক আগ্রাসী স্বার্থ ও কূট পরিকল্পনা বিনষ্ট হতো। সম্ভবতঃ ভারত এম.এন. লারমাকে অবিশ্বাস করা শুরু করেছিল। সে জন্যে লারমা গ্রুপের সঙ্গে প্রীতি গ্রুপের উপদলীয় সংঘাতকে তীব্রতম করে দেয় RAW, উস্কানি পেয়ে প্রীতি গ্রুপ ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে ভারতের ত্রিপুরার অমরপুর সাবডিভিশনে শান্তিবাহিনীর কল্যাণপুর ক্যাম্পে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তার আট জন সহযোগীকে হত্যা করে। ভারতীয় গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ

RAW এ সময় থেকে আজ অবধি প্রীতি গ্রুপের নেতা প্রীতি কুমার চাকমাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। কোনো থানা পুলিশ, বিচার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রীতি ও তার উপদলের উপর নেমে আসেনি। এ থেকে স্পষ্ট যে, RAW-এর ইঙ্গিতেই পরবর্তীকালে আপোষে চলে আসতে প্রস্তুত এম.এন. লারমাকে হত্যা করা হয়েছে। এ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে, শান্তিবাহিনীর লারমা ও প্রীতি গ্রুপ উভয়েই ভারতে আশ্রিত-লালিত এবং তাদের নির্দেশের গোলাম।

এম.এন. লারমার মৃত্যুর পর তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (জে.বি. লারমা ওরফে সন্তু লারমা) জনসংহতি এবং শান্তিবাহিনীর নেতা হিসেবে ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত আছেন এ যাবৎ এবং তিনিও গত কয়েক বছর ধরে সেখানে থেকেই কিংবা সাময়িকভাবে এখানে এসে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সন্তু লারমাও সম্পূর্ণভাবে RAW-এর পরিকল্পনামাফিক চলছেন। RAW সন্তু লারমার সম্ভাব্য অবাধ্যতা মোকাবিলার প্রয়োজনে শান্তিবাহিনীতে অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ ও বিকল্প নেতৃত্ব খাড়া করে রেখেছে। একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক সচিব রূপায়ন দেওয়ানের সঙ্গে সন্তু গ্রুপের বিবাদ ও পরিণামে সশস্ত্র সংঘাত। এটি ১৯৯৪ সালের ২ অক্টোবর ভারতের ত্রিপুরার রাইসাবাড়িতে চলমান সংলাপের ব্যাপারে মতবিরোধের আপাতঃদৃষ্ট কারণে সংঘটিত হয়। এতে উভয় গ্রুপের বহু সদস্য আহত হয়। তখন সন্তুর আবদারে রূপায়ন দেওয়ানকে ভারত সরকার সামান্য কিছুদিনের জন্যে গৃহে আটকে রাখলেও অচিরেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। লক্ষণীয়, এ ঘটনাও ভারতে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পে সংঘটিত হয় এবং এতে করে শান্তিবাহিনীর ভারত ভিত্তিও স্পষ্ট হয়।

ভারতীয় RAW জনসংহতির বিকল্প বহু সংগঠন তৈরি করে রেখেছে। এর উদ্দেশ্য divide and rule policy নিয়ে শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গোলযোগ লাগিয়ে তাদেরকে কব্জায় রেখে নিজস্ব দূরপ্রসারী গূঢ় আগ্রাসী স্বার্থ উদ্ধার করা। এ জন্যে লারমা গ্রুপের পাশাপাশি প্রীতি গ্রুপকেও পুষে রাখছে। ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে প্রীতি গ্রুপের ২২৯ জন নেতা রাঙামাটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও ভারতের আগরতলায় প্রীতি ভাল অবস্থান নিয়েই আছেন সে দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে। ভারত তার যাবতীয় খরচপাতি দিচ্ছে। ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর এম.এন. লারমার সঙ্গে তার আরেক ভাই শুভেন্দু লারমা, শান্তিবাহিনীর ডাক্তার কল্যাণময় খীসা, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ানসহ আরো কিছু নেতা পর্যায়ের শান্তিবাহিনী সদস্য নিহত হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপিং চাঙ্গা করে রাখা ছাড়াও আরো অনেকগুলি সংগঠন দাঁড় করিয়েছে নামসর্বস্ব হলেও। এগুলি হচ্ছে—জুম্মল্যান্ড রিজিওনাল কাউন্সিল, জুম্ম কণ্ঠ, জুম্ম লিবারেশন ফ্রন্ট, জুম্মজাতি। এসব সংগঠনের অফিস ও অন্যান্য খরচাপাতি ভারত যেমন দেয়, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে চাঁদাবাজি করে, অপহরণ করে, জিম্মী রেখে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থও তাদের কাজে লাগে। এম.এন. লারমার বিধবা স্ত্রীর নেতৃত্বে

ভারতের ত্রিপুরায় শান্তিবাহিনীর আরেকটি গ্রুপ গড়ে রেখেছে RAW। এদের আশ্রয়, নিরাপত্তা, অপারেশনসহ যাবতীয় দিক দেখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। শান্তিবাহিনীর এক ইঞ্চি ভূমিও দখলে নেই বাংলাদেশে। এদের শিকড় ভারতে। এরা সম্পূর্ণ ভারত-নির্ভর। সমীরণ দেওয়ান খাগড়াছাড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান থাকাকালে প্রকাশ্য এক প্রেস কনফারেন্সে ভারত সরকারকে দায়ী করেছিলেন শান্তিবাহিনীর আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দানের জন্যে। সমীরণ দেওয়ান আরো বলেছিলেন, শান্তিবাহিনীর নেতাদের আসল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন নয়, বরং ভারতের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি (দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১২ নভেম্বর ১৯৮৯)।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও RAW-এর অর্থে ও যোগসাজশে Peace Campaign Group (India), Humanity Protection Forum (India) কাজ করে যাচ্ছে। এরা পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালায়। Propaganda War চালানোই এদের কাজ। এগুলি ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে শান্তিবাহিনীর পক্ষে Propaganda চালায় Centre for Human Rights (Geneva), Hill Watch Human Rights Forum, CHT Commission (Europe), Human Rights Coordination Council (Headed by Father R.W. Timm).

এসব ছাড়াও RAW-এর দায়িত্বে ১৯৮৬ সালে আমস্টারডামে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে চাকমা সম্মেলন হয়। লক্ষণীয় যে, উপজাতীয় সম্মেলনও নয়, কেবল চাকমা সম্মেলন। এই সম্মেলনে ইতালীর রোমে নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন এ্যাম্বেসেডর এস. কে. লাম্বা নিজে বক্তৃতা দেন। আরো বহু চাকমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এবং ভারতীয় ডিপ্লোমেটদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং তত্ত্বাবধানে। যেমন, ১৯৮৭ সালে ভারতের কলকাতায়, ১৯৮৯ সালে জার্মানীর হামবুর্গে, ১৯৯২ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে, ১৯৯৩ সালে নেদারল্যান্ডে এবং ভারতের কলকাতা ও অরুণাচল রাজ্যদ্বয়ে, ১৯৯৭ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে।

শান্তিবাহিনীর ভারত-আশ্রিত ও পৃষ্ঠপোষিত অবস্থান সম্পর্কে খোদ শান্তিবাহিনীর বহু সদস্য তথ্য দিয়েছে। যেমন ১৯৯১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী একটি এল.এম.জি. (লাইট মেশিনগান) নিয়ে আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য শান্তিচাকমা (রাঙামাটির নানিয়ারচরের হাতিমারা গ্রামে বাড়ী) এবং ১৯৮৯ সালের ১৭ অক্টোবর ৫ জন সহযোগীসহ শান্তিবাহিনীর আরেকজন আত্মসমর্পণকারী সদস্য ক্যাপ্টেন রিকো-ও স্বীকার করে যে, ভারতই শান্তিবাহিনীকে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

RAW ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে অনেকগুলি সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শান্তিবাহিনীর একজন আঞ্চলিক অধিনায়ক জানান। ১৩ বছর ধরে শান্তিবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়কের পদে থেকে ১৯৯৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণকারী ত্রিবিদ চাকমা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের পর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, রিফিউজী সমস্যা,

শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতার এবং বানোয়াট প্রপাগান্ডার মাধ্যমে ভারতই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করার কাজে নিয়োজিত। তিনি স্বীকার করেন এ কথা যে, ভারতের নির্দেশেই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জোর করে উপজাতীয়দের ভারতে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং আটকে রাখে শরণার্থী শিবিরে। বস্তুত ১৯৯১-৯৪ পর্যায়ে এই সত্য বারংবার বহু তথ্যসহ ভারতে ও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক, ত্রিবিদ চাকমা জানান যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম, শিলাইছড়ি, বোয়ালপাড়া, কদমতলী, দায়েক, বারাছড়ি, রালমা, ত্রিমাখা, রত্মনগরসহ বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। শান্তিবাহিনীর বড় ধরনের সন্ত্রাসী সদস্যদের দেরাদুনে ট্রেনিং দেওয়া হয়। মায়ানমারেও শান্তিবাহিনীর রয়েছে কয়েকটি ঘাঁটি।

১৯৮৮ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখে নেপালের কাঠমণ্ডু থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ পাক্ষিক পত্রিকা "Spot Light"-এর একটি নিবন্ধে বলা হয় ভারত থেকেই শান্তিবাহিনীকে sabotage করার জন্যে উস্কে দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। "Spot Light" জানায়, sabotage করে দ্রুত সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালানোর সময় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতে তৈরি প্রচুর সাবমেশিনগান, কারবাইন, এস.এল.আর. স্টেনগান এবং ৩০৩ রাইফেল ফেলে যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত থেকে এসে ভারতের দেওয়া অস্ত্রেই শান্তিবাহিনী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। পত্রিকাটি আরো জানায়, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রচারণার কারণেই ৩০ হাজার উপজাতি লোক ভারতে গমন করে।

বস্তুতঃ শান্তিবাহিনীর কাছে যেসব অস্ত্র পাওয়া যায় (অর্থাৎ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন সময়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যকে ধরে যেসব উদ্ধার করেছে) তার মধ্যে ভারতে নির্মিত অস্ত্রই প্রধান। এছাড়া অন্যান্য দেশের অস্ত্রও ভারত থেকে লাভ করে শান্তিবাহিনী। ১৯৭২ সালে মেজর জেনারেল উবানের অপারেশন ঈগলের সময় চাকমারা বেশ কিছু চীনা ও বিভিন্ন দেশী অস্ত্র পেয়েছে বখরা বাবদ। এগুলি পাকিস্তানীরা ফেলে গিয়েছিল। এছাড়া শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতে বসে পাইপগান, গাদা বন্দুক, কাটা রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ইত্যাদি তৈরির কৌশল শিখেছে। শান্তিবাহিনীর কাছে যেসব অস্ত্র রয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

(১) চায়নীজ রাইফেল, সাবমেশিনগান ও লাইট মেশিনগান।

(২) ৩০৩ রাইফেল, বৃটিশ এল.এম.জি.।

(৩) ভারতীয় এস.এল.আর, সাব মেশিন কারবাইন (স্টেনগান) এবং এল.এম.জি।

(৪) চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল / ৯ মিলিমিটার সাব মেশিন কারবাইন।

(৫) ৭.৬২ মিলিমিটার (জার্মান ও পাকিস্তানী) এইচ. কে. ১১-এ রাইফেল এবং এল.এম.জি।

(৬) সিঙ্গেল ও ডাবল ব্যারেল শট গান।

(৭) নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী পিস্তল ও বন্দুক।

(৮) ৩৬ এইচ ই হ্যান্ড গ্রেনেড।

(৯) ২ ইঞ্চি/ ৬০ মিমি মর্টার।

(১০) বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লোসিভ।

জানা যায় যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর মাধ্যমে শান্তিবাহিনী ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৯, ১৯৮৮, ১৯৮৯ সালে বড় আকারে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও এক্সপ্লোসিভ বা বিস্ফোরকের চালান পায়।

এছাড়া এ্যামেরিকা, রাশিয়া, বুলগেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের যেসব অস্ত্র ভারত তার সামরিক বাহিনীর জন্য অনেক বছর পূর্বে যোগাড় করেছিল, সেসব পুরনো অস্ত্রও শান্তিবাহিনীকে দেওয়া হয়। আবার থাইল্যান্ডের অস্ত্র চোরাচালানীদের সাহায্যে শান্তিবাহিনী অত্যাধুনিক মার্কিন এম-১৬ রাইফেল, রকেট লাঞ্চারও সংগ্রহ করেছে।

শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণকারী সার্জেন্ট মেন্তারাম ত্রিপুরা ও তার সহযোগীরা জানিয়েছেন যে, তারা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কান্তলুই ঘাঁটিতে গেরিলা ট্রেনিং পান। তারা জানিয়েছেন ঃ

"শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন মহলের হরদম যোগাযোগ রয়েছে। মিজোরাম প্রদেশের সীমান্তে পাহাড়ী এলাকায় তাদের কান্তলুই ঘাঁটির নিকটতম অপর দু'টি ঘাঁটিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র', এসআইবি, সিআইডি, এসবি সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে শান্তিবাহিনীর নেতাদের সাথে প্রায়ই শলা-পরামর্শ করে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ক্যাম্পও শান্তিবাহিনীর ঘাঁটির নিকট অবস্থিত। ..... প্রশিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সরকারী-বেসরকারী মহলের লোকজন। শান্তিবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ রসদসহ যাবতীয় মালামালের যোগান পায় ভারতে বসেই" (দৈনিক সংগ্রাম, ১ জুন ১৯৯৫)।

আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য আলোক বিকাশ চাকমার লেখা "২২ বছরের সন্ত্রাসী জীবনের ইতিকথা" (সাপ্তাহিক পার্বতী, ৩১ মে ১৯৯৬ সংখ্যা) থেকে জানা যায় যে, শান্তিবাহিনীর ৭/৮ হাজার লোকবলের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার সামরিক সদস্য। জানা যায়, জনসংহতির ও শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান ও ফিল্ড কমান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (ওরফে সন্তু লারমা), ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার (ওরফে মেজর মলয়), প্রাক্তন এমপি এরশাদের উপদেষ্টা ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা ও লিয়াজোঁ কমিটির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা, ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার তালুকদার (ওরফে মেজর পেলে), রূপায়ন দেওয়ান (ওরফে মেজর রিপ), গৌতম দেওয়ান (ওরফে মেজর অশোক), কালীমাধর (ওরফে মেজর মিহির), মেজর তাপস চাকমা, মেজর সমেশ,

মেজর দেবাশীষ চাকমা, মেজর বরুণ, মেজর সুধাসিন্ধু খীসা, ক্যাপ্টেন নিস্ময়, ক্যাপ্টেন অজিত চাকমা, লেফটেন্যান্ট পঙ্কজ— এদের সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বিশেষতঃ RAW-এর যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে। এরা সবাই ভারতে আশ্রিত-লালিত। ভারতের ত্রিপুরার কাঠালছড়ি , লেবাছড়াতে শান্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায়।

আলোক বিকাশ চাকমার লেখা থেকে আরো জানা যায় যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মাইনী মিশন ট্রেনিং একাডেমী, ত্রিপুরার মনতলা ক্যাম্প (সাধারণ এলাকা গন্ডাছড়া ও রতন নগর) এবং মিজোরামের সীমান্তে দু'টি সামরিক-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরা ও মিজোরামে আরো সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে।

আলোক বিকাশ চাকমা ভারতের সাবরুম শরণার্থী শিবির থেকে গিয়ে মাইনী মিশন মিলিটারী ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রিক্রুট করা হয় লোকজন ট্রেনিং-এর জন্যে। কাজে গেলে তারা বেতন পায়। আলোক বিকাশ চাকমা মাইন মিশন ক্যাম্পে নিম্নরূপ সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে চার পর্যায়ে তিন মাসে। চার পর্যায়ের প্রথম ধাপ হচ্ছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ যেখানে এলএমজি, এসএমজি, চায়নীজ রাইফেল, এসএমজি (স্টেনগান), জি-৩ রাইফেল ও রকেট লাঞ্চার চালনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিল্ড ক্রাফট, সেন্ট্রি ডিউটি, ক্যামোফ্লেজ, কনসিলমেন্ট, ভূমির ব্যবহার ও টার্গেট নির্দেশ বিষয়ক ট্রেনিং। তৃতীয় পর্যায়ে রেইড, এ্যামবুশ, এ্যাটাক, উইড্রয়াল, পেট্রোলিংসহ ট্যাকটিক্যাল ট্রেনিং। এক্ষেত্রে ফিল্ড ট্যাকটিকস্ শিখানো হয়। চতুর্থ পর্যায়ে রাজনৈতিক ট্রেনিং। এবার জনসংগঠন, লীডারশীপ, জনসংহতি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

আলোক বিকাশ চাকমা ছাড়াও মাইনী মিলিটারী ক্যাম্পে আরও যেসব শান্তিবাহিনীর সামরিক সদস্য ট্রেনিং পায়, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট পরবর্তীকালে আত্মসমপর্ণকারী সামরিক সদস্যদের ক'জন হচ্ছে ঃ (১) মেজর উল্লাস, পরিচালক — রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। (২) মেজর শংকর — রাজনৈতিক প্রশিক্ষক। (৩) ক্যাপ্টেন নৈতিক — মিলিটারী এ্যান্ড স্পেশাল কোম্পানী কমান্ডার। (৪) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অনল — পিটি ও ড্রীল শিক্ষক। (৫) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নিবিড় মিলিটারী এ্যান্ড আর্মস্ ট্রেইনার।

(৬) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট প্ল্যানেট— মিলিটারী ট্রেইনার। এরা জানিয়েছে যে, শান্তিবাহিনীতে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া উপজাতীয় সদস্য ছাড়াও বহুসংখ্যক ভারতীয় নাগরিক প্রকাশ্যেই সদস্য হিসেবে বিজড়িত আছে। এরা মূলত শান্তিবাহিনীর স্পেশাল কোম্পানীতে।

সীমান্তের বাইরে শান্তিবাহিনীঃ চুম্বকে অবস্থান চিত্র

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর তিন জেলাকে ঘিরে ভারতের সীমান্ত ভূখণ্ডে শান্তিবাহিনীর অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

পার্বত্য খাগড়াছড়ি ঃ পশ্চিম ও উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য

(১) শালবন ক্যাম্প—১৩০, হেডকোয়ার্টার, স্পেশাল কোম্পানী।

(২) জুরাছড়ি ক্যাম্প— ৫০, ট্রেনিং একাডেমী।

(৩) মিশন একাডেমী—১০০, ট্রেনিং ক্যাম্প।

(৪) রিজাংছড়ি ক্যাম্প—৬০, হেডকোয়ার্টার অফ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (PCJSS)।

(৫) সোনামুড়া ক্যাম্প—৩৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৬) কমলপুর ক্যাম্প—৭, মেডিকেল সেন্টার-১।

(৭) উলুছড়ি ক্যাম্প—২৫, সেন্টার ফর কনফ্রনটেশন।

(৮) যিরানি ক্যাম্প—২০, সাপ্লাই আউটপোস্ট টু HQ (হেডকোয়ার্টার)।

(৯) পদাছড়া ক্যাম্প—১০, এক্সটেনশন ক্যাম্প অফ HQ।

(১০) গাড়িথানা M'La— ৩০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১১) নক্সাতলি ক্যাম্প—১২, ওয়ার্কশপ ফর রিপেয়ার ওয়ার্ক।

(১২) তাকুমবাড়ি ক্যাম্প—৪০, ফাইটিং ক্যাম্প এবং মেডিকেল সেন্টার।

(১৩) ইযিরা ক্যাম্প—৪০, ক্যাম্প অফ স্পেশাল কোম্পানী।

(১৪) বাঁশরী ক্যাম্প—২০, ট্রানজিট ক্যাম্প।

(১৫) শ্রীপুর ক্যাম্প— ৮, মেডিকেল সেন্টার-২

(১৬) কারবুক ক্যাম্প—৬০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১৭) জইতনবাড়ী ক্যাম্প—৫০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১৮) আইলমারা ক্যাম্প—৩৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১৯) বাগানটিলা ক্যাম্প—২৫, টেম্পোরারী শান্তিবাহিনী (SB) ক্যাম্প।

(২০) শিলাছড়ি ক্যাম্প—১৫, টেম্পোরারী ট্রেনিং সেন্টার।

(২১) উদল বাগান ক্যাম্প—৩৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(২২) ইস্ট সাবরুম—৯০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(২৩) লুধুয়া ক্যাম্প—২০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(২৪) মনুঘাট পোস্ট—১৫, আউটপোস্ট অফ হারবাটিলা ক্যাম্প।

(২৫) হারবাটিলা ক্যাম্প—৩০ ফাইটিং ক্যাম্প।

(শেষের দু'একটি রাঙামাটিরও কাছাকাছি)

পার্বত্য রাঙামাটিঃ উত্তরে-পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতে মিজোরাম রাজ্য

(২৬) তবলাবাগ ক্যাম্প—১৫০, ট্রেনিং সেন্টার।

(২৭) তালপুর ক্যাম্প—৪০০, ট্রেনিং সেন্টার।

(২৮) ভালুকাছড়ি ক্যাম্প—২০০, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী HQ।

(২৯) স্বর্ণাছড়ি ক্যাম্প—৮০, মেডিকেল সেন্টার এ্যান্ড ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স।

(৩০) ছোট পানছড়ি—ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স অফ ইনসার্জেন্টস।

(৩১) জামছড়ি ক্যাম্প—২০, হেডকোয়ার্টার অফ ক্যাম্প 'বি'।

(৩২) তুঙ্গাছড়ি ক্যাম্প—৩০০, হেডকোয়ার্টার অফ রংপুর জোন।

(৩৩) জিরাকুলুকছড়া—৭০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৩৪) আদি বাজার ক্যাম্প—২০০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৩৫) কালাদিবাপছড়া ক্যাম্প—৩০, HQ অফ কুমিল্লা জোন।

পার্বত্য বান্দরবান ঃ পূর্বে ও দক্ষিণে মায়ানমার।

ভারতের মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে রাঙামাটির কোল ঘেঁষে আসা যায়

(৩৬) মাটিবাজার ক্যাম্প—২৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৩৭) কান্তলুই ক্যাম্প—৩০, ক্যাম্প অফ স্পেশাল কোম্পানী।

(৩৮) পারভালুই ক্যাম্প—৩০, HQ অফ ঢাকা জোন।

(৩৯) পাইখং সোনাই ক্যাম্প

(৪০) মধু ক্যাম্প

(৪১) মধুফ্রো ক্যাম্প

(৪২) সোনালী ক্যাম্প

(৪৩) ও সোনালী ক্যাম্প।

এছাড়া ত্রিপুরার মনতলা, গন্ডাছড়া, তৈচাকমা, শান্তিপুর, উদয়পুর, জ্যোতিষপুর, রতন নগর, পঞ্চরতন, শ্রীপুর, বৈরাগীর দোকান, পুকুরঘাট, ফুলছড়ি, পাতাছড়া, তুইয়োছড়া, কৃষ্ণনগর, চোঁরতল, রাঙাছড়া, লধুয়া প্রভৃতি স্থানে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প, কোয়ার্টার, উৎপাদন খামার, মেডিকেল সেন্টার আছে।

জনসংহতির সাংগঠনিক কাঠামো

PCJSS—পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

GRAP— গ্রাম পঞ্চায়েত

JUS—যুব সমিতি

MS—মহিলা সমিতি

PCKS—পার্বত্য চট্টগ্রাম কীওনীয়া সমিতি

GHQ— জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স

এই পুরো কাঠামোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যরা ভারতের ত্রিপুরায় ও মিজোরামে থেকেই কর্মকাণ্ড চালিয়েছে ও চালাচ্ছে।

জনসংহতির শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র কাঠামো

উপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নামে জোনগুলির প্রদত্ত নাম আসলে কোড নেইম বা সাংকেতিক নাম। শান্তিবাহিনী নিজেদের সুবিধার্থে এ কাজ করেছে। সিলেট জোন বলতে দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, এলাকাকে বুঝানো হয়। যশোর জোন বলতে মাটিরাঙা, কাউখালি, রাঙামাটি অঞ্চলকে বুঝানো হয়। বগুড়া জোন হচ্ছে লংগদু থানা। কুমিল্লা জোন হচ্ছে জুরাছড়ি, বরকল, কাপ্তাই অঞ্চল। রংপুর জোন হচ্ছে নাইক্ষ্যংচড়ি, বিলাইছড়ি, মানিকছড়ি অঞ্চল। ঢাকা জোন হচ্ছে রুমা, রুহানছড়ি, আলিকদম অঞ্চল। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান— এই তিন পার্বত্য জেলায় শান্তিবাহিনীর অপারেশনাল জোনসমূহ অনুযায়ী সন্ত্রাসী ও অপতৎপরতা চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এসব জোনের সবগুলির হেডকোয়ার্টার হয় ত্রিপুরা এবং নয়তো মিজোরামে। রংপুর, কুমিল্লা, ঢাকা জোনের সদর দফতর মিজোরামে। সিলেট জোনের সদর দফতর ত্রিপুরার বোয়ালখালির জারলছড়ি সংলগ্ন স্থানে। আবার বিজয়পুর, বাদলছড়ি, জিরানিতে তিনটি কেন্দ্রীয় অধিদপ্তর আছে। আগরতলার কুঞ্জবনে দৌলতপুর নামক এলাকায় একটি বিদেশী দূতাবাস খোলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামরিক হেডকোয়ার্টারগুলি ভারতে বিদ্যমান থেকেই সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতার ভারতকেন্দ্রিক পরিচয় তুলে ধরছে। আরো লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ডে শান্তিবাহিনীর এক সূতা পরিমাণ জায়গাও নেই। অথচ আজ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার এদেরকে মাথায় তুলে রেখেছে।

ভারতীয় সংযোগ ঃ শেষের তথ্যাদি ও বিশ্লেষণ

ভারতের 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় নভেম্বর ১৯৯৬-এ শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সংযোগের চিত্র প্রকাশিত হয়। কলকাতার 'আলোকপাত' পত্রিকার নভেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় উত্তম উপাধ্যায় নামে একজন রিপোর্টার খুবই পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, "এখন ১০ হাজার চাকমার মিলিশিয়া বাহিনী যে ভারতীয় সাহায্যেই পুষ্ট এটা ত্রিপুরার ছোট ছোট বাচ্চারাও জানে"।

বিশিষ্ট ভারতীয় গবেষক-বিশ্লেষক অশোক এ বিশ্বাস তার "RAW's Role in Furthering India's Foreign Policy" শীর্ষক পুস্তিকায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সংযোগের কথা খোলাখুলি বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "RAW is now involved in training rebels of chakma tribes and Shanti Bahini who carry out subversive activities in Bangladesh". এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'র' বর্তমানে চাকমা উপজাতি ও শান্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণদানে সরাসরি জড়িত যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানারকম নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়।

কিছুকাল পূর্বে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন হাইকমিশনার ফারুক সোবহান (পরে পররাষ্ট্র সচিব) "এশিয়া এজ"-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ "The Bangladesh Government felt that the main support for the 'Shanti Bahini' was being provided by the Research and Analysis Wing in India".

এর অর্থ হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে, মূল সমর্থন আসছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এ্যান্ড এনালিসিস উইং-এর কাছ থেকে।

এ কথাও আজ জানা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন ভারতের মিজোরাম রাজ্যের ডাইরেন্ডীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলেও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এই সামরিক স্কুলের কমানডেন্ট ব্রিগেডিয়ার ত্রিগুলেশ মুখার্জী। এই স্কুলে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে শান্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় চীফ অব আর্মী স্টাফ জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরী পুরো বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। এখানকার পরিস্থিতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মিলিটারী ফরমেশনগুলি সফর করার সময় ডাইরেন্ডীতে আসেন। এখানে জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলে সামরিক প্রশিক্ষণরত বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনারেল শংকর রায় আশা ব্যক্ত করেন যে, শীঘ্রই শান্তিবাহিনী সম্মানের সাথে স্বদেশভূমি জুম্মল্যান্ড-এ ফিরে যেতে পারবে।

লক্ষণীয় যে, শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় অবৈধ সংযোগ কত গভীরে রয়েছে জেনারেল শংকরের বক্তব্য থেকে তা বেরিয়ে আসছে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার থেকেই শান্তিবাহিনীকে জামাই আদর করে তাদের হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে দিচ্ছে এবং শেষাবধি তা যাচ্ছে ভারতের খপ্পরে। জেনারেল শংকর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী প্রশ্নে ভারতের পরিকল্পনা এবং নিকট ভবিষ্যতের করণীয় জানতেন বলেই এত নিশ্চিতভাবে শান্তিবাহিনীর স্বদেশভূমি জুম্মল্যান্ডে অচিরেই ফিরে যাবার আশ্বাস দিয়েছেন। ভারত, ভারতীয় RAW এখন এই কাজই করাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে। সন্তু লারমার সঙ্গে চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭

চতুর্থ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ অখণ্ড বাংলাদেশ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে উপজাতিদের মধ্যে যারা গবেষণা করেছেন তারা হচ্ছেন সতীশ কুমার, বিরাজ মোহন দেওয়ান, সি. আর. চাকমা, সুগত চাকমা প্রমুখ। ভারতে গবেষণা করেছেন দেবযানী দত্ত এবং অনুসূয়া রায় চৌধুরী। চাকমা গবেষকরা সরাসরি স্বীকার করেছেন চাকমা জাতির আসলে কোনো ইতিহাস নেই। চাকমাদের যে চম্পকনগরের অধিবাসী বলা হয়, সেটি একটি কাল্পনিক নাম। অন্তত পাঁচটি চম্পকনগর আছে যা ভারতে বা ভারতের বাইরে বিভিন্ন স্থানে আছে। কোনোরকম ভাবে বোঝা যায় নি, এরা কোত্থেকে এসেছে। কেউ বলে আরাকান থেকে, কেউ বলে ভারত থেকে। এ ধরনের নানা রকম কথা শোনা যায়। চাকমারাসহ এখানকার যে তেরোটি উপজাতি আছে তারা কেউ বাংলাদেশের ভূমিপুত্র নয়। তারা এখন থেকে দেড়শ', দুইশ বা আড়াইশ বছর আগে সর্বোচ্চ তিনশ' বা চারশ' বছর আগে এসেছে। এদেশের ভূমিপুত্র হচ্ছে যাদেরকে বাঙালী সেট্‌লার বলে চালানো হয়েছে (সমস্যাটা যেখান থেকে শুরু) তারা। আমি '৭৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেখেছি, আমি '৮৩ সালে সেখানে গিয়েছিলাম,'৯৩ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। '৯৫ সালে এমন কি এই '৯৭ সালে তিন সপ্তাহ আগে রাত দু'টার সময় সেখানে নামাজ পড়েছি। অবশ্য সেটি ছিলো ক্বাজা নামাজ এবং বিরামহীনভাবে ঘুরেছি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন ভয়ংকর জঙ্গলে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছি। সেখানে এমন সব জায়গা আছে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিপদে সেখানে এমবুশের সম্ভাবনা, বিপদের সম্ভাবনা। কর্নেল মোস্তফা আমাকে রাত সাড়ে এগারোটার সময় বলেছেন, তার বাবা মারা গেছেন কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। নেত্রকোণার দু'জন সিপাহী, বরিশালের একজন সিপাহী বলেছেন কারো মা মারা গেছেন, কারো ভাই মারা গেছেন। তারা আসতে পারেনি। মশারী পরে বসে আছেন কারণ সেলিব্রাল ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আলিক্ষ্যিয়ং ক্যাম্প — ওখানে শুয়ে আছে একজন সিপাহী যে-কোনো সময় মারা যাবে। এর আগে ক্যাপ্টেন আরিফ মারা গেছেন রত্থিচন্দ্র পাড়া ক্যাম্পের অফিসার। যিনি তিনদিন ধরে অজ্ঞান ছিলেন। তাকে চিটাগাং সি এম এইচ এ আনা হলো, তৃতীয় দিনে অন্য অফিসারদের চোখে অশ্রু, সিপাহীদের চোখে অশ্রু। কারণ He is already dead. পার্বত্য চট্টগ্রামে চলেছে ভয়াবহ অবস্থা। আমি বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামে গিয়েছি। সেখানে দীঘিনালা থেকে সাড়ে পাঁচশ' বাঙালী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ওখানে

মুসলমান মারা গেছে। মৌলবী সাহেব গিয়েছেন জানাজা নিয়ে। তারা বলে এখানে কবর দিতে দেবো না। বলা হলো, কেন ভাই এটা তো আমাদের কবরস্তান। চাকমারা বললো, এটা তোমাদের বাবার জায়গা না, এটা আমাদের জায়গা। তোমরা চলে যাও। মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, বলে এ জায়গা তো আমরা কিনেছি। আবুল কাসেম নামে এক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন যিনি এখন সর্বশান্ত ও উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গেছেন। আবুল কাসেমের তিনটি ছেলেকে চাকমা শান্তিবাহিনী জবাই করেছে। আমাদের দেখতে পেয়ে ডুকরে আর্তনাদ করে বলছেন, চোখ দিয়ে তাদের অশ্রু ঝরছে, বলছেন 'আমাদেরকে বাঁচান, আমাদেরকে বাঁচান.....' 'আবুল কাসেম তিন ছেলের হত্যার বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করতে গিয়েছেন। দারোগা মামলা নেয়নি। এর দুটি কারণ হতে পারে। হয় দারোগা ঘুষ খেয়েছে অথবা দারোগার লাশ পড়ে থাকতে পারে-এই ভয়। কিছু করার নেই। আমরা যখন চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির সঙ্গে অনেক রাত্রে আলাপ করছি সেদিন, আমরা জানি না বাঙালীদের উপর কি ঘটেছে রোয়াংছড়িতে। দু'জন ব্যবসায়ী বাজার থেকে ফেরার পথে তাদের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা লুট করা হয়েছে। তাদেরকে অজ্ঞান করে ফেলে রাখা হয়েছে। ভোরে জিওসি বললেন, আমরা যখন কথা বলছিলাম, হয়তো এ সময় এ ঘটনাটি ঘটেছে। আমি বললাম, এই যদি হয় অবস্থা তো আপনারা কি করবেন? উনি বললেন 'কিছু করার নাই। আমাদের হাত বাধা'। আমি বললাম, এদের ধরুন। তারা বলেন 'সম্ভব নয়'। সম্ভবত সরকারের কোন আদেশ নেই। তবে তিনি বললেন, একটি কাজ অবশ্য করবো, দেখবো 'আর যেনো না মারে'। অর্থাৎ ভাই আর মারিস না। মাফ করে দে। যা মেরেছিস আর মারিস না এটুকু হচ্ছে তাদের দায়িত্ব। তারা কিছু করতে পারছে না। একদম গুমরে মরার অবস্থা। এখানে যদিও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেন, 'একটি ক্যাম্পও তুলে নেওয়া হবে না'— এর চেয়ে নির্জলা মিথ্যা কথা আর কিছু নেই। আমি চ্যালেঞ্জ করছি প্রধানমন্ত্রী যদি সৎ মানুষ হন তাহলে বলুন যে, বরকল থেকে তিনি ক্যাম্প তুলে আনেননি, তিনি বলুন পানছড়ি, দীঘিনালা থেকে তিনি ক্যাম্প তুলে আনেননি। প্রধানমন্ত্রী বলুন লোগাং থেকে তিনি ক্যাম্প তুলে আনেননি।

লোগাং–এর বাঙালী অথরিটি জানিয়েছেন, আপনারা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যান। শান্তিবাহিনী ওঁৎ পেতে বসে আছে। নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না, সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে হবে। এখানে কয়েকশ' বাঙালী পরিবার অসহায় অবস্থায় বসে আছে। দীঘিনালার অনেক জায়গা থেকে ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি ঘাঘরায় গিয়েছি, আলিক্ষ্যিয়ং গিয়েছি। এমন সব জায়গায় গিয়েছি যেখানে হেলিকপ্টার নেমেছে– কো-পাইলট শুধু নির্দেশনা দিচ্ছে, আর দশ ফুট গেলে তিনশ' ফুট গভীরে বা চারশ' ফুট গভীরে পড়ে যাবে হেলিকপ্টার। এরকম জায়গায় নেমেছি, নেমে আমরা কেডস পরে ধীর পায়ে নেমেছি। ওখানে মেশিনগান লাগানো সৈন্যবাহিনী সব ঘেরাও করা। খুব গভীর পাহাড় দিয়ে উপর থেকে নিচে নামতে হয়েছে। একেকজন আমাদের হাত ধরে রেখেছে। এরকম অবস্থা। একটি জায়গা নেই, একটি রাস্তা নেই। ওখানকার পাংখো নেতা আমাদেরকে দুই তিনশ' লোকের সামনে বললেন, 'আমাদের মধ্যে একজন ডাক্তার নেই, একজন এম এ পাস নেই'। অথচ চাকমাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, 'কুকী

পাহাড়' বা কালাপাহাড়ের নিচে। সেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এসেছিলো। তারা কথা বলেছে সামরিক বাহিনীর সামনেই। দীঘিনালায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছেতাই অভিযোগ করছে, মেজাজ দেখাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার আশফাকের কিছু করার নেই। চাকমাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে বাঙালীদের চেয়েও বেশী। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে কথা বলা হয়েছে। ওদের বেশিরভাগই গ্রাজুয়েট। রাঙামাটিতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সাথে ব্রিগেডিয়ার জহির ছিলেন, একজন ব্যারিস্টারও ছিলেন। ব্যারিস্টার বললেন, ঢাকার ধানমণ্ডি মধুবাজারে তার বাসা। তিনি বললেন, 'ওখানে যদি দশজন বাঙালীকে এভাবে প্রশ্ন করা হয়, দেখা যাবে পাঁচটা লেখাপড়াই জানে না। আর বাকি পাঁচটা কোনো রকম জানতেও পারে, এই অবস্থা'। পাংখো নেতা আমাদেরকে বললেন, একটা হেরিংবন্ড রাস্তা তারা চান। সেটিও তাদের নেই। উল্লেখ্য যে, পাংখোরা উপজাতীয় হলেও তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে। পাংখো নেতা এ্যাংলিয়ানার মামাকে মেরে ফেলেছে শান্তিবাহিনী। এ্যাংলিয়ানারা তাদের একটি দল নিয়ে থাকতেন বান্দরবান এলাকায়। তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদেরকে চাকমারা বলেছে, শান্তিবাহিনীর পক্ষে থাকতে। তিনি বলেছেন, আমরা বাংলাদেশীদের সাথে থাকতে চাই। 'আমাদের শুধু বাংলাদেশীরা যে সুবিধা পান শুধু সেটুকু পেলেই হবে'।

আমরা জানি যে, চাকমারা মাখন খেয়ে ফেলছে। ৭২% শিক্ষিত হচ্ছে চাকমা। সংবিধানের দোহাই দেওয়া হয়েছে 'অনগ্রসর অংশের জন্যে যদি সরকার কিছু করে তবে ২৮-১/২/৩ অনুযায়ী সরকারকে বাধা দিতে পারবে না। একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, সৎ হলে সরকার স্বীকার করুন 'অনগ্রসর অংশ' কারা? ক্ষেত্রবিশেষে বাঙালীদের শিক্ষার হার ১০%। মোট টেনেটুনে ২০%। চাকমাদের শিক্ষার হার হচ্ছে ৭২%। কাদের এডভান্সমেন্ট আপনি চান? চাকমারা সংখ্যালঘু। বাংলাদেশের মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ০.৪৫% এমন কি তা ১%-এর অর্ধেকেরও কম। এর মধ্যে বারোটি উপজাতি চাকমাদের সঙ্গে নেই। একটি উপজাতি একা সন্ত্রাস করে যাচ্ছে, অন্য দু'একজন ত্রিপুরা বা অন্যরা আছে। এই চাকমারা বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ০.২২%। ১%-এর অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম। তাদের কথায় আমরা উঠি, তাদের কথায় আমরা বসি। তাদেরকে নিয়ে আমরা যে-কোনো রকম চুক্তি করছি। আমাদের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। মাত্র ১%-এর অর্ধেকের অর্ধেক মানুষের জন্যে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি যারা এই এলাকায় এসে ঢুকেছে — অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। তাদের নাগরিকত্ব স্ট্যাটাস এখনো ঠিক হয়নি। তা ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী চলেছে। '৮৯ সনে তাদের অনেক বেশী সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার তাদেরকে দেশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা বিদ্রোহী। তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে অথচ তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে মুরগীর ঠ্যাং, গলদা চিংড়ি খাইয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এবং বলা হচ্ছে উপজাতিদের এডভান্সমেন্ট করা হচ্ছে। উপজাতীয় নেতা এই সন্তু লারমা সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকা থেকে চলে যান দুদুকছড়িতে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে। এখানে খুব সামান্য সময়েই তিনি ভারতে ত্রিপুরায় হেঁটে যাতায়াত করেন। ত্রিপুরায় তার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করে। ত্রিপুরার একটি আধুনিক ফ্ল্যাটে থাকেন। ত্রিপুরায় বসে চুক্তি

হচ্ছে। ত্রিপুরায় বসে সিদ্ধান্ত হচ্ছে। আগরতলায় বসে সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এবং নয়াদিল্লি যেটি সমর্থন করছে সেটিকে এখানে পাস করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা যার সকল ছেলেমেয়ে চাকরি করে বাংলাদেশে। তার রাইস মিল আছে, তার স' মিল আছে, থাকেন আগরতলায়। রোজ শাসান। 'এইটা না হলে শরণার্থী পাঠাবো না। ঐটা না হলে এটা মানবো না'। এদেশে মাঝে মাঝে হেলিকপ্টারে করে আসেন। রাইস মিল, স' মিল, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয় স্বজন সব কিছু দেখে যান। এখানে সকল স্বার্থ রেখে ঐখানে বসে শাসাচ্ছেন। এবং কথায় কথায় কোনোরকম এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফোন করেন। প্রধানমন্ত্রী তক্ষুণি তার সাথে দেখা করেন এবং একটি লোককেও থাকতে দেন না, এমন কি আবুল হাসনাত আবদুল্লারও থাকার সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী থাকেন ও তিনি আলাপ করেন। যা শাসিয়ে যায় সেভাবেই তিনি কাজ করেন।

যত চাকমা গবেষকের লিখিত গবেষণা আমি দেখেছি তারা কোনো জায়গায় একথা বলেননি যে, তারা এদেশের সন্তান। তারা যা বলেছেন এবং ইতিহাসও সেটা প্রমাণ করে তারা কেউ আরাকান থেকে, কেউ ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছেন। চাকমা রাজা মার খেয়ে পলায়ন করে আরাকান থেকে চলে এসেছেন। চাকমা রাজ দরবারে যে সীল আছে সেই সীলে লেখা আছে। দশজন মুসলমান চাকমা রাজার নাম জানা যায় যারা মুসলিম নাম ধারণ করেছিলেন। তাদের স্ত্রীদেরকে বলা হতো বিবি। চাকমারা এখনো সময়কে বলে ওয়াক্ত। কুটুম, তালাক এই শব্দগুলি চাকমারা এখনো ব্যবহার করে। চাকমা রাজা শের মস্ত খাঁ, জান বক্স — এগুলো সব মুসলমান নাম। এরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। শের মস্ত খাঁর একটা সীল পাওয়া গেছে। সেই সীল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সেই সীলে লেখা আছে 'আল্লাহু রাব্বী, আরাকান-রোসাং, শের মস্ত খাঁ। ১১১১ মগী'।

এটি চাকমা গবেষকরা স্বীকার করেছেন। বিদেশী গবেষক টি এইচ লিউইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণা থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ধারণা পাই। আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কিছু ছিলো না, পুরোটাই ছিলো চট্টগ্রাম। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করা হয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে আদৌ কোনো জেলা ছিলো না। তারপর তিনটি জেলা হয়েছে এরশাদ সাহেবের আমলে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি নামে। তার আগে ১৮৬০ সালেই শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হয়েছে। একহাজার বছর আগেও যদি খোঁজ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কিছু ছিলো না আদৌ। সেই চট্টগ্রামটা 'হরিকল' জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সেটি বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। চাকমা গবেষকরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, এমন কি সতীশ কুমারের মতো মিথ্যুক গবেষক পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন স্বীকার করতে। কারণ তার শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান পুরো বইতে লিখেছেন যে, চাকমাদের ইতিহাস মিথ্যা। বিরাজ মোহন দেওয়ান লিখেছেন — সতীশ কুমার, তার গুরু, যেটি লিখেছেন সেটি মিথ্যাচার। আমরা এখানকার লোক না, বাইরে থেকে এসেছি। ১৮৬০ সালে লিউইন এখানে আসেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা করার পর। তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই লিউইনের গবেষণাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গবেষণার ক্ষেত্রে সূত্র হিসেবে ধরা হয়। লিউইন তাঁর বইতে বলেছেন, চাকমারা এবং অন্য উপজাতিরা সব এখানে বাইরে থেকে এসেছে। পার্ন বলে আরেকজন গবেষকের গবেষণা রয়েছে। তাতেও দেখা যাবে তারা বাইরে থেকে এসেছেন। আমাদের দেশের দু'জন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গবেষক প্রফেসর আবদুল করিম ও প্রফেসর মুহাম্মদ আলমগীর সিরাজ উদ্দীন— তাদের গবেষণাতেও রয়েছে চাকমারা বাইরে থেকে এসেছে। তাহলে চাকমা গবেষকরা নিজেরা বলছেন, আমরা বাইরে থেকে এসেছি। ইংরেজ গবেষকরা বলছেন, 'এরা বাইরে থেকে এসেছে', মুসলমান বাঙালী গবেষকরাও বলছেন 'এরা বাইরে থেকে এসেছে'। শুধু আমাদের সরকার বাহাদুর জানেন চাকমারা ভেতর থেকে এসেছে।

তাহলে যারা এ অঞ্চলের ভূমিপুত্র নয়, তারা কোন্ অধিকারে মাত্র ০.২২ ভাগ হয়ে বারো কোটি মানুষকে বলে, আপনারা এখানে ঢুকতে পারবেন না। চাকমা জনসংহতি সমিতির যে পাঁচ দফা, এর অন্যতম দাবি হচ্ছে যেটি সরকার মেনে নেবে–বাঙালীরা আর পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে পারবেন না। বেড়াতে যেতে পারবে না, কাঠ কিনতে যেতে পারবে না। কোনো প্রয়োজনে যেতে পারবে না। বসতি স্থাপন করতে যেতে পারবে না। কোনভাবে যেতে পারবে না। যদি যেতে হয় রিজিওনাল কাউন্সিলের পারমিশন লাগবে। অর্থাৎ নিজের দেশের মধ্যে সে দেশের জনগণকে ভিসার মাধ্যমে যেতে হবে। চমৎকার দাবি! অথচ আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারে বলা হচ্ছে, প্রজাতন্ত্রের নাগরিক যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় তার প্রয়োজনে দেশের যে কোনো প্রান্তে যেতে পারবে যদি আইনত কোনো অপরাধী বা দেশদ্রোহী না হয়।

চাকমারা শান্তিবাহিনী গঠন করেছে। জুম্মল্যান্ড কথাটা এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন তারা বলছে চাকমাল্যান্ড। দু'একজন ব্যতিক্রম আছেন। তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। অন্য উপজাতিদের সাথে দেখা করেছি। ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে আমরা বেরিয়েছি রাত পর্যন্ত। সবাই বলেছে, ভাই, আমরা ওদের সঙ্গে নেই। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই। এবং এরা কেউ শান্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত নয়। দু'একজন মারমা বা ত্রিপুরা ছাড়া। ওদের নেতাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, চাকমা মেজরদের সাথে। তারা প্রত্যেকে বলেছে 'মুসলমানকে থাকতে দেবো না'।

মুসলমানরা না-কি তাদের জোর করে মুসলমান করে ফেলেছে। ত্রিশ বছরের ইতিহাসে মাত্র ১৭ জন মুসলমান হয়েছে। তাও বিবাহের মাধ্যমে। চাকমা মেয়েকে কোনো ছেলে বিয়ে করেছে তখন সে মুসলমান হয়েছে, চাকমা ছেলে কোনো মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছে তখন সেই ছেলে মুসলমান হয়েছে। এভাবে ১৭ জন। আমি বাঙালী পল্লী গুচ্ছগ্রাম 'কনসেন্ট্রেশন' ক্যাম্পে গিয়েছি। মাওলানা সাহেবকে বলেছি 'কি হুজুর আপনারা না-কি জোর করে মুসলমান বানিয়ে ফেলেন'। তিনি একটি করুণ হাসি দিলেন। বললেন, 'ইসলামে তো জোর করে মুসলমান বানানোর কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং সেটা কি করে সম্ভব'। আমরা দেখলাম খৃষ্টান মিশনারীরা ব্যাপক হারে খৃষ্টান বানাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। অভিযোগ হচ্ছে ১৭ জন মুসলমান হয়েছে ত্রিশ বছরের মধ্যে, যদিও বিয়ের মাধ্যমে। এসব অভিযোগ করে যারা এখানকার

ভূমিপুত্র নয়। সংবিধানের থার্ড পার্টের ৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক যে কোনো সময় যে কোন জায়গায় যেতে পারবে। ব্যবসা–বাণিজ্য করতে পারবে। বাসস্থান, জায়গা জমি কিনতে পারবে। ৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে এটিকে আরো শক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

চাকমাদের জন্যে সরকার একজন বাঙালীর চেয়ে একুশ গুণ বেশী সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ ২১ জন বাঙালী যা পাবে একজন চাকমা তা পাবে। শুধু তা-ই নয়, দু'কোটি টাকা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি ঠিকাদারির কোনো কাজ শুরু হয় তাহলে তা চাকমারা পাবে। এর বেশী হলে বাঙালী, চাকমাদের সঙ্গে মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার। এখন ২০ কোটি টাকার কাজ যদি শুরু হয় পরিষদ সঙ্গে সঙ্গে দশ ভাগে ভাগ করে ফেলে। এটাকে দু'কোটির পর্যায়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ফলে বাঙালীদের পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই হলো অবস্থা। আবার উপজাতীয়রা ৫% হারে ব্যাংক ঋণ পায়, বাঙালীরা ১৮% হারে। বাঙালীদের ট্যাক্স দিতে হয়, উপজাতীয়দের দিতে হয় না। উপজাতীয়দের কোটা আছে, বাঙালদির নেই। এমন বৈষম্য চলছে।

অনেকেই জানেন না, নদী শিকস্তি, নদী তীরের মানুষেরা গিয়েছে। সেখানে অনুর্বর জমিকে উর্বর করেছে। মাছের চাষ করেছে, বাগ বাগিচা করেছে। বিভিন্ন রকম ফার্ম করেছে। সবাইকে সেখানে একদিনের নোটিশে ওখান থেকে চলে আসতে হয়েছে। আমরা স্পীডবোটে করে একটি গুচ্ছগ্রাম ইসলামপুরে গিয়েছি। সেখানে জেনেছি চাকমারা কুকুর–বিড়ালের মতো মানুষকে মেরেছে। সবার উদ্‌ভ্রান্তের মতো কান্না। আমার একটা ডায়েরী ছিলো, সেই নোটবুকে আমি লিখছিলাম। অনেক সাধারণ মানুষ ভাবলো, বোধ হয় তিনি সাংবাদিক। বলে 'স্যার আমাদের কথা লেইখেন। স্যার আমাদেরকে ভুলে যাইয়েন না'। স্পীডবোট ধরে রাখছে। বলছে, 'আমাদেরকে ছেড়ে যাইয়েন না'। চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। এরকম আমরা সকল জায়গায় দেখেছি। কোথাও আমি বাঙালীদের মধ্যে কোনো হাসি দেখলাম না। চাকমা নেতারা আমাদেরকে অসংকোচে বলেছে, 'বাঙালীদের আমরা থাকতে দেবো না'। একেবারে সরাসরি। ব্রিগেডিয়ার আশফাকের সামনে। আরো চার পাঁচজন কর্নেল-মেজর উপস্থিত। অনেক অফিসার-সিপাহী উপস্থিত। এয়ার ফোর্সের দুই পাইলট উপস্থিত। আমাদের মিলিটারীদের সঙ্গে মেশিনগান আছে, তথাপি কিছু করার নাই। 'এখানে আপনাদেরকে থাকতে দেবো না। এখানে মুসলমানদেরকে থাকতে দেওয়া হবে না'। বলছে, 'এটা আমাদের জায়গা'। আমি যে চাকমা ছেলেটিকে চার বছর পড়িয়েছি সে এখন রাঙ্গামাটির চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা। আমি তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়িয়েছি। সেকেন্ড ইয়ারে পড়িয়েছি, থার্ড ইয়ারে পড়িয়ছি, এম এতে পড়িয়েছি। তার সঙ্গে আর দেখা করার তেমন কোনো সুযোগ নেই। সে হয়তো এখন আমাকে বুঝতে পারবে না। সে যদিও মনোনীত চেয়ারম্যান, তবুও মনের অবস্থা হয়তো আগের মতো নেই। দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবের সাথে কথা বলেছি — যিনি আওয়ামী লীগের খাগড়াছড়ির দীর্ঘদিনের সভাপতি ছিলেন। তিনি একেবারে পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। তার আওয়ামী লীগ তাকে রক্ষা করছে না। তার একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবের চাপদাড়ি মেহেদীরাঙা। দশাসই চেহারা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আওয়ামী লীগের

প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। জীবনের তরুণ বয়স থেকে। এখন বৃদ্ধ পৌঢ়। তিনি হতাশাগ্রস্ত, চুক্তি সই হওয়ার পর তার শরীর ঠিক থাকবে কি-না তিনি জানেন না, না-কি তিনি লাশ হয়ে যাবেন। সবার সামনে তিনি এটা ব্যক্ত করেছেন। কিছু করার নেই। আমরা শুধুমাত্র পুতুল হয়ে বসে আছি। অথচ তাঁর সরকার, তাঁর দলীয় সরকার ক্ষমতায় আছেন। সংবিধান মানে না যে সরকার, যারা দেশের ভূমিপুত্র নয় তাদেরকে ভূখণ্ড দিয়ে দিতে চায়।

বাংলাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, এ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। এখানে হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট আরো অনেকগুলো বাড়ানো যেতে পারে। যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে যায় তবে চট্টগ্রাম খুবই শীর্ণ হয়ে যাবে। রণকৌশলগত ও ভূকৌশলগত দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইন্ডিয়া নিয়ে নিতে চেয়েছিল। নেহেরুদের প্রবল বাধার পরেও আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম পেয়েছিলাম রেডক্লিফ এওয়ার্ডের মাধ্যমে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে চট্টগ্রামের অবিচ্ছিন্ন উপাদান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বেদখল হয়ে গেলে ভারত মিজোরাম থেকে, ত্রিপুরা থেকে দ্রুত এসে অতি সহজেই চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে নিতে পারবে এবং সাগরে যেতে পারবে। তখন বাংলাদেশের জলসীমা সম্পূর্ণরূপে তাদের দখলে চলে যাবে। তখন আপনারা সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে যাবেন। বার্মার দিকে বেরুতে পারবেন না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। স্থলপথে মায়ানমার হয়ে আপনি যে এশিয়ান হাইওয়ে চেয়েছিলেন সেটিও আপনি পাবেন না। তখন সেটি হয়ে যাবে ভারতীয় সীমান্ত। আপনার কিছুই করার থাকবে না। যদি কাপ্তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রের সুইচ অফ করে দেয় তাহলে সারা দেশের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার কিছু করার নেই। চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, স্টীল মিলসহ শিল্প–কারখানা যা রয়েছে সবগুলির নিয়ন্ত্রণ তাদের নিকট থাকবে, আপনার কিছুই করার নেই। চুক্তির মধ্যে একটি অংশ আছে — সেটি হচ্ছে পুলিশের সাব ইনসপেক্টর এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে এই শান্তিবাহিনী। শুধু উপজাতীয়রা চাকরি পাবে। চেয়ারম্যান থাকবে তাদের। ভাইস–চেয়ারম্যান হলেও থাকবে তাদের। ৫০% বাঙালীরা সেখানে প্রতিনিধিত্ব পাবে না। সকল সিদ্ধান্ত থাকবে তাদের, কিছু করার থাকবে না। পার্বত্য এলাকায় কিছু হেলিপ্যাড (৭৩টি) আছে। সেখানকার হেলিপ্যাডগুলি যদি নষ্ট করে দেয় তাহলে সেখানে অবতরণ করা যাবে না। অনেক সামরিক বাহিনীর সদস্য, সিপাহী থেকে শুরু করে লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল পর্যন্ত আমাকে বলেছেন, তারা ছুটি পেয়েছেন কিন্তু ভোগ করতে পারেননি। ক্যাপটেন মোস্তাক যিনি ঘাঘরা ক্যাম্প-এ আছেন, শান্তিবাহিনীর থেকে দু'শ গজ দূরে, কুকীপাহাড় বা কালো পাহাড়ের পাশে। তিনি ছুটি চাচ্ছেন কিন্তু কালাপাহাড় ক্যাম্প থেকে বেরোতে পারছেন না। কমান্ডিং অফিসারও ছাড়েন না। ক্যাম্প চলবে কি করে। সেনা সদস্যরা মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমায়। কিছু করার নেই। চাকমারা মিথ্যাচার করছে, বলছে চাকমা মেয়েদের সম্ভ্রম নেওয়া হচ্ছে। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে উল্টো। একজন সিপাহী কোথাও যেতে পারে না। দশজন সিপাহী যাবে বাজারে, সঙ্গে যাবে একজন এনসিও বা জেসিও। কিংবা একজন মেজর বা ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের একজন তার সাথে যেতে হবে। কোনো জেসিও, এনসিও বা অফিসার

না গেলে কোনো সিপাহী যাবে না। একটি কেইসে একটি চাকমা মেয়ে শুধু বলেছিল তার হাত ধরেছে এক সিপাহী। কিন্তু কেউ দেখেনি। অন্য চাকমারা তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এনেছে। এই সিপাহী অস্বীকার করলেও কোনো কিছু আসে যায় না। ব্রিগেডিয়ার আশফাক সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোর্ট মার্শালে পাঠিয়ে দিলেন। তিন মাসের জেল হলো এবং একজনের চাকরি চলে গেলো। ব্রিগেডিয়ারের ভাষায়, 'প্যাক হীম আপ এ্যান্ড কোর্ট মার্শাল'। আমি যেখানে গিয়েছি, ক্যাম্পে বা সেনা অবস্থানে জায়নামাজ পেতে রাখা হয়েছে। সিপাহীরা নামাজ পড়ছে। এভাবে সিপাহীদেরকে ভাল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে এরা অনাচার করছে। এই সিপাহীদের বিরুদ্ধে যখন শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এমবুশ করে সেনাবাহিনীকেই মারতে গিয়ে আহত হয়, তখন তাদেরকে জাতীয় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করেই সিএমএইচ-এ এনে চিকিৎসা করা হয়। মশার কামড়ে যখন ম্যালেরিয়া হয়ে চাকমারা মরতে বসে তখন ওদের শত্রুরূপী বাঙ্গালী সেনাবাহিনীই ওদের সেবা-শুশ্রষা করে। অথচ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তারা অনাচার করছে। সেনাবাহিনী এখানে জেনারেটর দিয়েছে। সংগীতের জন্যে গীটার দিয়েছে। শিল্পকর্ম করার জন্যে, কাপড় বোনার জন্যে এরা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই সামরিক বাহিনী জঙ্গলকে সাফ করে মানুষ করছে। শুধুমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধে তারা চলে যাবে। কখনো কখনো কোনো সামরিক অফিসার বলছেন, ইচ্ছে করে চাকমা হয়ে যাই। কারণ চাকমা হলে পাবো একুশগুণ সুবিধা। আমি আর বাঙালী থেকে কি লাভ। এই এক-দশমাংশ অরণ্য, নদী ,পাহাড়, উপত্যকা দিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই অঞ্চলের উপর খবরদারী হারাতে হবে। এই অঞ্চলের সকল সম্পদরাজি হারাতে হবে। চট্টগ্রাম পোর্ট হারিয়ে যাবে। আর স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন যদি সফল হয় তবে ড. আবদুর রবের চৌকোণ আকার বাংলাদেশও থাকবে না। তখন পোকায় খাওয়া ম্যাপ তৈরী হবে। তখন চালনা পোর্টও বেদখল হয়ে যাবে। আপনি কিছু করতে পারবেন না। নেপালের দিকে তাকান। নেপাল অনেক কেঁদে-কেটে ট্রানজিট পেলো। নেপাল যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো তখন দেওয়া হয়নি। তখনি দেওয়া হলো যখন ইন্ডিয়া আমাদের কাছে করিডোর চায়। নেপালে যেদিন থেকে ট্রানজিট স্ট্রার্ট হবে, সেদিন পনের মিনিট মাত্র। নেপালের একটি ট্রাক স্ট্রার্ট করেছে। এটি ঢুকতে গেছে। সাথে সাথে আবার ইন্ডিয়া বলছে, আমরা ঢুকতে দেবো না। নেপালের ট্রানজিট শেষ হয়ে গেলো। বাংলাদেশ সরকারের কোনো সাধ্য নেই ইন্ডিয়াকে প্রতিরোধ করার, মুখে অন্তত বলার যে, ভাই ওদের সাথে তো চুক্তি করেছি, সেটি রাখতে দাও। তোমাদেরকে সবই দিয়ে দিবো, তবু এটি সৌজন্য করো। তাও বলার সাধ্য নেই। আজকে আমি দেখেছি পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে ভারতীয়রা অভিযোগ করেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী না-কি বাংলাদেশের সরকারের অগোচরে উলফা গেরিলা এবং মিজোরামের গেরিলাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে। বিষয়টি কিন্তু উল্টো। আমাদের বর্ডারের বাইরে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবানের বাইরে অন্তত পঁয়তাল্লিশটা ক্যাম্প আছে, যার প্রত্যেকটির ম্যাপ আমার কাছে আছে। এবং সেসব ক্যাম্পে কতজন ডাক্তার আছে, কতজন ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের আছে, কত অফিসার আছে, কত সিপাহী আছে, কি কি অস্ত্র আছে, কি কি গোলাবারুদ আছে, তা আমাদের সামরিক বাহিনী জানে। কোন্ জায়গায় 'এক্সপ্লোসিভ' তৈরী হয়,

কোন্ জায়গায় কার্বাইন, কোন্ জায়গায় সাব মেশিনগান কতটা আছে, কতটা একাত্তর সালে পাওয়া চীনা রাইফেল আছে, কোন্ জায়গায় ভারতীয় তৈরী অস্ত্র কতটা আছে সব কিছুর তালিকা আছে। অথচ সরকার সেগুলি জেনেও জানেন না। আমাদের সামরিক বাহিনী সেটি জানে। সামরিক বাহিনী বোঝে যদি তারা একবার এখান থেকে চলে আসে, তাহলে এতো প্রচণ্ড সংঘাত হবে, সামরিক বাহিনী আর ঢুকতে পারবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় পাঁচশ' সাতচল্লিশটি ক্যাম্প আছে। ৮টি বড় এসটাবলিশমেন্ট আছে। তিনটি গ্যারিসন বা ক্যান্টনমেন্ট আছে। তিনটি ক্যান্টনমেন্ট রেখে বাকি সবগুলি তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ৫৪৭টি ক্যাম্পের মধ্যে ৭৩টি ক্যাম্প এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, সেসব ছেড়ে দিলে বাংলাদেশ চলে যাবে। সেখানকার সুউচ্চ পাহাড়ে ল্যান্ড করার হেলিপ্যাডগুলো চলে গেলে সেখানে চাকমা সৈন্যরা ঘাঁটি করে বসবে। ফলে এখানে থেকে আমরা কখনো যেতে পারবো না সেখানে। ল্যান্ড করার সুযোগ পাবো না।

সেখানে এমবুশ করে থাকলে কি হবে তার একটি নমুনা শুনুন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, দুর্গমপথে আমরা যাচ্ছি প্রায় বিশাল বহর কনভয়টিতে এগিয়ে। বেশ রাত। আমাদের সঙ্গেই গাড়ীতে আলোচনা হচ্ছে। এসব জায়গায় এমবুশ হয়। কিছুদিন আগে নয়জন সৈন্য মারা গেছে চাকমাদের এমবুশে। আমি যে গাড়িতে ছিলাম সেটি চালাচ্ছিলেন মেজর শাহনূর জিলানী। রাঙ্গামাটির দিকে যাচ্ছিলাম। একটা জীপ আগে চলে গিয়েছিল। আমার গাড়িতে বসা। একটা ক্যাম্পের সামনে এসে আগের এসকর্ট গাড়ী থেমে যাওয়ার পর আমাদের গাড়ীতে বসা এক সিপাহী চিৎকার করে বলছে, 'এই যে ভাই, আপনারা আগে যান গিয়া ক্যান। আমাগো মাইরা ফালাইবো না'। অর্থাৎ প্রতি মহূর্তেই এমবুশের সম্ভাবনা আছে। কিছুদিন আগে এখান দিয়ে একটা কনভয় যাচ্ছিলো। রাস্তায় মাইন পোঁতা ছিলো। প্রথম গাড়িটি আসার সাথে সাথে সেই গাড়িটি উড়ে গেলো। মানুষসহ গাড়ী একেবারে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো। একজন সিপাহী শুধু সারা জনমের জন্যে পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছে। খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, শান্তিবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েই গিয়েছিলো। একদিকে আলোচনা চলছে অন্যদিকে চাপও সৃষ্টি করা হচ্ছিলো। এর ফলে শান্তিবাহিনীর আর উপায় ছিলো না। শান্তিবাহিনী কিন্তু এক সময় বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতি করতে রাজী হয়ে গিয়েছিলো। শান্তিবাহিনী কিন্তু সে কথা রক্ষা করেনি বরং পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি চাঁদা যে নিতো সেটার হার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। যদি গাছ লাগান তবে আপনাকে দশ টাকা দিতে হবে। আপনি যদি মোটর সাইকেল চালান তবে আপনাকে দুশ' বা তিনশ' টাকা দিতে হবে। আপনি যদি ট্রাক চালান তাহলে চাঁদা দিতে হবে। মাছের চাষ করলে টাকা দিতে হবে, চাকরি করলে বেতন পেয়ে প্রথম দিন ৩% আপনাকে দিতে হবে। না হলে সন্ধ্যার সময় আপনার লাশ পাওয়া যাবে। আপনি যদি ঠিকাদার হন তাহলে ১০% থেকে ১৫% আপনাকে দিতে হবে, না হলে আপনার লাশ পাওয়া যাবে। আপনি যদি বাজারে মুদি দোকান চালান প্রতিদিনই আপনাকে চাঁদা দিতে হবে। অর্থাৎ একটা ট্যাক্স কালেকশন সিস্টেম তাদের আছে। প্যারালাল গভর্নমেন্ট তারা চালাচ্ছে। এই ফাঁকে তারা একটা ব্রীদিং স্পেস পেয়েছে। তারা ১০৯২ বার এমবুশ করে আক্রমণ করেছে। বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে, ধরে নিয়ে গেছে, অর্থাৎ শান্তিবাহিনী নিজের দেওয়া

সীজফায়ারের ব্যাপারটি তারা ভেঙে ফেলেছে। শান্তিবাহিনী যদি একবার এখানে বসে যায়, তাহলে শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হবে। আমাদের এখানে জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী এসেছিলেন, যিনি ভারতীয় সেনানায়ক। তিনি বর্ডারের ওপাশে ডাইরেন্ডিতে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলে, যেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দেয়া হয় সেখানে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমি মনে করি অচিরেই চাকমারা অবশ্যই দেশে ফিরে যাবে। তবে বাংলাদেশে নয় স্বাধীন জুম্মল্যান্ডে ফেরত যাবে। এটি তিনি ঘোষণা করেছেন, যা কলকাতার আলোকপাত ও ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এসেছে। ভারতীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা সব সময় বলেছেন, এটি জুম্মল্যান্ড, ভারতীয় সরকার আজকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে তাদের ওখানে নাকি কোনো শান্তিবাহিনী নাই। অথচ শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যে চুক্তি হচ্ছে এটিই এখানে গত এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা হচ্ছে। আলোকপাত পত্রিকার এক সাংবাদিক নিজে লিখেছেন আগরতলা এবং ত্রিপুরার ছোট ছোট দশ বারো বছরের বাচ্চারাও জানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ভারতের ত্রিপুরাতে। তারাও যখন স্বীকার করছেন, আমাদের সরকার করছেন না। পানি সম্পদ মন্ত্রীর মতো অবস্থা। ওখানে ভারতীয় সেচমন্ত্রী বলছেন, 'আমি পানি দেই নাই, বাংলাদেশকে পানি দেই নাই, অথচ আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রী বলছেন, আমি পানি পেয়েছি'।

আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই, Time is running out. সকল দল যারা বাঙালীর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ভাবতে অবাক লাগে, যারা বাঙালীর কথা বেশী বেশী বলেন সেই বাঙ্গালী ওখানে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্যে এদের দুঃখ নাই। মাথায় পট্টি বাঁধেন, হাতে তসবীহ নেন। অথচ এখানে তসবীহওয়ালীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন। অথচ এরা কিছুই করছেন না। চাকমা শান্তিবাহিনী বাংলাদেশের শত্রু। এ শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এক নম্বর ইস্যু হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলাম রক্ষা করা এবং সেটি রক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করা, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে রক্ষা করা, আমাদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করা। সেসব রক্ষা করতে হলে একটি কাজ করতে হবে। সেটি শুরু করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর ব্যাপারে আমরা যদি চুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে সব ভেস্তে যাবে। আজকে লিখে রাখুন। সরকার হয়তো চুক্তি করে ফেলেছে। শুধু আপনাদেরকে দেখানো হবে। সরকার এ জিনিসটি প্রকাশ্যে এনে ফেলার আগেই আপনাদের যা করার করেন। যদি দেরি করেন তাহলে সময় পেরিয়ে যাবে। তারপর কিছুই করার থাকবে না। দু'টি উদাহরণ দেখাই। একটি হচ্ছে বেরুবাড়ী। দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, অথচ পঁচিশ বছরের মধ্যে তিন বিঘা ফেরত পাননি। ওখানে সার্বভৌমত্ব ওদের। আপনাকে ঢুকতে দেয় না, নড়তে দেয় না, চড়তে দেয় না, চার ঘণ্টার জন্যে ঢুকতে দেয়। প্রতিশ্রুতি ছিলো বেরুবাড়ী দেবেন, তিন বিঘা পাবেন। একটা গলি মাত্র। পেলেন না। দু'নম্বর হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান ফারাক্কা বাঁধ চালু করতে দিয়েছিলেন, চালু করার ফল দেখতে পেয়েছেন। রাজশাহী শুকিয়ে শেষ। পদ্মা কোথাও এক ইঞ্চি, কোথাও তিন ইঞ্চি, পদ্মা দুই হাত, দশ হাত, পদ্মা একশ' গজ। প্রমত্তা পদ্মার এই অবস্থা। ফারাক্কা এই কাজ করে ছেড়েছে। দু'টি কাজ করেছিলেন পিতা। তৃতীয় কাজ কন্যা পূরণ করছেন।

সেটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে চট্টগ্রামকেই দিচ্ছেন। আর সার্বভৌমত্ব শেষ করে দিচ্ছেন। যদি আপনারা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হন, যদি ইসলাম আপনাদের ধর্ম হয়, যদি বাংলাদেশকে আপনারা ভালোবাসেন তবে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেন শুধু শফিউল আলম প্রধান সাহেব জেলে যাবেন, অন্যরা কি করবেন? শুধু মুহিউদ্দীন খান সাহেব বলবেন, শুধু খালেদা জিয়া বলবেন, শুধু জামাত বলবে, শুধু ইসলামী ঐক্যজোট বলবে। বাকিরা বসে থাকবে। এটি কি করে হতে পারে? প্রতিটি মানুষকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি না করেন, তবে প্রস্তুত হন আপনারা ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে। যদি না করেন, তবে প্রস্তুত হন আপনার ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। যদি না করেন, তবে প্রস্তত হন আপনার স্বাধীনতা ত্যাগ করার জন্য। যদি না করেন, তবে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি একটি নোংরা ময়লা শব্দে পরিণত হবে। আপনি কখনো তা উচ্চারণ করতে পারবেন না, কারণ আপনি লজ্জিত হবেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধের ফসল যে চট্টগ্রাম সেই চট্টগ্রামকে আপনি হারাচ্ছেন। এই চট্টগ্রাম থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলো। অথচ এই চট্টগ্রাম আজকে শত্রুকবলিত। আপনি কি চট্টগ্রামকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসবেন? এই এ্যাপীল আপনাদের কাছে। এবং যে যেখানে আছেন এই বক্তব্য প্রচার করবেন। যে যেখানে আছেন সেখানে প্রতিবাদ করবেন। আল্লাহ্ আমাদের তওফিক দিন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অতন্ত্র জনতা, বাংলাদেশ-এর সেমিনারের প্রদত্ত বক্তৃতা। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তন। ২৯ অক্টোম্বর, ১৯৯৭। আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম !! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ, অতন্ত্র জনতা বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ শেষ মুহূর্তের সাবধান বাণী

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

বর্তমান সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর যে চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে, তাতে লুকোছাপার বিষয়টি সর্বাধিক সন্দেহজনক। মনে হয়, সরকার ও শান্তিবাহিনী — উভয় পক্ষের নিয়তে গলদ আছে। এই চুক্তি কেবল আওয়ামী সরকার ও ভারতীয় মদদপুষ্ট চাকমা সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে হতে যাচ্ছে। জনমত, সংসদ, সংবিধান, নির্বাচনী ম্যান্ডেট, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, গণতন্ত্র — কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনি আওয়ামী সরকার। অন্য কোনো সংসদীয় দলের প্রতিনিধিত্বও বাস্তবে এতে নেই।

এই চুক্তি বাংলাদেশ সংবিধানের বিরোধী ও অবৈধ। এটি ইউনিটারী বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কনসেপ্টের বিরোধী। সংবিধানে স্পেশাল স্টেটাস, স্বায়ত্তশাসন, রিজিওনাল কাউন্সিল, আলাদা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ইত্যাদির সুযোগ নেই। আলাদা পুলিশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতে অনুমতি, বাঙালী বহিষ্কার ক্ষমতা, জমির মালিকানা ও কর্তৃত্ব, ট্যাক্স আদায়ের সুযোগ ইত্যাদি কিছুই ভারতীয় ভূখণ্ডে লালিত শান্তিবাহিনীকে দেওয়া যায় না। এটি অর্থাৎ এই চুক্তি দেশ, জাতি, জনগণ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র এবং ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। ১২ কোটি মানুষের সমাজে কেবল ০.২২% বহিরাগত চাকমাদের নামে শান্তিবাহিনীর হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দিলে, দেশের সর্বাধিক সমৃদ্ধ এক-দশমাংশ এবং ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড ছেড়ে দিলে, তা আমাদের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করবে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চল, চট্টগ্রাম বন্দর, বঙ্গোপসাগরে আমাদের জলসীমা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের গেইটওয়ে, চট্টগ্রামের পুরুত্ব (thickness)--সব কিছু হাতছাড়া হবে আমাদের। পার্বত্য চট্টগ্রামের রিসোর্স পোটেনশিয়ালও হাতছাড়া হবে। দেশের অর্থনীতিতে ধস্ নামবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক-সামরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে ভারত আপারহ্যান্ড পাবে এ অঞ্চলে।

এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে এতদঞ্চলে শান্তি ও স্থিতি বিনষ্ট হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আরো অশান্তি তৈরি হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা মর্যাদা, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর শান্তিবাহিনী তথায় জেঁকে বসবে। তারা বাঙালী মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করবে। এর আগে ধর্ষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, চাঁদাবাজি, লুটপাট, অগ্নিকাণ্ডে ঘর জ্বালানো, হত্যা

ইত্যাদির শিকার হবে বাঙালী মুসলমানরা। যেমনটি এযাবৎ ঘটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, তা বহুগুণে দ্রুততম সময়ে ঘটে যাবার বাস্তব ও সমূহ আশংকা আছে। এদিকে চাকমা শান্তিবাহিনী তখন "জুম্মল্যান্ড ন্যাশনাল আর্মী" ও "জুম্মল্যান্ড ন্যাশনাল ফ্রন্ট" নিয়ে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগোবে। ইতোমধ্যে সে সংবাদ বেরিয়ে গেছে। তারা আসলে "জুম্মল্যান্ড"–ও নয়, বরং "চাকমাল্যান্ড" বানাতে চায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে। এরপর তারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এতদঞ্চলকে বাংলাদেশ থেকে, ভারতীয় সামরিক সহায়তা নিয়ে। ভারত এতদঞ্চলে তাদের ভূ-কৌশলগত, সামরিক, আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্যে শান্তিবাহিনীকে দিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য উদ্ধার করছে। চট্টগ্রাম বন্দর ও বঙ্গোপসাগরের বহির্দ্বার দখল, কলকাতা বন্দরের সমস্যা কাটানো, সাতবোন রাজ্যের ল্যান্ড-ব্লক্‌ড অবস্থা থেকে মুক্তি, সাতরাজ্যের সম্পদরাজির এক্সপ্লয়টেশন, চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতে কৌশলগত প্রতিরক্ষা-পশ্চাৎভূমি লাভ ও সাগরের যোগাযোগ রক্ষা, বাংলাদেশকে কব্জায় রাখা, স্বীয় দেশীয় গেরিলাদের দমানো ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ এক্ষেত্রে ভারতের রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণের পিছনে। আর আমাদের সরকার নতজানু নীতি, জিদ, অজ্ঞতা ও সংকীর্ণ ক্ষমতার স্বার্থে এই ফাঁদে পা দিয়েছে।

মোটকথা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের চুক্তি অন্যান্য ক্ষুদে উপজাতি সহ তথাকার বাঙালী মুসলমান এবং এই প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেশবাসীর জীবনে সমস্যা ও সংঘাতের সৃষ্টি করবে। এটি খুব বিচিত্র হবে না, যদি নিকট বা কমপক্ষে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ও ভারতকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি মারাত্মক জট পাকিয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এমতাবস্থায় কোনোভাবেই সেনাবাহিনীকে সরানো যাবে না, কোনো ক্যাম্প বাতিল করা যাবে না। নচেৎ ভারত ও শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হয়ে যাবে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, দলসমূহ এবং জনগণকে শেষ সময় পেরিয়ে যাবার আগে শেষ বারের মতো সাবধান হতে, সচেতন হতে অনুরোধ করছি। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের চুক্তি নেতিবাচক ও মারাত্মক ক্ষতিকর ফল দেবে।

এটি ছাপা হয়েছে ১১/১১/৯৭ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম-এর মন্তব্য প্রতিবেদনে।

সাপ্তাহিক বিক্রম-এর ২৫ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায়।

এটি প্রচারপত্র আকারেও ছাপা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্যচুক্তি বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা শান্তি-বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে তার ফলে শুধু যে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঁচ লক্ষ বাঙালী জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা-ই নয়, বরং এ চুক্তির ফলে দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামসহ সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আগামী মাসের যে কোনো দিন ঐ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য-চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় বসবাসরত অর্ধেক জনসংখ্যা তথা বাংলাভাষী অধিবাসীগণ মুহূর্তেই সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধ ১৩,২৫০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-ভাগের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের সরকার, রাষ্ট্র এবং জনগণের কাছ থেকে চিরতরে বহিঃশক্তির ক্রীড়নকদের হাতে চলে যাবে।

উপরোক্ত অভিমতটি প্রকাশিত হয়েছে আমাদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত দু'টি সাম্প্রতিক গবেষণার আলোচ্য বিষয়বস্তুতে। এতদ্ব্যতীত, আমরা "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব" শীর্ষক গবেষণাভিত্তিক সেমিনার উপস্থাপনায় উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছি।

গবেষণাপত্র দু'টিতে তত্ত্ব, তথ্য ও প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত সহযোগে আমরা দেখিয়েছি যে, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক-দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির মালিকানা, প্রশাসনিক কাঠামো, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের নীতি-নির্ধারণের বিষয়যুক্ত ঐ প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পাদনে একদিকে সরকার যেমন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিসম্বলিত জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে গেছে, অন্যদিকে সরকার ঐ চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেক জনসংখ্যা (প্রায় ৫০%) বাংলাভাষাভাষীদের মতামতকেও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। তাছাড়া প্রস্তাবিত ঐ

চুক্তির ধারাসমূহের বাস্তবায়ন পার্বত্য বাংলাভাষী বাঙালী জনগণের মৌলিক অধিকার যা বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করবে। আমাদের মতে, দেশের সরকার বা কোনো গোষ্ঠী আইনসঙ্গত উপায়ে দেশের সংবিধান সংশোধন না করে কোনোমতেই এরকম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

আমাদের কর্তৃক সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত গবেষণা পত্রদ্বয়ের বিষয়বস্তু থেকে **নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হয় ঃ**

প্রথমতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদেশী মদদপুষ্ট সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রধানতঃ চাকমা-নিয়ন্ত্রিত অবৈধ ও দেশদ্রোহী তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে ইতোমধ্যে খসড়াকৃত এবং অচিরেই সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন ধারার বরখেলাফ। এ চুক্তি সম্পর্কে জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এখানে জনমত পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে; নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনকালীন কোনো ঘোষণায় এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিল না। এটি সরকারী দলের ম্যানিফ্যাস্টো ও কর্মসূচীতে নেই। জনগণ তাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো ম্যান্ডেট দেয়নি। সংবিধান, সমগ্র জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং পুরো বাংলাদেশের ভবিষ্যতের এবং এতদঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথ অনুধাবনকরতঃ বিবেচনা করলে সরকার এ ব্যাপারে অন্তত জনগণকে অবহিত করতো এবং জাতীয় সংসদেও আলোচনা করতো। সরকার ১২ কোটি মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কেবল মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী শান্তিবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে চুক্তি করে বস্তুত রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও জনগণকে অস্বীকার করেছে। আর সেজন্যই এই খসড়া ও সম্ভাব্য চূড়ান্ত চুক্তি অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানে দেশের কোনো অঞ্চলকে বিশেষ মর্যাদা বা স্বায়ত্তশাসন দান এবং এর মাধ্যমে বস্তুত "জুম্মল্যান্ড" প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়ার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ এই খসড়াকৃত সম্ভাব্য চূড়ান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান, ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্মপরিসর, কার্যধারা ও দেশ রক্ষার্থে গৃহীত তাদের যাবতীয় তৎপরতাকে খর্বিত, সীমিত ও বিপর্যস্ত করে তুলবে। বস্তুতঃ এই চুক্তির মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে কেবল সেনানিবাসে সীমাবদ্ধ করে রাখা হবে দায়িত্বহীন অবস্থায় এবং এই প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুততার সঙ্গে উঠিয়ে নেওয়া হবে দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের গভীর অরণ্য, পর্বত ও দুর্গম এলাকাগুলিতে ছড়ানো প্রায় সাড়ে পাঁচশত সেনাক্যাম্প। প্রকৃত সত্য এই যে, এই সেনা ক্যাম্পগুলিই প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করছে এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করছে।

তৃতীয়তঃ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় ঐ এলাকার সাড়ে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্প থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হলে দীর্ঘ পরিশ্রম, বিপুল অর্থ ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলা সেখানকার

অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়বে বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ঐ অঞ্চলে সৈন্য ও রসদ সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম হেলিকপ্টার যোগাযোগের জন্য সর্বাধিক জরুরী "হেলিপ্যাড"-সমূহ শান্তিবাহিনীর হাতে চলে যাবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় এগুলি পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থতঃ চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রধানমত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র "কাপ্তাই হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট" সহ অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অবকাঠামোসমূহের বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে চলে যাবে শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত চাকমা-প্রভাবিত শক্তি বলয়ের মুঠোয়। এর ফলে বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ সারাদেশের উপর অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে "স্যাবোটেজ"–এর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে।

পঞ্চমতঃ চুক্তির বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর বৃহত্তর আগ্রাসী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাভের দীর্ঘদিনের বাসনা পূর্ণ হবে। অপরপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বহিঃযোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র হাতছাড়া হবে। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে চট্টগ্রাম বন্দর কব্জা করবে এবং বঙ্গোপসাগরের উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নেপাল-ভূটানের পর্যায়ে চলে যেতে দেরী হবে না।

ষষ্ঠতঃ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু ও হালদা ভ্যালীতে যে বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে, তা সহ ঐ বিশাল অঞ্চলের যাবতীয় বনজ, খনিজ, জলজ ও ভূমিজ সম্পদরাজির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতছাড়া হবে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়। অপরপক্ষে, শান্তিবাহিনী নামধারী চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতায় ঐ সম্পদরাজির নিয়ন্ত্রণ সহজেই ভারতের হাতে চলে যাবে।

সপ্তমতঃ চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ হারালে ক্ষীণকায় মূল চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলদ্বয় ভূ-কৌশলগত এবং সামরিক-রাজনৈতিক দিক দিয়ে সহজভেদ্য ও হুমকিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

অষ্টমতঃ এই চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং দূর-প্রাচ্যের সংযোগস্থল ও প্রবেশ দ্বার (GATEWAY) হিসেবে বাংলাদেশের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব বিনষ্ট হবে। উপরন্তু এর ফলে প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের পক্ষে ভারতকে তোয়াক্কা না করে মায়ানমার দিয়ে সড়কযোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (ASEAN Countries) সংগে যোগাযোগের যে স্বাধীন সম্ভাবনা রয়েছে, তা নস্যাৎ হবে। এশিয়ান হাইওয়ের যে লাভজনক পথ বাংলাদেশের জন্য রয়েছে, চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে সে সম্ভাবনাও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নবমতঃ চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে নিজ দেশে বসবাসরত প্রায় পাঁচ লক্ষ বাংলাভাষী মুসলমান অধিবাসী বিগত আড়াই দশকের চেয়ে হাজার গুণ ভয়াবহ মাত্রায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, উচ্ছেদ ও বহিষ্কারের শিকার হবে। নব্বই ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মুসলমানরাই হবে "পুশব্যাক"-এর টার্গেট। শান্তিবাহিনীর সাথে চুক্তি সম্পাদনের ফলে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরসহ অন্যান্য সদস্য নিয়োগের যে

কর্তৃত্ব শান্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রণাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের রিজিওনাল কাউন্সিল পাবে সেটি নজিরবিহীন ও বৈষম্যমূলক বিধান। এর ফলে সেখানকার বাঙালী জনগোষ্ঠীর উপর হামলা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালু হবে। কার্যতঃ বাঙালীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পথ পাবে না। এছাড়া, আঞ্চলিক পরিষদে আনুপাতিক হারে বাঙ্গালীর প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং চেয়ারম্যানের পদ কেবল উপজাতীয়দের তথা চাকমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখায় ইতোমধ্যে নানাক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রকট বৈষম্য প্রকটতর হবে।

দশমতঃ চুক্তিটির বাস্তবায়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি স্থায়ী সংঘাতের জন্ম দেবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে বাঙালীদের উপর ব্যাপক গণহত্যা চালাবে না— এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা স্থায়ী সংকটে নিপতিত হবে। এতে দেশে গৃহযুদ্ধের আশংকাও রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট তথাকথিত "স্বাধীন বঙ্গভূমি" আন্দোলন এবং শিলচর-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত "সিলেট বিচ্ছিন্নতা"র আন্দোলনও মাথাছাড়া দিতে পারে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সংগে অসাংবিধানিক ও দেশের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী যে চুক্তি করা হচ্ছে, তার স্বাক্ষর গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বেই দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ১২ কোটি বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে একবার বিষয়টি 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এর সীমায় চলে গেলে আর কারো কিছুই করার থাকবে না।

এটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রাম, নিউ নেশন পত্রিকায়। আরো প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক বিক্রম পত্রিকায়। এটি আরো প্রকাশিত হয়েছে অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক সংকলন গ্রন্থে। এটি পঠিত হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাব-এ অতন্দ্র জনতার সেমিনারে ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭ এ। রেফারেন্স সহযোগে এর সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরে উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল,দৈনিক সংগ্রাম-এ। এটি প্রচারপত্র আকারেও বিলি করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এটির রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে আরো কিছু প্রকাশনায়। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭। এটি আরো প্রকাশিত হয়েছে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন-এর "বিশেষ বুলেটিন" ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায়। এটি প্রচারপত্র আকারেও ছাপা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ অখণ্ড বাংলাদেশ

ড. মুহাম্মদ আবদুর রব

চক্রান্তকারী আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি শুধু হিলট্রাক্টস্‌কেই বিচ্ছিন্ন করবে না। সিলেটকেও তারা বিচ্ছিন্ন করতে চায়, যে সিলেট রক্ষা হওয়ার মাধ্যমে গণভোটের মাধ্যমে আমাদের ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। শুভপুর ব্রীজ থেকে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম তারা বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করছে। মানচিত্র হলে এখন দেখিয়ে দিতাম কি চক্রান্ত। সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারকে কেটে দেবে। বঙ্গভূমির বঙ্গসেনারা রংপুর–দিনাজপুর কেটে দিতে চায়। যা থাকবে সেটা হবে চৌকোস একটা সাইড অব বাংলাদেশ এবং এটারই ম্যাপ বা মানচিত্র তারা ছাপিয়েছে। গোটা জাতি ঘুমিয়ে আছে। বুদ্ধিজীবীরা বলছে তালপট্টি নিয়ে গেলে এটা তো মাত্র আটবর্গ কিলোমিটার। এ তালপট্টি সম্পর্কে বলতে চাই–এই আট বর্গকিলোমিটার তালপট্টি ভাটার সময় বেড়ে হয় বিশ কিলোমিটার। এ সম্পর্কে আমার একটি প্রকল্প প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমি প্রমাণ করেছি, কেউ এর বিপরীতে মত প্রকাশ করতে পারেনি। তালপট্টি একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক এলাকা। এটি শুধু ক্ষুদ্রই নয়, ক্ষুদ্রের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের শরীর।

বলা হয় ক্ষুদ্র মাথাটা তো 'এতোটুকু,' একে কেটে ফেললে কি হয়! কিন্তু মাথার সাথে সাথে যে আস্ত শরীরটাই জড়িত। আমাদের দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের সাথে বাংলাদেশের একর তৃতয়াংশ ভূখণ্ড পঁচিশ ত্রিশ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা টেরিটরিয়াল ইকোনোমিক জোনের সাথে জড়িত। আধিপত্যরা যদি মাথাসদৃশ রংপুর, দিনাজপুর কেটে দেয়, বাংলাদেশের সিলেটরূপী স্বীকৃত কেটে দিলে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পা কেটে দিলে আপনাদের জন্য একটা চৌকোণা বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে। বুকের রক্ত দিয়ে সেই চক্রান্ত রুখে দেয়ার জন্যে জনগণ নির্বিশিষে ধর্ম বা নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক ঐক্যবদ্ধ হতে হবে–এটাই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আসল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা দেখি বেশীর ভাগ পত্রিকায় খবরই দেন না। আপনারা হোন জনকণ্ঠের বা ভোরের কাগজের বা আজকের কাগজের কিন্তু আপনারা বুদ্ধিজীবী। এই ভয়াবহ জিনিস আপনারা দিব্যি চোখে দেখছেন আপনাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি তারপরও আপনারা মনে করছেন এটা তো বি,এন,পির, এটা তো জামাতের কথা, এখন তো জাগপা'র কথা। মনে রাখবেন এটা বি,এন,পি, জামাতের

দায়-দায়িত্ব নয়। এটার দায়-দায়িত্ব বর্তায় বাংলার বার কোটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং সব ধর্মের মানুষের। এটা বি,এনপি, জামাতের নয় আওয়ামী লীগসহ সকল দলের রয়েছে এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব।

সুধীমণ্ডলী, আমাদের বিদ্রোহী বিপথগামী মাত্র পাঁচ ছয় হাজার শান্তিবাহিনী, সেখানের মধ্যে ত্রিপুরা, মারমা, তনচংয়া, গম, খুনী এরা কিন্তু ঐসব চক্রান্তের সাথে জড়িত নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তারা সমর্থন করে না। চাকমারা মাত্র ২২, ২৪%। ত্রিপুরা হিন্দু, ডোমরা সব খৃষ্টান হয়ে গেছে, খুনীরাও কনভার্টেড হয়ে গেছে, চাকমারা হলো বৌদ্ধ। এরপর সাংস্কৃতিকভাবে, নৃতাত্ত্বিকভাবে আচার-আচরণেও তাদের সাথে মিল নেই। যে জুমল্যান্ডের কথা শোনা যাচ্ছে তা আসলে জুমল্যান্ড মাত্র হবে না, তা হবে বিদেশী প্রভুদের নিয়ন্ত্রিত একটা চাকমাল্যান্ড। আর জুম প্রাকটিস করে শতকরা পাঁচ ভাগেরও কম। কাজেই জুমল্যান্ডের যুক্তিও ধোপে টিকে না। কাজেই শংকার কথা ওটা নয়। শংকার কথা হচ্ছে ভারতের সুদূর অরুণাচলে একলক্ষ চাকমা বসবাস করে। ত্রিপুরায় পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় চাকমা রয়েছে। মিজোরামে চার–পাঁচ লক্ষ চাকমা রয়েছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, সুদূর সাংরাজ্য অর্থাৎ বার্মার উচ্চভূমিতে এমন কি আরাকান এলাকায় বিপুল সংখ্যক চাকমা রয়েছে। বাংলাদেশে যে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আছে, সেখানে এর চার-পাঁচ গুণ চাকমা আছে এবং যারা এই বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদ দিচ্ছে তারা ঐ চাকমাদেরকে নিয়ে শান্তিবাহিনীর দশজন বেশী পঞ্চাশ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসবে, তাদেরকে আপনি কিভাবে রুখবেন সেনাবাহিনী সেখান থেকে তুলে আনলে। এসব চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে বলা যায়, "বাংলাদেশকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"–সেই তারা হচ্ছে ভারতীয় চাকমা। যদি আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয় তারা এসে আমাদের নিরীহ ভুখানাঙ্গা, গরীব–দরিদ্র বাংলাদেশের মানুষ, পাহাড় কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে সে ভূমি আবাদ করেছে। আমাদের সাংবিধানিক অধিকারে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগযুগ ধরে বসবাস করছে এবং যারা পাহাড়ী শ্বাপদ–সংকুল অরণ্যকে বাসযোগ্য করেছে বংশপরম্পরার তাদেরকে বিদায় করার চক্রান্তকারী ঐ চাকমারা এদেশের চাকমা নয়। এদেশের চাকমারা আমাদের ভাই। এরা এদেশে আসবে, তাদের অধিকার আছে। সম্মানের সাথে সমতার অধিকারে তারা থাকবে। সব জাতি থাকবে সেখানে, বাঙালীরা থাকবে, চাকমারা থাকবে, মারমারা থাকবে সবাই থাকবে। কিন্তু ভারত থেকে চাকমাদের আসার এ তথ্য বোধ হয় আমিই এখানে বললাম। সুতরাং এ তথ্যটা প্রণিধানযোগ্য। আমাদের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গপোসাগর। একদিকে বিশ্বের সাথে আমাদের সংযোগ। সেটি হলো বার্মার সাথে। 'হিলট্রাক্ট' যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আমরা চারদিকে ভারত দ্বারা Land Blocked হয়ে যাবো। সুতরাং এটাও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অতন্দ্র জনতা, বাংলাদেশ-এর সেমিনারের প্রদত্ত বক্তৃতা। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তন। ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৭। আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ, অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।

অষ্টম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব

ভূমিকা

সম্পদ-সম্ভাবনা আর সমূহ সমস্যায় সমাকীর্ণ পার্বত্য-চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগলিক এলাকা বিস্তৃত পার্বত্য-চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে হালকা জনসংখ্যা অধ্যুসিত অথচ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। দেশের তিনটি পার্বত্য প্রশাসনিক জিলার সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চলটির বেশীর ভাগ ভূমিই বনভূমির অন্তভূক্ত এবং এই অঞ্চলটির জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠই নানা মঙ্গোলীয় অভিবাসী বসতিস্থাপনকারীদের অন্তুর্গত। উচুঁ-নিচু পাহাড়-পর্বত, পার্বত্য নদ-নদী, উর্বর উপত্যকা আর দূর্গম ঘন চির-হরিৎ বনভূমি অঞ্চলটিকে দান করেছে এক অনন্য নিসর্গ আর বৈচিত্রময় ভূগোল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ-এশিয়ার পূর্বাংশে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রায় ২১০২৫ থেকে ২৩°৪০' উত্তর-অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৫' থেকে ৯২°৪৫' পূর্ব-দ্রাঘিমাংশ ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পর্বতশংকুল জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা "Chittagong Hill Tracts" এর অবস্থান। বাংলাদেশের প্রশাসনিক তিনটি জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন এর মোট ১৩, ১৪৮ বর্গ কি. মি বা ৫°৮৯ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্রগামের অন্তর্ভূক্ত (B.B.S 1991) [১নং মানচিত্র]

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিতি, বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার অসমসত্ব উপস্থিতি আর বর্তমান বিশ্বের দুই উদীয়মান পরাশক্তি চীন ও ভারতের এলাকাটির বিশেষ কাছাকাছি অবস্থান এবং অঞ্চলটি থেকে অনায়াসে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের উন্মুক্ত নীল জলভাগে প্রবেশের সুবিধার সম্ভাব্যতা পার্বত্য-চট্টগ্রামকে বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে করে তুলেছে বিশেষ গুরুত্ববহ। অন্যদিকে, অঞ্চলটির বিপুল ভূমি সম্পদ অপরিমেয় আর প্রায় অব্যবহৃত পানিসম্পদ, মুল্যবান বনজসম্পদ এবং সম্ভাবনাময় অনাবিস্কৃত কিংবা অনাহরিত খনিজ সম্পদ জন ভারাক্রান্ত আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য-চট্টগ্রামকে এক অপরিহার্য

মহামূল্যবান অঙ্গে পরিণত করেছে। একজন সুস্থ্যসবল মানুষের দেহে যেমন তার একটি হাত বা একটি পা অত্যন্ত মূল্যবান অপরিহার্য অংশ তেমনি একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য পার্বত্য-চট্টগ্রামের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থ জড়িত। পার্বত্য-চট্টগ্রাম বাংলাদেশী জাতির জন্য ভবিষ্যত সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং অফুরন্ত ভান্ডার; সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর বা "Land of Promise" (Ahmed and Rizvi, 1951).

পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনের বিশালতায় বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ হলেও জনসংখ্যার হিসেবে ঐ অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ লোক বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬০% মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি প্রায় ৪০% বাংলা ভাষাভাষী নতুন বসতি স্থাপনকারী সমতলভূমির লোকসংখ্যা। পাহাড়ী জাতিভুক্ত মোট জনংখ্যা আবার ধর্ম, ভাষা ও জাতি তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রায় এক ডজন উপজাতিতে বিভক্ত– যাদের পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আচরনিক দিক দিয়ে মিলের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি প্রখর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের মধ্যে পূর্ব থেকে সঞ্চিত অসন্তোষ আরো বেশি করে ধূমায়িত হতে থাকে এবং ১৯৭৫ সালের পর তা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (Montee, 1981)। অচিরেই এই আন্দোলন সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয় এবং বিশ্বের অন্যান্য নানা স্বার্থান্বেষী শক্তির হস্তক্ষেপের প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতবাদী উপজাতীয় তরুণদের ঐ তৎপরতা বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগোলিক এলাকার অস্তিত্বকে এক প্রচণ্ড হুমকির মুখে নিক্ষেপ করে (Hossain, 1990 and Alam & Akhter, 1990)। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং অঞ্চলটির অফুরন্ত সম্পদ সম্ভাবনার নিরিখে বাংলাদেশসহ অঞ্চলসংলগ্ন অন্যান্য শক্তিসমূহের কাছে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের সামরিক, রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক সকল প্রচেষ্টাই এখন পর্যন্ত কোন দৃশ্যমান সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সকল তৎপরতা এখনো চলছে। কিন্তু সমস্যাটি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমানে একটি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে (Shelley, 1992)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল

বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড়ী এবং বনাবৃত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত। বৃটিশ রাজত্বকালে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকারের ২২তম প্রশাসনিক এ্যাক্ট বলে বৃহত্তম চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামের একটি আলাদা প্রশাসনিক জেলা গঠন করা হয়(Shelley, 1992)। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটিমাত্র বৃহত্তর জেলা লি যা ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি– এই তিনটি প্রশাসনিক পার্বত্য জেলায় বিভক্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও বার্মার পশ্চিম সীমান্তের সাথে ভৌগলিকভাবে যুক্ত। অঞ্চলটির পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য (সাবেক লুসাই হিলস্ অঞ্চল), দক্ষিণে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকান রাজ্য, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত (Amin, 1988/89)।

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এলাকাটি ফেনী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী এবং এদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপ-নদী, শাখা-নদীর উপত্যকায় সুস্পষ্ট চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এসব উপত্যকার মধ্যে চেঙ্গী উপত্যকা (Changi Valley), কাসালং উপত্যকা (Maini Valley), রাইনখিয়াং উপত্যকা, সাঙ্গু উপত্যকা উল্লেখযোগ্য। এসব উপত্যকাগুলো ৩০ থেকে নিয়ে ৭০/৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং গড়ে ২-৩ কি.মি. থেকে ৮/১০ কি.মি. প্রশস্ত হয়ে থাকে। চেঙ্গী ভেলী বা মহালছড়ি উপত্যকা প্রায় ৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং গড়ে প্রায় ৬.৫ কি.মি. প্রশস্ততাবিশিষ্ট একটি উর্বর ঢালু সমভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐসব উপত্যকার সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত দীর্ঘ এবং মাঝারি উচ্চতার কয়েক সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েক শ' মিটার থেকে নিয়ে ১০০০ মিটারের চেয়েও বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শ্রেণী দেখা যায় (যেমন, মওডক, মুয়াল-এর উচ্চতা ১০০৪ মিটার)। দুটি পর্বতমালার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপত্যকাকে কোন কোন স্থানে ২০/৩০ কি.মি. পর্যন্ত প্রশস্ত হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলের পর্বতমালাকে লোয়ার ইয়োসিন যুগের টারশিয়ারীকালের বেলে পাথরে গঠিত আরাকান-ইয়োমা ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা হয় (Rizvi, 1952 and Ahmad & Rizvi 1951)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীসমূহও নদী অববাহিক এবং উপত্যকাসমূহের মত পরস্পর থেকে সমারাল থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিতভাবে সুবিন্যস্ত। বেলে পাথর ছাড়াও ঐসব পর্বতমালার শিলা গঠনে কালো শিলা, শে'ল, কংগ্লোমারেট এবং কোন কোন স্থানে চুনা পাথরের অস্তিত্ব দেখা যায় (Wadia, 1953)।

কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ফেনী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান নদ-নদী। ঐ সব নদ-নদীর বেশির ভাগই স্থানীয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী অববাহিকা-উপত্যকাগুলোর মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমে মোড় ঘুরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী, ফেনী ও মাতামুহুরী পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে চট্টগ্রামের সমতল এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। ঐসব নদ-নদী এবং এগুলোর উপনদীসমূহের অববাহিকাসমূহ ২-৩ কি.মি. থেকে নিয়ে ৮/১০ কি.মি. পর্যন্ত প্রশস্ত। অত্যন্ত উর্বর এসব অববাহিকা কৃষি কাজ, বিশেষ করে ফল-মূল এবং শাক সব্জির (Horticulture) চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অববহিকাগুলোর কোন কোনটি ৩০/৪০ কি.মি. থেকে নিয়ে ৭০/৮০ কি.মি. কিংবা তার চেয়েও বেশি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হওয়ায় এসব দীর্ঘ এবং প্রশস্ত অববাহিকায় অনেক বর্ধিষ্ণু লোকালয়, শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, চন্দ্রঘোনা এমনি অববাহিকার কোলে গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য শহর। অত্যন্ত খরস্রোতা এবং গভীর অববাহিকায়

প্রবাহিত ঐসব নদ-নদী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী (Johnson and Ahmed, 1957)। কর্ণফুলী নদীতে একই উদ্দেশ্যে বাঁধ দিয়ে একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ (Lake) তৈরি করা হয়। কাপ্তাই নামক স্থানে ১৯৫৭ সালে কাজ শুরু করে ১৯৬৩ সালে ঐ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয় এবং এর ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৪০০ বর্গ কি.মি. বা ২৫৬ বর্গমাইল (Khisha, 1966)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের চেঙ্গীভেলী, মাইনি ভেলী এবং কাসালং ভেলী দীর্ঘ ও প্রশস্ত অববাহিকার পূর্বাংশের সাজেক ভেলী এবং দক্ষিণাংশের সাঙ্গুভেলী, রেইংখিয়াং ভেলী ও মাতামুহুরী ভেলী তুলনামূলকভাবে গভীর এবং অপ্রশস্ত অববাহিকা। উত্তরাংশের পর্বতগুলোর তুলনায় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পর্বতমালাসমূহও বেশি খাড়া।

জলবায়ুগত দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জ মণ্ডলীর উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মৌসুমী বায়ু প্রভাবিতপার্বত্য-চট্টগ্রামের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০ সে. মি. (Rashid, 1991)। পার্বত্য-চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত টোঙ্গা ও তিয়াম্বাং (কক্সবাজারের পূর্বাঞ্চলে)-এ প্রায় ৫০০ সে. মি, মধ্যাংশের নাইখ্যাংছড়িতে ২৯৫ সে. মি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লামা বাজারে ৩০০ সে. মি. মাইনিমুখ-এ ২৫৯ সে. মি, কাপ্তাই-এ ২৮২ সে. মি. এবং রাঙ্গামাটিতে ২৫৭ সে. মি.। পার্বত্য-চট্টগ্রামের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং গড় গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস। এখানে শীত ঋতু থাকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। শীতকালে গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস। তবে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ৪০°/৪২° সেঃএবং শীতকালে সর্বনিম্ন ৪°/৫° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানানামা করে।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের মৃত্তিকা "অশ্রেণীভুক্ত পাহাড়ী মৃত্তিকা" (Unclassified Hill soils) হিসাবে চিহ্নিত (Hutchinson, 1909 and Rashid, 1991) । বেলে পাথর, নুড়িপাথর, শেল এবং কাদা পাথর চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে চূর্ণিত উপাদানের সাথে উদ্ভিজ্জ উপাদানের যুক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিক গঠিত হয়। পাহাড়ের ঢালে এবং উচ্চ অসমান স্থানে মৃত্তিকা কম উর্বর এবং গভীরতাও কম এবং বর্ণ হালকা। পক্ষান্তরে সমতলে এবং অববাহিকার নিম্ন এলাকায় বেশি গভীরতা সম্পন্ন গাঢ় বর্ণের উর্বর মৃত্তিকা দেখা যায়। বনাঞ্চলেও জৈব উপাদান সমৃদ্ধ গাঢ়বর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়। সাম্প্রতিককালের ফরেস্টাল রিপোর্ট অনুসারে পার্বত্য-চট্টগ্রামের মৃত্তিকাকে ধর্ম ও গুণানুসারে সাতভাগে ভাগ করা যায়(Forestal Report-1966)। এ সব মৃত্তিকার মধ্যে কাঁদা-দো আঁশ, বেলে দোঁআশ এবং পলি কাঁদা (clay loam, sandy loam and silty clay) উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য-চট্টগ্রামের মোট মৃত্তিকা পরিসরের ৬৭% ভাগই পলিকাদা দো-আঁশ শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকা। এখানকার বেশীর ভাগ মৃত্তিকাই বড়দানা বিশিষ্ট মাঝারি উর্বরতা সম্পন্ন এবং কমপানি ধারনে সক্ষম। নদী অবাহিকাগুলোর মৃত্তিকার উর্বরতা খুবই বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির অর্ধেকেরও চেয়েও বেশি অংশ বনাচ্ছাদিত পাহাড়ী অঞ্চল। এখানকার এ' সব বনভূমি এবং অন্যান্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ চিরসবুজ এবং পর্ণমোচি বৃক্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ চিরসবুজ এবং পর্ণমোচি বৃক্ষ এবং

ঘনঝোপ ঝাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। পার্বত চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মোট ১০২৬ বর্গ কিঃ মি. এবং দক্ষিণাংশে মোট ৫১২ কি. মি. সংরক্ষিত ঘন বনভূমি রয়েছে। বাকি বনাঞ্চলের প্রায় ৫৪০০ বর্গ কি. মি. এলাকা অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত। এসব বনাঞ্চলে সেগুন, তূন, তেলসুর, গর্জন, জারুল, গামার, কড়ই, চাপালিশ, বাঁশ এবং বেত ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেগুন, মেহগনি এবং রাবার, চা ইত্যাদির বাগান এখানে সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সর্বমোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭০৪৬ বর্গ কি. মি. (Rashid, 1991)। এসব বনভূমি থেকে আহরিত কাঠ এবং অন্যান্য মূল্যবান বনজ সম্পদ থেকে দেশ প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লাভ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজসম্পদ ভুক্ত কাঠ এবং বাঁশের উপর নির্ভর করে এখানে গড়ে উঠেছে কয়েকটি পাল্পউড, রেয়ন এবং কাগজ শিল্প। চন্দ্রঘোনার বিশালায়তন পেপার মিলটির মূল কাঁচামাল বাঁশ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে। বনাঞ্চলের সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণী যেমন হাতী, ব্যাঘ্র, বানর, বনগরু (গয়াল) ইত্যাদি এবং নানা প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য পাখ-পাখালি বাংলাদেশের অমূল্য জাতীয় সম্পদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যা, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং জাতিতাত্ত্বিক বিভিন্নতার মধ্যেই ঐ এলাকাটির বর্তমান অশান্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদিতার কারণ নিহীত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামই বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল যেখানকার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবাঙালী এবং অমুসলিম। অঞ্চলটি মূলত একটি মিশ্রজন গোষ্ঠী অধ্যুসিত বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, নানা ভাষা-ভাষি এবং নানা ধর্মাবলম্বী এবং বহু সংস্কৃতিবিশিষ্ট জনসংখ্যার একটি এলাকা। নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা এখন অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠীই এখানকার মূল আদিবাসি (Aborigins) বা, ভূমিপুত্রের (son of the soil) দাবিদার হতে পারে না (Lewin, 1869); Khisha, 1964, Bernol, 1960, and Ahmed, 1990)। এসব গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীই আগে বা পরে পার্শ্ববর্তী অর্থবা একটু দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল বা সমতল ভূমি থেকে দেশান্তরী হয়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং নিবাস গড়ে তোলে। শত শত বছর পাশাপাশি অবস্থান করলেও এসব বিভিন্ন জন গোষ্ঠীর বেশিরভাগই নিজেদের স্বাতন্ত্র বহুলাংশে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এদের মধ্যে কোন কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে বড় এবং প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টাবলীর কিছু কিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন, চাকমারা শক্তিশালী, বাঙালীদের ভাষা এবং খাদ্যাভ্যাস এবং টিপরা (ত্রিপুরা)রা হিন্দুধর্ম এবং লুসাই ও বোমরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তথাপি ঐসব প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়াদির অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অনেক অংশই বজায় রেখে চলেছে।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈচিত্রের দাবিদার যেখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বন্টন অত্যন্ত হালকা এবং অনিয়মিত। বর্তমানে এখানে মাত্র ১০ লক্ষের মত লোক বসবাস করে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল, ৯,৬৭,৪২০ এবং জনসংখ্যার বন্টনের গড় ঘনত্ব প্রতিবর্গ কি. মিটারে ১৯০ জন (P.R.P.C; 1991) । এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের গড় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. এ প্রায় ৮০০ জন। বন্ধুর পার্বত্য ভূমিরূপ, ঘন সংরক্ষিত অরন্যাচ্ছাদিত পরিসর এবং প্রতিকুল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঐ এলাকাটিকে এতকম জন অধ্যুসিত রাখতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশদের আগমন থেকে নিয়ে বৃটিশ রাজত্বের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৭৬২-১৮৯২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ১৭৬০ সালে ঐ অঞ্চলের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। ১৮৯২ সালের পরিসংখ্যানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১,০৭,০০০-এ। উচ্চমৃত্যুহার এবং অভিগমন আইনের কড়াকড়ি এখানকার ঐ সময়ের জনসংখ্যার এই স্থবিরতার জন্য দায়ী (Shelley, 1992)। বর্তমান শতকের প্রথমভাগ থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যাছিল মাত্র ৩,৮৫,০০০। ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫,০৮,০০০। ১৯৮১ সালে দাঁড়ায় ৭,০৮,৪৫৬ জনে এবং ১৯৯১ সালে এর সাথে যুক্ত হয় আরো ৩ লক্ষ। নিচের সারনী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও বন্টন চিত্র দেখা যায়ঃ

সারণী-১

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বন্টন চিত্র

সন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১
মোট জনসংখ্যা	২,৯০,০০০,	৩,৮৫,০০০	৫,০৮,০০০	৭,০৮,৪৫২	৯,৬৭,৪২০
প্রতিবর্গ কি. মি-এ ঘনত্ব	৫৭ জন	৭৫ জন	১০০ জন	১৪৭ জন	১৯০ জন

Source : (Statistical year book of Bangladesh, 1982 and (ii) preliminary Report of Population Census , B. B. S, 1991.

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ মোট ৪,৯৮,৫৯৫ (১৯৯১) জন অবাঙ্গালী বা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ থেকে আগত চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের ভাষা স্থানীয় এবং চাটগাইয়া বাঙলা ভাষার মিশ্ররূপ। মারমা জনগোষ্ঠী আরাকান থেকে আগত মগ উপজাতিভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ভাষা, আচরণ ও জীবনাচরণের দিক দিয়ে এরা চাকমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ভাষা আরাকানী বর্মী উপভাষা (Ahmed, 1990 P-63)। টিপরা বা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী পার্বত্য

Reoprt, 1964)। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, পার্বত্য, বন্ধুর এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ঐ অঞ্চলের ভূমির উপযোগমান এবং বাঁধন ক্ষমতা খুবই কম (least carrying capacity of the land)। তাঁরা যে ভুলটি প্রথমেই করেছেন তা' হচ্ছে, অসমর্থিত এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রায় তিন দশক আগে সংগৃহীত জরীপের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভুল পরিসংখ্যানকে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের উপাত্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বর্তমান নিবন্ধের লেখকের নিজস্ব "রিকনেসেন্স" জরীপের ভিত্তিতে এবং সংগৃহীত বিমানচিত্র ও ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেঙ্গী চেলী, সাঙ্গুভেলী, মাতা মূহুরী ভেলী, মাইনী ভেলী এবং কামলিং ভেলী প্রভৃতি দীর্ঘ এবং যথেষ্ট প্রশস্ত উপত্যকায় শুধুমাত্র উন্নত বর্তমান মোট জনসংখ্যার (১০ লক্ষ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান মোট জনসংখ্যার (১০ লক্ষ) প্রায় পাঁচ গুণ বেশি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার স্থান সংকুলান এবং সুষ্ঠু জীবিকার সংস্থান হতে পারে। তাছাড়া উর্বর এবং যথেষ্ট জৈব-সার মিশ্রিত পার্বত্য ঢালে ফিলিপাইন, জাভা কিংবা হাওয়াইর মত "ধাপ বা Terrace" কেটে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল পার্বত্য বৃষ্টি ব্যবস্থার মতো লাগসই পদ্ধতির চাষাবাদ করে এবং হার্টিকালচার (Horticuture) বা ফলমূলের চাষ এবং বাগান চর্চার (Plantation) মতো উপযুক্ত বিকল্প অর্থনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে অনায়াসেই পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিপুল অসুবিধাজনক পার্বত্য বন্ধুর ভূমিরূপকে অনুকূল এবং কয়েকগুণধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন উপযুক্ত ভূমিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এ গেলো কৃষি অর্থনীতির কথা। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বান্দরবান কিংবা প্রলম্বিত দীর্ঘ উপত্যকাগুলোর বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা যেতে পারে অনেক সংখ্যক ছোট এবং মাঝারি "শিল্প-নগরী" (Industial townships) বা পর্যটন উপশহর (tourism-subsurbs) এর মতো সেটেলাইট টাউন) satalite town)। কুটির শিল্প, গার্মেন্টিস শিল্প, ফলমূল বা খাদ্য দ্রব্য (যেমন জ্যাম, জেলী, সিরাপ ইত্যাদি) প্রকৃযাজাতকরণ শিল্প এমনকি নানা ধরনের রাসায়নিক বা নির্মাণ-ধর্মী মাঝারি স্কেলের শিল্পায়নের মাধ্যমে এখানে পরিকল্পিত নগরায়ন স্বার্থক করে যুক্তি সঙ্গতভাবেই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেনেভা, বৈরুত বা হংকং এর মতো উন্নত নগরী সমৃদ্ধ উৎপাদনমুখী ঘন লোকালয়ে পরিণত করতে পারি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানে ব্যবহৃত ক্রটিপূর্ণ যেসব ভূমি ব্যবহার জরিপ রিপোর্ট বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় (ফরেস্টাল রিপোর্টসহ, Forestal Report 1966) সেগুলোর উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালে সেখানে বনভূমি ছাড়া মোট আবাদী জমি বা Total Cropped Area-র পরিমান প্রায় ২,৪৪,৩৮০ একর ছিল বলে দেখতে পাই। ঐ সময় নিট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ১,৫৮,৩৪০ একর এবং সাময়িকভাবে অব্যবহৃত বা ব্যবহার উপযোগী পতিত মোটভূমির পরিমাণ ছিল প্রায় আরো ৩০,০০০ একর। কাপ্তাই হ্রদের জলাধারে নিমজ্জিত মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ একর যা মৎস্য চাষ বা জলজ ফসল চাষে (Acqua culture) ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে দেখতে পাই যে, বনাঞ্চল ও পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিকূর ভূমি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নত, মধ্যম এবং নিম্নমানের (`A' 'B', 'C' and 'D' Categories) প্রায় ৫ লাখ একর কৃষিযোগ্য ভূমি এখনই প্রস্তুত রয়েছে। ঐসব জমিতে বর্তমানে মান্ধ্যাতার আমলের

কৃষিপদ্ধতিতে ধান এবং অন্য ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তির কৃষি কাজের মাধ্যমে অত্যন্ত উর্বর ঐ ৫ লক্ষ একর জমিতে কৃষি কাজ করে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের ১০ গুণ কিংবা তারও বেশি পরিমাণ "বিকল্প ফসল"-এর উৎপাদন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই অসম্ভব নয়। এর ফলে অতি সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সাধারণ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আইনজীবী চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় নিতান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার যুক্তিকে দাড় করাতে গিয়ে যে নিবন্ধ রচনা করেছেন তাতে উপাত্তগত শক্তি এবং বিজ্ঞানগত যথেষ্ট সমর্থন না থাকার ফলে বিশ্লেষণটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার আসল চিত্রটি প্রতিভাত হতে পারেনি (Roy, 1992)। নিচে বিশ্বের কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের বর্তমান ভূমি ব্যবহার চিত্রের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামাঞ্চলেরর ভূমির পরিমাণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সম্ভাব্য ধারণ ক্ষমতা এবং ভূমি সম্পদ চিত্রের একটি ধারণা পেতে পারি।

সারণী-৩

দেশ	মোটএলাকা (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা	কৃষি ভূমি%	অকৃষি ভূমি%
লেবানন	১০,৪৫২ কি. মি.	৩০,০০,০০০	৩০%	৭০%
সাইপ্রাস	৯,২৫১ ,,	৭,৫০,০০০	৩২%	৬৮%
ইসরাইল	২০,৭০০ ,,	৪৬,০০,০০০	১৮%	৮২%
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৩,১৮১ ,,	১০,০০,০০০	৫%	৯৫%
সিঙ্গাপুর	৩৬০ ,,	৩০,০০,০০০	২০%	৮০%

Source : ১. Gordon (1980), ২. Marksides (1977), ৩. Frankel (1980), ৪. Eneyclopedia Britanical (1983), ৫. Shelley (1992).

বিশ্বের প্রায় পৌনে দু'শ' ছোট বড় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধশতাধিক রাষ্ট্রের আয়তন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন অপেক্ষা কম। বিশ্বের অন্তত ঃ ২৫/২৬টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের আয়তন এবং ভূমিসম্পদের অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের আযতন ও ভূমিসম্পদের অবস্থার চাইতেও দুর্বল। তবুও ঐসব দেশ অতিসহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করে অর্থনীতিক উন্নয়নের সূচকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের তালিকায় নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে (Gordon, 1980 and Marksides, 1977)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মধ্য প্রাচ্যের লেবানন, ইসরাইল কিংবা কুয়েত, কাতার এবং ভূ-মধ্যসাগরের সাইপ্রাস পৃথিবীর ক্ষুদ্র অথচ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত। লেবানন, সাইপ্রাস, কিংবা ইসরাইল তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রও নয়। লেবাননের আযতন পার্বত্য চট্টগ্রামের চাইতে অনেক কম এবং লেবানন পার্বত্য চট্টগ্রামের মত এত সুজলা, সুফলাও নয়। দেশটি একটি আধা শুষ্ক পার্বত্য ভূমি। এদেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সমতল কৃষিযোগ্য ভূমি বেকা উপত্যকা (Becaa valley) পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গী, সাঙ্গু, কাসালং, সাজেক

কিংবা মাতামুহুরী যে কোন একটি উপত্যকার তুলনায় নিতান্তনগণ্য। তবুও এই অনুর্বর আর পাহাড়ী রাষ্ট্র লেবানন বর্তমানে প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ লোক সংখ্যাকে অত্যন্ত অনায়াসেই ধারণ করতে পেরেছে। উন্নত প্রযুক্তি আর পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে রুক্ষ, বিরান প্যালেস্টাইনের মরুময় আর পাহাড়ী ভূমিতে গড়ে উঠেছে ৪৫/৫০ লক্ষ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ইসরাইল (Brawer, 1988)। তাছাড়া প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদশূন্য সাবেক ফরমোজা দ্বীপের ছোট্ট পরিধীতে গড়ে উঠেছে এশিয়ার অন্যতম নব্য অর্থশক্তি তাইওয়ান। ঠিক এমনি ক্ষুদ্রায়তন প্রাকৃতিক সম্পদহীন সিঙ্গাপুর এবং হংকং ও ধারণ করতে পেরেছে বিপুল জনসংখ্যাকে। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পায়ন, নগরায়ন আর সমস্ত জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল নিরলস কর্মতৎপরতা ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দুর্বল ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলোকে এমনি উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। সমুদ্র বন্দর থেকে মাত্র ৪০/৫০ মাইল বা ৭০/৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত বাংলাদেশের সুজলা সুফলা পার্বত্য চট্টগ্রামও একই পথে সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষতা লাভ করে সহজেই বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচ গুণ কিংবা তার চাইতেও কয়েকগুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করতে পারে (Rob, 1990)। হিসাব করে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত নিচু পার্বত্যসমূহের গাত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধাপ কেটে (Trrracing) কৃষি ভূমি তৈরি করলে ভূমির 'ত্রিমাত্রিক" (Three-Dimensional Use) ব্যবহারজনিত কারণে এখানকার মোট সম্ভাব্য ভূমিব্যবহার কমপক্ষে প্রায় আরো ৫০০,০০০ একর নতুন জায়গায় পরিব্যাপ্ত হতে পারে (Rob, 1990)। এভাবে আমরা দেখি যে, উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক পন্থার ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির প্রচলন হলে পার্বত্য এলাকার মোট জমির পরিমাণ সমতল ভূমি থেকে প্রায় দেড় গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। টেরেসিং-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রচলনের সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনায়াসেই কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ আরো দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারি। তা'ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে সকল উপত্যাকা বা নদী অববাহিকা রয়েছে তার দৈর্ঘ্য বরাবর দু'পার্শ্বের নিচু উর্বরা সমতল এবং মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমির মোট পরিমাণ ২,৫০,০০০ একর থেকে, ৩,০০,০০০ একরের মধ্যে। শুধু মাত্র এই বিপুল পরিমাণ উর্বর সমতল ১ম শ্রেণীর কৃষিভূমিতে উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থার চাষাবাদ করলে "বর্তমানের কৃষি প্রগাঢ়তা (Cropping Intensity) আরো বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মোট ফলন বা উৎপাদন (Yield) কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বা ভূমির ধারণক্ষমতা সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক বা হতাশ চিত্র আমরা দেখতে পাই তা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিবেচ্য। তাছাড়া কোন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ রিপোর্টে এখানকার ভূমি ব্যবহারের যে মনগড়া পরিসংখ্যান যেমন, পাহাড়ী জমি ১,২৫,০০০ একর, মিশ্র জমি, ১,০০,০০০ একর, ধানী জমি ৬২,৫০০ একর ইত্যাদি দেখানো হয়েছে তা আদৌ বাস্তবতা সম্মত নয় বা সত্যও নয়। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত কোন সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার জরীপই (Land use Survey) সম্পাদিত হয়নি (Rob, 1990, and Rob, 1989)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহারচিত্র বর্তমানে যদিও ১৯৬৬ সালে সম্পাদিত (The Forestal Report 1966)" -এর সাথে মোটেও মিল খাবে না তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বর্তমানে এখানকার বেশির ভাগ জমিই কৃষি কাজের অনুপযুক্ত পাহাড়ী এবং বনাবৃত ভূমি। যে কোন ব্যবহারের জন্যই নতুন ভূমি যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামে বের করতে হয় তবে অবশ্যই এর সিংহভাগই পাহাড়ী এবং মিশ্র বনবিভাগের আওতাধীন ভূমি থেকে গ্রহণ করতে হবে। নিচে ১৯৬৫-৬৬ সালে ভূমি-প্রশাসন রিপোর্ট (পূর্ব-পাকিস্তান) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার চিত্রের পরিসংখ্যান দেখানো হল ঃ

সারণী-৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার চিত্র (একরে) ১৯৬৬

ধরন	পরিমাণ
১। বনাচ্ছাদিত ভূমি	২৯,০২,৭৩৯ একর
২। কৃষির অনুপযোগী ভূমি	২,৭০,৯৮১ একর
৩। কৃষির উপযুক্ত পতিত ভূমি	৪৫,০০০ একর
৪। কৃষিভুক্ত ফসলী ভূমি	১,৩০,০০০ একর
৫। সাময়িক (বর্তমান) পতিত ভূমি	১,০৮,০০০
৬। বহু কসলী জমি (নিচু)	৯৩,০০২ একর
৭। মোট চাষভুক্ত ভূমি	২,২৩,০০২ একর
৮। সর্বমোট জমির পরিমাণ	৩২,৫৯,৫২০ একর

Source : Chittagong Hill Tracts District Gazeteer, 1974, P.125,

কৃষিসম্পদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বেশিরভাগই কৃষি নির্ভর তৎপরতার সাথে জড়িত। আজ থেকে প্রায় পৌণে দু'শ বছর আগে ১৮১৮ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে হাল চাষের প্রচলন করেন (Khan and Khisha 1970) । তার আগে ঐ অঞ্চলে 'ঝুম' পদ্ধতিই (Shifting cultivation) একমাত্র কৃষি হিসাবে চালু ছিল। 'ঝুম' পদ্ধতির আদিম কৃষিতে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল সাফ করে পুড়িয়ে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরীত পদ্ধতিতে একই সাথে নানা ফসলের চাষকরা হয়ে থাকে। সময়ের পরিক্রমনে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশই ঝুম চাষের সাথে জড়িত। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রায় ১৫,০০০ পার্বত্য পরিবার প্রায় ২৪,৩০০ হেক্টর পার্বত্য ভূমিতে, ঝুম চাষ করে জিবীকা নির্বাহ করে থাকে (Rob, 1989)। উপরন্তু, বর্তমানে ঝুমচাষকে ঐসব পাহাড়ীর পরিবারের বেশির অংশই তাদের সহজীবিকা হিসাবে (Subsidiary Economic Activity) গ্রহণ করেছে।

১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৫০ হেক্টর উপত্যকাভূমিতে হালচাষ (লাঙ্গল বলদ চালিত) করা হত এবং এরমাত্র তিনযুগ পর ১৯০০ সালে হালচাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫০ হেক্টরে (Hutchinoson, 1909)। এভাবে ক্রমে অত্র এলাকার সমতল উপত্যতায় হালচাষ কৃষির প্রচলন বাড়তে থাকে এবং অনিবার্য কারণে

প্রাচীন স্থানীয় পদ্ধতির 'ঝুম' চাষ হ্রাস পেতে থাকে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমাগত 'ঝুম'চাষের ফলে পার্বত্য ভূমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং সাম্প্রতিক সরকার সমূহের আইনগত নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্থানীয় কৃষি রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, ১৯০০ সালে "ঝুম" পদ্ধতির চাষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি হেক্টরে প্রায় ৭৫০ কি. গ্রাম শস্য উৎপাদন হতো। কিন্তু বর্তমানে ঝুমের ফলন প্রতি হেক্টরে ২৪০ কি. গ্রামে নেমে এসেছে (Khan and Khisha, 1970)। ঠিক একইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে যেখানে মাত্র ৪০,৫০০ হেক্টর জমিতে হালচাষ হতে সেখানে বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০০,০০০ হেক্টরে পরিণত হয়েছে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে এর জন্য সৃষ্ট বিশাল কৃত্রিম হ্রদের পানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে উর্বর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর কৃষি ভূমি তলিয়ে যায়। ফলে এখানকার প্রায় ১০,০০০ পরিবার কৃষি নির্ভর মানুষ তাদের মূল্যবান কৃষি জমিসহ বাড়িঘর সবকিছু হারায়। একই সাথে আরও প্রায় ৮০০০ পরিবার ঝুমিয়া পরিবারও স্থান চ্যুত হয়। স্থানচ্যুত কৃষকদের উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলা ভাষী প্রারম্ভিক হাল চাষ ছিল। এসব ক্ষতিগ্রস্ত কাসালং রিজার্ভ ফরেস্টে উপযুক্ত ভূমি সাফ করে পুনর্বাসিত করা হলেও এক উল্লেখযোগ্য স্থানচ্যুত ও ঝুমিয়া পরিবার তেমন কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি (Shelley, 1992) এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানের অশান্তির একটি অন্যতম কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল 'A' (o to 0.5 perent prercent slope), 'B' (২০% Slope) এবং C (40% Slope) মানের ভূমিকে কোন না কোন ধরনের কৃষি কাজের আওতাভুক্তকরা যায়। 'A' শ্রেণীভুক্ত উপত্যকা ভূমির পরিমাণ খুবই কম হলেও ঐসব জমিতে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং এখানে কৃষির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করা যায়। 'B' শ্রেণীর উঁচু-নিচু ভূমির ঢালে ভাল ঝুম পদ্ধতির চাষ এবং সবজি ও ফলমূলের চাষ করা যায়। এখানে খুব ভাল তুলা, ভুট্টা এবং কাকরল, কুমড়া, পেঁপে, কলা মিষ্টি আলু, কঁচু, আদা হলুদ ইত্যাদির চাষ করা যায়। 'C' শ্রেণীভুক্ত পাহাড়ী জমি অধিক উঁচু ও ঢাল বেশি খাঁড়া হওয়ার ফলে এসব জমিতে ধাপ বা টেরেসিং (Terracing) -এর মাধ্যমে গম, ভূট্টা, ধান এবং অন্যান্য সব্জি বা মসলার চাষ হতে পারে। এসব জমিতে খুব ভাল ফলমূলের বাগান করা যায় (Horticulture) । বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণে আনারস, কলা, কমলা, কাঁঠাল, উৎপন্ন হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলের সাজেক ভ্যালির কমলা এবং আনারসের উৎপাদন এবং মান বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানকে হার মানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জমিতে ভার কাজু বাদামের চাষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব ফলমূলের চাষ বাড়িয়ে এখানে অনেকগুলো ফলমূল প্রকৃয়াজাতকরণ শিল্প (Fruit processing Plants) স্থাপন করে সহজেই স্থানীয় অনেক লোকের জীবিকার এবং একই সাথে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অনুকূল প্রভাব ফেলা যেতে পারে। হিসাব করে দেখা যায় যে, এখানকার ঐসব পাহাড়ী ঢালু জমিতে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষি কাজ ও ভূমি ব্যবহার চালু করে যে পরিমাণ উপাদন বা ফলন পাওয়া যেতে পারে তা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বাসিন্দাকে খাইযে পরিয়ে বিপুল অংশের ফসল দেশের সমতলের ঘন বসতিপূর্ণ জেলাগুলোতে ও সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে একই সাথে

মনে রাখতে হবে, কৃষির বিনিময়ে এখানকার মূল্যবান সংরক্ষিত বনভূমিকে ধ্বংস করা যাবে না। উপরন্তু, এখানে "এগ্রোফরেস্ট্রি (Agro-Forestry) বা কমিউনিটি ফরেস্ট্রি (Community foresty) প্রভৃতি আধুনিক বনায়ন প্রকৃয়ার সাহায্যে গাছ পালার সংখ্যা বাড়াতে হবে। কৃষি কাজ হবে শুধুমাত্র বনশূন্য বা বনায়নের অনুপযোগী খালি ঝোপঝাড় যুক্ত অব্যবহৃত ভূমিতে এবং বর্তমানের কৃষিভুক্ত জমিতে গবেষণার দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের গভীর অরণ্যাঞ্চলেও বড় বড় বৃক্ষের নিচে পাহাড়ী জমিতে নানা ধরনের খাদ্যভুক্ত 'কন্দ' বা 'মূল' জাতীয় ফসল (Rot Crops) বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন হতে পারে সেবের খাদ্য মানও অনেক বেশি। পার্বত্যাঞ্চলের জনগণের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে এসব স্থানীয় 'কন্দ' যেমন, জঙ্গী আলু, মিষ্টি আলু, ইয়াম (Yam), ওল কঁচু, ইত্যাদির প্রচলন করে বনাঞ্চল ধ্বংশ না করেও বর্ধিত লোকসংখ্যার জন্য যথেষ্ট এবং উপযুক্ত খাদ্যমান সম্পন্ন ফসলের যোগান দেয়া সম্ভব।

মৎস্য সম্পদঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৪০০ বর্গকি. মি. বিস্মৃত বিশালায়তন মনুষ্য নির্মিত জলাধারে (Kaptai lake) বিপুল মৎস্যচাষের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এই হ্রদ থেকে প্রায় ১০০,০০০ মন বা প্রায় ৫০০০ টন উন্নত প্রজাতির মৎস্য আহরণ করা হয়। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মৎস্য চাষ পদ্ধতিতে এই বিপুল জলাধার থেকে বর্তমানের চেয়ে প্রায় দশগুন বেশী (১০,০০০,০০ মন) বার্ষিক মাছ আহরণ করা সম্ভব। বর্তমানে হ্রদে, রুই, কাতলা, মৃগেল এবং সিলভার কাপ ইত্যাদি মাছের চাষ হয়ে থাকে।

কাপ্তাই হ্রদ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১০০০ একর জুড়ে প্রায় ২০,০০০ ছোট ও মাঝারি পুকুর রয়েছে। অতি সহজেই এ'সব পুকুরে কম পক্ষে ১০ থেকে নিয়ে ২০/৩০ হাজার মন মাছের চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া এখ্যানকার উল্লেখযোগ্য পাহাড়ী নদীগুলোতে (কর্ণফুলী, মাতা মুহুরী, সাঙ্গু, চেঙ্গী, কাসালং) প্রচুর উপযুক্ত প্রজাতির মাছের চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া উপযুক্ত স্থানে পাহাড়ী ক্ষুদ্র খাল বা ছোট নদী সমূহে বাঁধ দিয়ে ক্ষুদ্র কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করে এখানে প্রচুর মাছের চাষ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বনজ সম্পদঃ পার্বত্য-চট্টগ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধতম মুল্যবান বনভূমি। পার্বত্য -চট্টগ্রামের তিনটি পার্বত্য জিলার মোট ৭০৪৩.৮৬ বর্গ কি. মি. এলাকা বনাচ্ছাদিত ভূমি। এর মধ্যে প্রায় ১৫৩৮.৭৯ বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত (Reserved Forest) বনভূমি (Rashid, 1991, P.107) । বাকী প্রায় ৫৪৫২.৫০ বর্গ কি.মি. অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের বেশীর ভাগ বৃক্ষরাজি উজার হয়ে এখন শুধুমাত্র ঝোপঝাড় বা নুতন বনায়নের আত্ততাধীন কিছু বন রয়েছে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনাঞ্চলকে (১) পার্বত্য-চট্টগ্রাম উত্তর, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ, (৩) অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বণাঞ্চল (Unclassified state forests) এবং (৪) "ঝুম" বনবিভাগ-এ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর" এর আওতায় মোট ৩৩৮৪০ বর্গ কি.মি. বনভূমি রয়েছে। এর বেশীর অংশই কাসালং রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তভূর্ক্ত। দুর্ভেদ্য এই গভীর অরন্যে মুল্যবান চাপালিস, তেলসুর, নাগেস্বর, গর্জন, সিভিট ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে।

"পার্বত্য-চট্টগ্রাম দক্ষিণ" ডিভিশন র‌্যাংখিয়াং, সীতাপাহাড়, এবং বরকল রিজার্ভ বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ বনাঞ্চলে কদম, শিমুল, খাগড়া, চম্মা, চিকরাশী, রাশ, শন এবং গল্লাবেত প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। গৃহ-নির্মাণ ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, বেত, এবং নরম কাঠের বিপুল চাহিদা রয়েছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের বৃক্ষ-উজাড় এলাকায় দেশের বনবিভাগ বনায়ন বাগান পদ্ধতিতে সেগুন ও মেহগনির বাগান গড়ে তুলেছেন। ইদানিং এইখানে তেজপাতা, ইউক্যালিপটাস এবং অন্যান্য দরকারী বৃক্ষের বাগান গড়ে তোলার উদ্দ্যেগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ২৩,১৯৬ একর উজাড় ভূমিতে নূতন বনায়ন করা হয়েছে এবং আরো প্রায় ৬,৩১৮ একর ভূমিতে নরম কাঠের (pulp wood plantation)) বনায়ন করা হয়েছে (B. B. S. -1991) ।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের বন ভূমিতে কাঠ ও ব্যাশ -বেত ছাড়াও অন্যান্য অনেক সমৃদের সম্ভাবনা রযেছে। এখানকার বন্য হাতি, বন্যপ্রাণী, পাখ পাক্ষী এবং ভেষজগুনসম্পন্ন উদ্ভিদ দু দেশের অর্থনীতিতে বিপুল অবদান রাখতে পারে। শিল্পের কাঁচামাল, বাড়ী ঘর ও আসবাবপত্র তৈরীতে কাঠ, ঔষধ এবং খাদ্য-সামগ্রীর উৎসস্থল হিসেবে পার্বত্য-চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য এক অপরিহার্য যোগানস্থল। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের হিসেবে পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে মোট, ৪৬,৪,২০০০,০০০/- টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে মাথাপিছু আয় ছিল বার্ষিক গড়ে ১৫,৩৮০ টাকা -যা, বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় বন্টন থেকে অনেক বেশী। এবং বলাবাহুল্য যে, ঐ অধিক হারের কারণ এখানকার বনজ-সম্পদ ও জলবিদ্যুৎ -এর উৎপাদন ও রাজস্ব আয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনভূমি সমস্ত বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের অর্ধেকের চেয়েও বেশী হওয়ার ফলে এর অস্তিত্বের সাথে সমস্ত জাতীয় ভাগ্যের অনেকটা জড়িত।

খনিজ সম্পদঃ পার্বত্য-চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদের প্রায় পুরোটাই এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এখানকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল চুনাপাথর, কঠিন শিলা ইত্যাদি মুল্যবান খনিজের সম্ভাবনাকে ঘোষণা করে। একই ধরনের ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geological and Geomorphological situations and structures) পরিস্থিতি ও গঠন সম্পন্ন আসাম ও সংলগ্ন বার্মা মায়ানমার) অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল ও অন্যান্য খনিজসম্পদ অনাবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রামেও খনিজপ্রাপ্তির সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঐ পর্যন্ত এখানকার খাগড়াছড়ি জিলার সামুটাঙ্গ নামক স্থানে উন্নতমানের মিথেন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। ১৯৬৯ সনে এষ্টিমেটেড আহরণ যোগ্য গ্যাসের মজুদ ছিল প্রায় ০.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তা'ছাড়া রাঙ্গামাটি জিলার কাপ্তাই এবং বান্দারবন জিলার আলী কদমে কঠিন প্রকৌশল শিলা পাওয়া গেছে রাস্তাঘাট তৈরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত জলবিদ্যুতের জন্য বাঁধ তৈরীতে ঐসব স্থানের কঠিন শিলা খুব কাজে লাগবে আশা করা যায়। অতি সম্প্রতিককালে পার্বত্য-চট্টগ্রামের কয়েকটি

স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালের জরিপের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বান্দরবন জিলার রুমা থানার ঘেরাউ এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের আলী কদম থানার তৈল মৌজায় পেট্রোলিয়াম এবং লামা থানার চলম ঝিলিতে প্রচুর কয়লা সম্পদ রয়েছে (Daily Sangram, Oct 24,1993) । তাছাড়া বাঘাই ছড়িও কাপ্তাই থানায় ও প্রচুর পেট্রোলিয়াম রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালের ২১ আগষ্ট থেকে শুরু করে বান্দরবন জিলার নাইক্ষংছড়ি থানার পাহাড়ি ঝিরির পাশে ভূ অভ্যন্তর থেকে অবিরাম ধারায় অনেক দিন ধরে খনিজ তৈল উঠতে থাকার রির্পোট ঐ সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উঠে। ১৯৮১ সনে সেল ওয়েল কোম্পানি বাঘাই ছড়ি থানায় খনিজতৈলের সন্ধান পায়। তারা উক্ত থানার শিল্প ও কাসালং অঞ্চলে ড্রিলিং ও শুরু করে। কিন্তু শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাস মূলক তৎপরতার ফলে উক্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

জল-বিদ্যুৎ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ী খরস্রোতা নদী ও পার্বত্য ভূমিরূপ বিপুল পানি শক্তির দ্বারা প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপরিমেয় সম্ভাবনা ধারণ করে। এখানকার কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র। খর স্রোত কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি বিশাল জলাধার তৈরী করে ঐ পানির সাহায্যে এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিপুল বিদ্যুৎ শক্তি পুর্বাঞ্চলিয় -গ্রীডের মাধ্যমে (১৩২ কে, ভি, লাইন) সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত পাঠানো হয়। সমস্ত চট্টগ্রামের বিপুল শিল্প ইউনিট সমূহ ও লক্ষ লক্ষ বসতবাড়ী, কলকারখানা, কৃষি সেঁচপাম্প, নগর-বন্দর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় কাপ্তাই উৎপাদিত কর্ণফুলীর পানিশক্তিজাত বিদ্যুৎ। বর্তমানে এখানে দুইটি ফেজে মোট ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জরীপ থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য-চট্টগ্রামের সাঙ্গু, মাতামুহুরী নদীতে বাঁধ দিয়েও বিপুল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ঐ সব নদীগুলোর সর্বমোট পানিশক্তিকে যথাযথ কাজে লাগালে সমস্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদার প্রায় এক চতুর্থাংশ মিটানোা যেতে পারে। বাঁধদেয়ার ফলে সৃষ্ট নূতন জলাশয়গুলোত মাছের চাষ এবং পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে প্রচুর আয় বাড়ানো যাবে।

পর্যটন সম্পদ ঃ ঢেউ খেলানো পাহাড় শ্রেণীর সবুজ হাতছানি, চোখ জড়ানো কাপ্তাইহ্রদের মনোহর রূপ আর স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্টির বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনাচার পার্বত্য-চট্রগ্রামকে দান করেছে এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রের মর্যাদা। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বান্দারবান কিংবা দূরবর্তী সাজেক বা বরকলে গড়ে উঠতে পারে সমৃদ্ধ পর্যটন নগরী কাসালং এর গভীর অরণ্যে বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Wild life Observation Tower) বা কাপ্তাই কিংবা রাঙ্গামাটিতে মাছ-ধরা, নৌভ্রমন, জলক্রীড়া কেন্দ্র (Fishing, Angling, River Cruise and Water sports facilities) স্থাপন করে সহজেই দেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়। তাছাড়া এখানকার নিরিবিল পরিবেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আবাসিক কনভেন্ট বা ডরমিটরী ধরনের আধুনিক বিদ্যালয় বা কলেজস্থাপন করা যায়। এক কথায়, পার্বত্য-চট্টগ্রামের নিসর্গের সবকিছুই আদর্শ পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচ্য।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের কুটির শিল্পের বিকাশেরও বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার উপজাতীয়দের তৈরী তাঁতের বস্ত্র, চাদর, থলে, পুঁতির মালা, হাঁড়া এবং হাতিরদাতের শিল্পকর্মী কাঠ এবং বাঁশবেতের আকর্ষনীয় দ্রব্যাদির যথেষ্ট চাহিদার রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এসব উপজাতীয় হস্তশিল্পজাত স্যুভেনিরের প্রচুর আকর্ষন রয়েছে। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকার এ সব কুটির শিল্পজাত বা হস্তশিল্প দ্রব্য দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে লাভজনক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ'সব উপজাতীয় হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

পার্বত্য-চট্রগামের ভূ-রাজনীতি

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিকভাবে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ভৌগলিক এলাকা। সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান এক-কেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থার (Uni-polar Global System) অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে এশিয়ায় ভারত এবং চীন ভবিষ্যত নব্য পরাশক্তি হিসেবে আবিভূর্ত হতে চলেছে। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গপোসাগরের উপকুল থেকে মাত্র কয়েক কি. মি. দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের অন্তুর্ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত তাপর্যময় ভৌগলিক অবস্থান জুঁড়ে দাড়িয়ে আছে। সাম্প্রকিকালে বাংলাদেশেরই এই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের ভৌগলিক সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর পূর্বঞ্চলের প্রদেশসমূহ যেমন, মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড আসাম, এবং মায়ানমারের আরাকান, শান, ফোচিন এবং চিন প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার প্রবনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে (Sukhwal, 1971) । উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের এবং সংলগ্ন মায়ানমারের উত্তরাংশের উল্লেখিত রাজ্য সমূহের উপজাতীভূক্ত জনগোষ্ঠি সমূহের পুরো জনসংখ্যাই মঙ্গোলীয় তিব্বতী এবং বর্মী জাতিতাত্ত্বিক ধারার অন্তর্ভূক্ত। এলাকাটির জনগোষ্ঠির বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখার অন্তভূক্ত এবং এখানকার জনগোষ্টি সাধারণ সাংস্কৃতিক সামাজিক ধারার কিছু কিছু বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেও ঐসব অঞ্চলে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। পুরো এলাকাটি পার্বত্য অরন্য আচ্ছাদিত ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল ভৌগলিক পরিবেশের আত্ততাধীন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলটির জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত হালকা এবং জন সংখ্যার বন্টন ও যথেস্ট অসম এবং হালকা। পার্বত্য ঐ এলাকাটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুবর্তী পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং চীন, ভারত আর দঃপূঃ এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) ভূক্ত অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাব ভূমি (Vicinal land) এশিয়ার এই ত্রিভূজ ভূ-ভাগটি বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্ববহন করে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বমোট আয়তন ১৩,১৪৮ বর্গ কি.মি.। আয়তনে অঞ্চলটি লেবানন, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, কাতার, কিংবা লুক্সেমবার্গের চেয়ে বড়। বাংলাদেশের এই বৃহৎ পার্বত্য -অঞ্চলটি সব দিক দিযে ভূমি-পরিবেষ্টিত। অঞ্চলটির সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইখ্যংছড়ি থেকে মাত্র ১২ কি. মি. পশ্চিমে কক্সবাজার জিলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙ্গামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালী থেকে মাত্র ৩০ কি. কি. দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জিলার সংকীর্ণ একফালি ভূ-ভাগ যা কোন স্থানেই পূব- পশ্চিমে ৫০ কি. মি. এর চাইতে বেশী প্রশস্ত নয়- তা পার্বত্য-চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে। চট্টগ্রামের বন্দর যা কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা এবং সমস্ত চট্টগ্রামের বন্দর কলকারখানা এবং নগরীসহ সমস্ত জিলা, পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর এবং চাঁদপুর জিলাসমূহের বিদ্যুতের সম্পূর্ণ সরবরাহ এই কর্ণফূলীর পানির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নৌ পরিবহন এবং কৃষির জলসেচ ব্যবস্থার জন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলাদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা ইত্যাদি নদীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এইভাবে দেখা যায় যে, সমস্ত চট্টগ্রামও কক্সবাজার জিলাদ্বয়ের প্রায় সোয়াকোটি মানুষের জীবন জীবিকা তথা অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরের অস্তিত্ব ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম উৎস পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। ঐ সব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনেতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া দুর্গম এবং পর্বতঘেরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান চট্টগ্রাম বন্দর, মহানগর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূ-ভাগকে ভূ-রাজনৈতিক এবং অবস্থানগত দুর্ভেদ্যতা দান করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতায় চট্টগ্রাম অঞ্চল কৌশলগতভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজভেদ্য (Strategically) ঐ এলাকাকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতিকুল বৈশিষ্ট্য দান করবে [২ নং মানচিত্র]

পারিসরিক বৈশিষ্ট্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-রাজনৈতিকভাবে (Geo-Political) গুরুত্ব বহন করে। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটির সন্নিহিত অবস্থান (Vicinal or relative location) অত্যন্ত প্রতিকূল। একমাত্র পশ্চিমের বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর, পূর্ব কিংবা দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভারত এবং মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত দুর্গম, পার্বত্য, বনাবৃত এবং জনবিরল, অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টি মাত্র। পার্বত্য-চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম ছাড়িয়ে প্রায় ৬৫০ কি.মি. দূরে চীনের উইনান প্রদেশের সীমান্ত অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি (উঃঃ) জেলার প্রায় ১১০ কি.মি. সীমান্ত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন। পার্বত্য-রাঙ্গামাটির ২৪০ কি.মি. সীমানা ভারতের মিজোরাম (Lusici Hills) ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভক্তি নির্দেশ করে এবং পার্বত্য-

বান্দারবন জেলার প্রায় ১৫৫ কি.মি. সীমান্তরেখা মায়ানমারকে বাংলাদেশে থেকে আলাদা করেছে। (Bangladesh Administrative Map prepared by Graphosman, Dhaka, 1992)। পার্বত্য চট্টগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ (Non-Compact) এবং দীর্ঘায়তন (Elongate)। প্রস্থের তুলনায় অঞ্চলটি কয়েক গুণ বেশি দীর্ঘ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৃহত্তম ভূ-ভাগ। এসব ভূ-পারিসরিক বৈশিষ্ট্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক বলে বিবেচ্য। পূর্ব বর্ণিত মানচিত্র (Graphosman, 1992) বিশেষণে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-দক্ষিণে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ কি.মি. এবং গড় প্রশস্ততা প্রায় ৫০ কি.মি.। অঞ্চলটির পূর্ব-পশ্চিম দিকে সবচেয়ে প্রশস্থ স্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কি.মি. (রামগড় থেকে বরকল-এর উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত) এবং অপ্রশস্থ স্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৪০ কি.মি. (চন্দ্রঘোনা থেকে মিজোরামের প্শ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত)। পার্বত্য চট্রগ্রাম থেকে (কাপ্তাই কিংবা চন্দ্রঘোনা) সড়ক পথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব যদিও ৫০/৬০ কি.মি. বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দারবান জেলার নাইখ্যাংখছড়ি থানার শেষ প্রান্ত (পূর্বাংশ) থেকে নিকটতম সমুদ্র উপকুলের দূরত্ব মাত্র ১৩/১৪ কি.মি. (Graphosman, 1992)। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত এলাকার অবস্থান থেকে সমুদ্রের এই নিকটবর্তিতা সমগ্র অঞ্চলটিকে দান করেছে বিশেষ ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব।

ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস

পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস প্রায় অজানা বা এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। দুর্গম গভীর অরণ্যাবৃত বন্ধুর ভূমিরূপ বিশিষ্ট ঐ এলাকা প্রাচীনকালে হিংস্র বন্য জন্তু-জানোয়ারের দখলে ছিল। ধারণা করা হয় আজ থেকে হাজার বছর আগে ঐ এলাকয় মুষ্টিমেয় কিছু ভ্রাম্যমান অরণ্যাবাসী জংলী জনগোষ্ঠী ফলমূল সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী শিকার করে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলত। প্রায় জনশূন্য ঐ অঞ্চলের সাথে সমতলের সভ্য জগতের প্রথম যোগাযোগ ঘটতে শুরু করে ভারত বর্ষে মোঘল শাসনামলে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে। ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি অরণ্যবাসী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (যেমন কুফিজনধারাভুক্ত ম্রো পাংখো, যুমি এবং লুসাই ইত্যাদি) পার্বত্য চট্টগ্রামের অরন্যে বিচরণ করত (Ahmed, 1990)। এদের পরবর্তীতে এখানে পার্শ্ববর্তী বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে মারমা, চাকমা, ও উত্তরের ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে ত্রিপুরা (টিপরা) উপজাতীয়রা দলে দলে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারতবর্ষের মোঘলদের সুবে বাংলার প্রশাসক গণ চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন এবং কোন কোন উৎপন্ন দ্রব্যের (যেমন হাতি, তুলা) উপর করারোপ করতেন। মাঝে মধ্যে বার্মার বিভিন্ন রাজাগণও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব জনগোষ্ঠী বেশির ভাগই নিজেদের মূল নিবাসস্থল থেকে যুদ্ধ কিংবা অন্য কোন কারণে বিতাড়িত বা দেশান্তরী হয়ে এখানে আগমন করে। তারা প্রায় সময়ই একে অপরের সঙ্গে বৈরী ভাব পোষণ করত। মোঘলদের পর ঔপনিবেশিক বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং ১৮৬০ সালে

পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের সরাসরি দখল (Annex) নিয়ে আসে। ১৯০০ সালে বৃটিশ উপনিবেশিক সরকার ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী বাঙালী ভারতীয় প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্যে এবং ঐ এলাকায় একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে "চিটাগাং হিলট্রাক্টস রেগুলেশন ১৯০০ (Chittgong Hill tracts Regulation 1900) চালু করে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী জেলার প্রশাসক সেখানকার সব ধরনের অভিগমন বা জনস্থানান্তর (migration and resettlement) বন্ধ বা প্রতিরোধ করতে পারতেন। এই আইন প্রণয়নের দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলোকে এক একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করানোর প্রয়াস চালায় (Cited in Ahmed, 1990)।

১৯৩৫ সালে বৃটিশ প্রণীত ভারত শাসন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামকে "সম্পূর্ণ বা পৃথকাঞ্চলে" বা totally excluded Area" হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সংলগ্ন বাংলাভাষী সমতল অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের এই কৌশলের কারণ ছিল– ঐ অঞ্চলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ বন্ধ করা ও সেখানে বাঙালী প্রভাব ও বসতিস্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করা। প্রায় জনশূন্য এবং সম্পদ সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বার্মা, আরাকান কিংবা উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত বসত স্থাপনকারী উপজাতীয়দের যতটুকুই দাবী ছিল– অঞ্চলটির কাছের সংলগ্ন চট্টগ্রামের সমতলবাসী বাঙালী জনগোষ্ঠীর ঐ অঞ্চলটির উপর অধিকার বা দাবী কোন যুক্তিতেই কম ছিল না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক বৃটিশরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে ভারতবর্ষে তাদের শোষণ-শাসন পাকাপোক্ত করে নিয়ে মানবিকতার ন্যায়পরায়তার যুক্তিকে লংঘন করে ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্নতার পথ প্রতিষ্ঠিত ধারার ধূয়া তোলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে (Amin, 1988/'89 and Shelley, 1992)।

১৯৪৭ সালে যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারত বিভক্তি মেনে নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত করতে তৎপর হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের অমুসলিম হওয়ার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অঞ্চলটির ভারতভুক্তি দাবী করে বসে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ জনবিরল সম্পদ-সমৃদ্ধ অঞ্চলটির অহিন্দু জনসংখ্যাধিক্য এবং চট্টগ্রাম জেলার স্বার্থে সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলটির পাকিস্তানভুক্তির দাবী পেশ করে। বৃটিশ শাসকরা কংগ্রেসের দাবী প্রায় মেনে নিয়েও শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের ফিরোজপুর (শিখজনসংখ্যা সমৃদ্ধ) জেলার ভারতভুক্তির বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করে (Tayyeb, 166 মুসলিম লীগের দাবীতে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাইহিলস (মিজোরাম) এবং কাছাড় জেলার দাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিল (Sukhwal, 1971)। কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে রেডক্লিফ রোয়েদাদে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন ঐ সব জনবিরল অহিন্দু জন অধ্যুষিত পার্বত্য-অঞ্চলসমূহ ভারতের আসামের সাথে জুড়ে দেয় (Ahmed, 1990 and Rahman, 1958) পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন কিছু শিক্ষিত প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ অঞ্চলটির ভারতভুক্তির পক্ষে দাবী তুলেছিল এবং ১৯৪৬ সালে তারা ঐ প্রচেষ্টার

অসারতা বুঝতে পেরে "The Hillmen Association"-এর ব্যানারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা বা কুচবিহারের মত দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা (the status of a princely state) দাবী উত্থাপন করে। তাদের ঐ দাবীও প্রত্যাখ্যাত হলে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে চাকমা নেতা স্নেহ কুমার চাকমা মরিয়া হয়ে রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন (Shelley, 1992)-এর বিপক্ষে স্থানীয় মারমা মঘ গোষ্ঠির দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার নেতৃবৃন্দ বান্দরবানে বার্মার পতাকা স্থাপন করেন (পূর্বোক্ত)। ইতিহাসের এই চিত্র দু'টি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের অনৈক্যের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৫ সালে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের "বিশেষ মর্যাদা"-র মাধ্যমে সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী করাচী থেকে ঐ অঞ্চলে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন চালু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সকল জনগণ্যের জন্য ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করে দেয়া হতে থাকে (Mey, 1986)। ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে তার সাবেক "বিশেষ মর্যাদা" হারিয়ে ফেলে (Ahmed, 1990) পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনে মার্কিন সহায়তায় ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের "কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প" চালু হয়। এর ফলে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কয়েকশ' বর্গ কি.মি. এলাকা বিস্তৃত বিশাল হ্রদ সৃষ্টি করা হয় এবং হ্রদের পানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠির প্রায় ৪০% ভাগ চাষের ভূমি এমনকি রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীসহ পুরাতন শহরের সম্পূর্ণটা বন্যার পানিতে ডুবে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার চাকমা পরিবার কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি এবং অনেকেই পার্শ্ববর্তী ভারতে ত্রিপুরা বা মিজোরামে চলে যায় (Rob, 1990 ; Ahmed, 1990 and Shelley, 1992) এবং এই কৃত্রিম প্লাবন ও চাকমাদের দেশান্তরী হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকলের অলক্ষ্যে আর নব্য উপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির অযুত অবহেলায় অবধারিত অদৃষ্টের মত অংকুরিত হয় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর বর্তমানের সবচেয়ে বড় হুমকি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার "বাঙালী জাতীয়তাবাদ"-কে দেশের একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে এবং রাষ্ট্রপতি মুজিব সকল উপজাতি, যারা বাংলাদেশে বসবাস করে, তাদেরকে বাঙালী হয়ে যেতে আহ্বান করলে "অগ্নিতে ঘৃতাহুতি"র মত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় (Amin 1988/ '89)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ও গবেষক নূরুল আমিনের মতে, After the emergence of Bangladesh the Awami league Government led by Sheikh Mujibur Rahman created a reign of terror in the Chittagong Hill Tracts area. It committed another misdeed by not granting special status to the CHTs people under the constitution of 1972 which they had enjoyed under the 1900 regulation (Amin, 1988)

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী চাকমা নেতা ও সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ একদল চাকমা প্রতিনিধি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে তাদের ৪ দফা দাবী উত্থাপন করেন। দাবীগুলো ছিলো (Ray, 1985, Cited Amin, 1988/'89।

১) নিজস্ব কানুনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত শাসন,

২) বাংলাদেশের শামনতন্ত্রে বৃটিশ প্রণীত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ধারার পুনঃসংযোজন,

৩) প্রশাসনিক পূর্ণ ক্ষমতাসহ স্থানীয় উপজাতীয় রাজাদের ক্ষমতা প্রদান এবং

৪) সাংবিধানিকভাবে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের অপরিবর্তনীয়তার নিশ্চয়তা বিধান এবং বাঙালী পরিবারসমূহের বসতিস্থাপন বন্ধ করার ব্যবস্থা সমন্বয়।

শেখ মুজিবের মত উদার রাজনৈতিক নেতাও চাকমা প্রতিনিধিদের এই চারটি দাবীর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যত বাস্তবতার ভয়াবহ চিত্র অনুধাবন করে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চাকমাদের এসব দাবী-দাওয়া নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলে অভিহিত করেন (Amin 1988/'89 P. 140)। তাছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতীয়দের ঐসব তৎপরতা পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের মূল ধারায় (Mainstream) মিশে গিয়ে যে, বাঙালী হয়ে যেতেও আহবান করেন। (Hussain, 1991. p. 440)।

১৯৭২ সালের ১৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু চীনপন্থী কম্যুনিস্ট চাকমা উপজাতীয়দের অধিকারের দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা করে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে রূপান্তরিত করতে তৎপর হয় এবং তাদের উদ্যোগে "জনসংহতি সমিতি" নামের একটি সংগঠন গড়ে উঠে। শেখ মুজিবের অনমনীয় মনোভাব এবং কঠোরতার ফলশ্রুতিতে উপজাতীয়দের দাবী আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে "জনসংহতি সমিতি" থেকে জন্ম নেয় "শান্তিবাহিনী" ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারীতে। স্বাধিকারের দাবী-দাওয়ার এবং উপজাতীয়দের "স্বাধীনতা"-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার পরিবর্তিত হয়। শান্তি বাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলা ক্রমে গেরিলা যুদ্ধে মোড় নেয় এবং অশান্তি আর হত্যা ধ্বংসের ভয়াবহতায় ভরিয়ে দেয় কর্ণফুলি, সাঙ্গু, মাতামুহুরী আর কাসালং এর শান্ত উপত্যকা আর অধিত্যকাগুলোকে। এবার চাকমাদের দাবী-দাওয়ার আরো সুস্পষ্টভাবে যোগ হয় নতুন কিছু ধারা, যেমন–

১৯৪৭ সালের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত সকল অ-উপজাতীয় অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী সকল জনসংখ্যাকে পার্বত্য চট্টগাম থেকে পুরোপুরি উঠিয়ে নিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল নিরাপত্তা বাহিনী উচ্ছেদ করে স্থানীয় উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা বাহিনী বহাল করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় উপজাতীয়দের উপর ন্যাস্ত করতে হবে।

যে কোন সচেতন ব্যক্তিই এসব দাবী-দাওয়ার ধারাগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবে যে উপজাতীয়দের ঐসব দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা স্থানে অসহায় গরীব অ-উপজাতীয় লোকজনদের উপর "শান্তি বাহিনী"র হামলার খবর আসতে লাগলে এবং ক্রমে তাদের আক্রমণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনের উপরও পরিচালিত হতে শুরু করলে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘীনালা, আলীকাম ও রুমার তিনটি ছোট সেনাবিনাস কেন্দ্র এবং অনেকগুলো সামরিক চৌকি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। Hossain, 1991)

১৯৭৫ সালের আগস্টের পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আগমন ঘটে তরুণ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের। তিনি বাংলাদেশেরই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জনবিরল সম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক সমতলবাসী বাস্তুহারা এবং দরিদ্র ভূমিহীন বাঙালী চাষী পরিবারকে পুনর্বাসিত করেন। বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক জিয়া, তিব্বতে "সমাজতান্ত্রিক, চীন এবং জম্মু (কাশ্মীর)-তে গণতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ" ভারত যেমন জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সংখ্যালঘু বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রবণ অঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার পুনঃস্থাপন (Resettlement) ঘটায়, তেমনি উদ্যোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের একটি অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী অপতৎপরতার স্থায়ী মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেন। সাথে সাথে তিনি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্যোগে মাত্র ২/৩ বছরের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের খাসজমিতে প্রায় এক লক্ষের মত ভূমিহীন গরীব মানুষ পুনবার্সিত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জিয়ার করুণ মৃত্যু ঘটলে তার এসব আন্তরিক পরিকল্পনাসমূহ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এবার পট-পরিবর্তনের ফলে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করে এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় একই নীতি বহাল রাখেন। 'শান্তি বাহিনী'র তৎপরতা অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত সরকার অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে চাকমা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে থাকলে নিতান্ত সামান্য উৎপাত ক্রমে দরিদ্র বাংলাদেশের জন্য বিরাট ক্ষতিকর আপদ হিসেবে দেখা দেয়। উপায়ন্তর না দেখে এরশাদ সরকার চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে তৎপর হন। এই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ এরশাদের পরে আগত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ও চালিয়ে যান। কিন্তু চাকমা নেতারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের আগের দাবী দাওয়ায় সম্পূর্ণ অনঢ় রয়েছেন এবং মাঝে মধ্যেই নানা মানবাধিকার সংস্থার ছদ্মাবরণে বিদেশী শক্তি এবং ভারতীয় প্রশাসন (বি.এস.এফ বা বিদেশ মন্ত্রণালয়)-এর অযৌক্তিক উদ্দেশ্যমূলক হস্তক্ষেপ ঐসব উদ্যোগকে বার বার নস্যাৎ করে দিচ্ছে (১৯৯২/৯৩-এর যে কোন জাতীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দ্রষ্টব্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন শক্তির ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও বাস্তবতা

পার্বত্য-চট্টগ্রামের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট বিদেশী শক্তির প্রভাব ও সংযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (Shelley, 1992, Hossain, 1991)। অঞ্চলটির মিশ্র জনসংখ্যা এবং বিপুল ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নানা আঞ্চলিক এবং দূরবর্তী আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহকে অঞ্চলটির উপর নজর রাখতে উৎসাহিত করেছে। ভারত মহাসাগরে এবং সংলগ্ন ভৌগলিক এলাকায় নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করতে বা ধরে রাখতে ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসি গোষ্ঠি বাংলাদেশের এই নাজুক অঞ্চলটির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে উৎসাহিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব সমস্যায় দূর-প্রাচ্যের জাপান এবং দূরান্তের অস্ট্রেলিয়ার মত আপাতঃ নিরীহ রাষ্ট্রের আগ্রহের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানের 'বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি (Economic Super Power) জাপান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সাম্প্রতিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ধারণা "বিশ্ব মঙ্গোলীয়" বা "বিশ্ব বৌদ্ধ পুনরুত্থান" (Pan-Mongolian or Pan Budaist Revivalism)-এর আওতায় এবং প্রকৃত অর্থে অদূরভবিষ্যতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগর ও দঃ এবং দঃ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলসমূহে স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতে জাপানের ঐ সচেতনতা। অস্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত রাখতে বা খর্ব করতে এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় র‍্যাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রখর নজর রাখছে এবং "মানবাধিকার প্রশ্ন" তুলে বাংলাদেশের উপর চাপ ফেলতে প্রয়াস পাচ্ছে। নিচে সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যায় কয়েকটি শক্তির স্বার্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করা হল ঃ

বাংলাদেশের স্বার্থ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বার্থ জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ সার্বভৌম অঞ্চল। জনভারাক্রান্ত ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যত বিপুল জনসংখ্যার পুনবার্সনের জন্য হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি অতীব প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দারুনভাবে বঞ্চিত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্পদ-সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ এই পার্বত্য অঞ্চলটিকে বাংলাদেশের "Land of Prmise" বা "প্রতিশ্রুত সমৃদ্ধির লীলানিকেতন" বলা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে এবং সমৃদ্ধ বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎস, ফলমুল উৎপাদনের উপযোগী ক্ষেত্রে অনাহরিত-অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের জন্য এক অপরিহার্য অঙ্গেপরিণত করেছে। ভূ-রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটি বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরসহ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী ও প্রায় সোয়া-কোটি জন অধ্যুষিত চট্টগ্রাম আঞ্চলকে (কক্সবাজারসহ) কৌশলগত নিরাপত্তা (strategic Security) বা ভূ-রাজনৈতিক আড়াল (Strategic Defence) ও গুরুত্বদান (Thickness) করেছে। পার্বত্য-চট্টগ্রাম ছাড়া সম্পূর্ণ বৃহত্তম চট্টগ্রাম অঞ্চল একফালি সরু প্রলম্বিত সহজ-ভেদ্য ভূমিতে পরিণত হবে (thin, eongated and vulnerable Land)। চট্টগ্রামের প্রায় সকল নদ-নদী

পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলটির বিচ্ছিন্নতা বৃহত্তর চট্টগ্রাম (কক্সবাজার জিলাসহ) অঞ্চলের কৃষিজমির পানি সরবরাহ, নৌ-যোগাযোগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের নাব্যতা এবং কাপ্তাই হতে সরবরাহকৃত জলবিদ্যুতের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করে তুলবে সর্বোপরি পার্বত্য-চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রায় পাঁচলক্ষ বাংলাভাষী গরীব এবং মধ্য বিত্তের অস্তিত্ব ও অঞ্চলটিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত।

মায়ানমারের স্বার্থ ঃ বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রামের সাথে মায়ানমারের প্রায় ১৭০কি.মি. সাধারণ সীমানা বর্তমানে পার্বত্য- চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠিদের বেশীর ভাগ অংশই মাত্র এক বা দুই তিন শতক আগে মায়ানমার থেকে দেশান্তরী হয়ে বাংলাদেশের অঞ্চলে প্রবেশ করে (Hutchinson, 1906 and Burman, 1983)। ঐ অঞ্চলের উপজাতীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বেশীর অংশের ধর্ম, ভাষা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টাবলীর সাথে মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির যথেষ্ঠ মিল রয়েছে। বর্তমানে মায়ানমারের ঐ অঞ্চল মানুষের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা বিশেষ করে কারেন, রোহিঙ্গা, মান, চিন ইত্যাদি উপজাতীয়রা বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে লিপ্ত। তা ছাড়া ঐ এলাকায় কম্যুনিষ্ট গেরিলারাদের তৎপরতাও প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। আরাকানের রোহিঙ্গাদের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের বর্তমান সম্পর্ক খুবই খারাপ। এমতাবস্থায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মায়ানমারকে সম্পূর্ণ এলাকাটির উপর বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে। তবে নিজদেশের বর্তমান অশান্ত এবং অনিশ্চিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অভাবগ্রস্থ মায়ানমারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন আধিপত্যবাদী ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

ভারতের স্বার্থ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতির পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি ভারত (Shelley,-1992; Rahman, 1990,; Hossain, 1991 and Rob, 1991)। চামকা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগঠিত করা থেকে নিয়ে তাদের আশ্রয়দান, অস্ত্র-যোগানো, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ দান এবং আন্তর্জাতিক ফোরাম সমূহে এদেরকে সমর্থন দান করার ব্যাপারে ভারতের প্রত্যক্ষ সংযোগের অজস্র প্রমাণ রয়েছে (Rob, 1991)। পার্বত্য-চট্টগ্রামে ভারতের ভীষণ রকমের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ জড়িত। ১৯৪৬/৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ভারতীয় কংগ্রেস পার্বত্য-চট্টগ্রামের ভারত-ভূক্তির দাবি তুলেছিল (Tayeb, 1966; and Ahmed, 1958) বর্তমানে ভারত এশিয়ার অন্যতম শক্তি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরাশক্তি বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে ভারত মহাসগরে ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সুস্পষ্টভাবে সক্ষম হয়েছে। (Bindra, 1982)। কিন্তু, বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষ করে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, তামিল নাড়ু, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, গোর্খাল্যান্ড (দার্জিলিং) প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত জোরালো স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী (Secessionist Movements) দানাবেঁধে উঠেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে (seven sisters states of India) বর্তমানে প্রবণতায় ভারত বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত চীনের কাছে শোচনীয় পরাজিত হলে ভারতের এই অঞ্চলটির কৌশল গত এবং ভূ-রাজনৈতিক দূর্বলতা

বিশেষভাবে ধরা পড়ে। চীন মাত্র ২/৩ দিনের মধ্যে বৃহত্তর আসামের সম্পূর্ণ উত্তরাংশ (ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ) কব্জা করে নেয়। তা ছাড়া একটি ভবিষ্যত শত্রু ভাবাপন্ন প্রতিবেশী নেপাল কিংবা বাংলাদেশ ভবিষ্যতের এ ধরনের সংঘর্ষে চীনের পক্ষ নিলে ভারতের ঐ অসুবিধা জনক ভূ-কৌশলগত অঞ্চলটির অস্তিত্ব সম্পূণ্ বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। (Sukhwal, 1971) । বর্তমানে আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মিজোরাম ULFA সম্মিলিত আসাম মুক্তি ফৌজ (United Liberation Forces of Assam) এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গেরিলা সংগঠনসমূহ ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদিরা যুদ্ধরত। ভারত ঐসব দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য সমূহে দ্রুত সরবরাহ পাঠাতে বা যোগাযোগ বজায় রাখতে রীতিমত হিমশীম খায়। ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তী পরিস্থিতিতে যদি কোন দিন নেপাল বা বাংলাদেশ অথবা চীন ভারতের মূল ভূ-খন্ডের সাথে সমগ্র উত্তর পূর্বাংশের "সাতবোন" রাজ্য সমূহকে সংযুক্তকারী সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর বন্ধ করে দেয় তবে ঐ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য সহজেই খতম হয়ে যেতে পারে। ঐসব পরিস্থিতি বিচেনায় ভারতকে মরিয়া হয়ে ঐ প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত (land blocked) উত্তর-পূর্বাশের সাথে সমুদ্র পথের সংযোগ ঘটানোর জন্য একমাত্র উপায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বা ঐ উপকূলীয় কোন সুবিধাজনক স্থানকে কেন্দ্র করে সোজা উত্তর পূর্ব দিকের ভূ=-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে মিজোরাম বা ত্রিপুরা রাজ্যের সংযোগ সাধাণের চিন্তাভাবনার দ্বারস্ত হতে হয়। শিল্প এবং প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ভারত সহজেই বঙ্গোপসাগরের অগভীর দক্ষিণ চট্রগ্রাম (উখিয়ারা বা চকোরিয়ার চিরিঙ্গা-মালুম্পঘাটের কাছের ঘাড়িতে) উপকূলে ভাসমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করে মাত্র ১৩/১৪ কি.িমি. বাঙলাদেশী ভূমির (প্রয়োজন জোর করে বা ২৫ বছর চুক্তির মত চাপিয়ে দেয়া চুক্তির বলে) উপর দিয়ে চলে পার্বত্য-চট্টগ্রামে পৌছাতে সক্ষম। এখন শুধুমাত্র পার্বত্য-চট্টগ্রামই হতে পারে ভারতের এই ভূ-কৌশলগত স্বপ্নকে সফল করার একমাত্র ক্ষেত্র। তাই সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে ভারত সহায়তা করে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফলকারী তথাকথিত "শান্তি বাহিনী"'র লোকজনকে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত ভারত দীর্ঘদিন ধরে পোষে চলেছে প্রায় অর্ধলক্ষ চাকমা শরাণার্থীকে তার ঐসব উত্তর-পূর্ব অঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের সরকারি শিবিরগুলোতে। বাংলাদেশ নিরাপত্তাবাহিনীসমূহের কাছে আত্মসমর্পণকারী "শান্তিবাহনী" সদ্যদের বর্ণনা এবং তাদের জমাকৃত অস্ত্র-শস্ত্রে তালিকা ও ব্রান্ড দেখে ভারতের সরাসরি সংযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। (Rahman, 1990 and Shelley, 1992)। তা ছাড়া ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ৬০০/৬৫০ কি. মি. ইউনান সীমান্ত থেকে ভবিষ্যতে ভারত মহাসাগরে প্রবেম করতে হলে ঐ একই পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবশোধীকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা ভারত মোটেই বরদাশ্ত করতে পারবে না। সুতরায় আগে ভাগেই নিজের দখল দারি এবং অধিকারের পথ ভারতকে করে নিতে হবে। কিন্তু ভারতের এই অধিপত্যবাদী দূরদৃষ্টিমূলক মনোভাব বাস্তবায়নের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ পার্বত্য দুর্গম মিজোরাম, মনিপুর, ত্রিপুরা কিংবা নাগাল্যাণ্ডের মঙ্গোলীয় বিভিন্ন জনগোষ্টিসমূহ দারুণ ভারত বিদ্বেষী মনোভাব পোষন করে এবং অনেক দিন থেকে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সচেতন একতাবদ্ধ

বিপুল জনসংখ্যাসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালী এবং বিশেষ করে মুসলমানগণ ভারতের বিন্দুমাত্র অপতৎপরতা সহ্যকরতে প্রস্তুত নয়। বাংলাদেশের যে কোন প্রতিষ্ঠিত আভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় ভূ-খন্ডে ভারতের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মোড় নিতে বাধ্য। ঐসব পরিস্থিতি ভারতকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সরাসরি বা বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে সাহসী করবে না। অবশ্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের যে কোন জাতীয়তাবাদী সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে "ফারাক্কা"-র মত ভারত "চাকামা সমস্যা"কে সফল "চাবি" হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে যাবে।

চীনের স্বার্থ ঃ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সম্রাজ্যের। পতনের পর এশিয়ার বিপুল জনশক্তিতে বলিয়ান বিশাল চীন বর্তমান জামানার একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। এশিয়ার প্রধানশক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভৌগলিক ও অবস্থানগত কারণে চীন ভারত মহাসাগরের নীল জলভাগে সরাসরি প্রবেশাধীকারে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে তার অন্যতম কিংবা এশিয়ায় প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বী (শত্রু?) ভারত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ও বিমানবাহী জাহাজ (৩-টি)-এর বলে ভারত মহাসাগরে স্বীয় প্রভাব প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে (Scisha 1977, Subrahmanyam, 1972 and Kodikara, 1979)। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশিতে প্রবেশ করতে হলে চীনের নিকটতম সংযোগ পথ হচ্ছে তিব্বতের দক্ষিণ পূর্বাংশের ভূটানের সীমান্ত সংলগ্ন চুম্বি-উপত্যকা থেকে মাত্র ৬০ মাইল বা প্রায় ১০০ কি.মি. দক্ষিণে দার্জিলিং-শিলিড়ি পেরিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন (বর্তমানের) বাংলাদেশে (উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চল) অবরতণ পূর্বক আরো প্রায় ৫০০/৬০০ কি. মি. সমতল ভূমি পেরিয়ে সংলা বা ৭০০/৮০০ কি.মি. দূরের চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা লাভ করতে হবে। এক্ষেত্রে চীনকে মোকাবেলা করতে হবে বর্তমানে বিপুলভাবে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন ভারতের সাথে। তাছাড়া বিজাতীয় সংস্কৃতির ভিন জাতি চীনাদের বাংলাদেশীরাও বেশী দিন অতিথেয়তা দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে চীনকেও অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলায় স্থায়ীভাবে ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারে পৌছতে হলে মায়ানমারের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ইউনান প্রদেশ থেকে যাত্রা করে সোজা দক্ষিণ পশ্চিম এবং পরবর্তীতে পশ্চিম হয়ে প্রায় ৭০০ কি.মি. অত্যন্ত দূর্গম পার্বত্য এবং বনাবৃত জনবিরল মায়ানমার ও ভারতীয় (উঃ পূঃ) ভূ-ভাগ অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে হবে। এবং এখান থেকে সহজেই মাত্র ৫০/৬০ কি. মি. চট্টগ্রাম বন্দর বা দক্ষিণে আরো কম দূরত্বে বঙ্গোপসাগরের কূলে পৌছাতে পারবে। ঐ ক্ষেত্রে বার্মা (মায়ানমার), ভারত, এবং বাংলাদেশের পার্বত্য-অঞ্চলের উপজাতীয় মঙ্গোলীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিগুলো নৃতাত্ত্বিক (মঙ্গোলীয়) সগোত্রীয় চীনাদের সহজেই বরণ করে নিতে পারে। উল্লেখ্য, ঐ অঞ্চলে উপজাতীয়রা বৃটিশ ভারতের ১৯২৬ সালের ইউনডাবো (Yundabo) চুক্তি বলে সৃষ্ট ভারত-বাংলাদেশ-বার্মার কৃত্রিম রাজনৈতি সীমানাকে কখনো স্বীকার করে নিতে পারেনি (vung, S.G. 1968) মায়ানমারের উত্তরাংশের চিন, আরাকানী চাকমা, মারমা ইত্যাদি) ভারতের মিজো ইত্যাদি জনগোষ্ঠিগুলো মূলত ঃ একই নৃ–ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের কারেন, কাচিন, শানজন গোষ্ঠি এবং ভারতের U.L.F.A. এবং অন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রচুর কম্যুনিস্ট

গোরিলা তৎপর রয়েছে। নাগা, লুসাই, মনিপুরী এবং আসামী সকল গেরিলাদের সাথে পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাকমা শান্তি বাহিনীর একটি বড় অংশের সংযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য-চট্টগ্রামের "শান্তিবাহিনী"র পূর্বসূরী জনসংহতি সমিতি মূলতঃচীন পন্থি কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত একটি দল ছিল (Amin, 1988/89)। জানা গেছে, ভারতের উত্তর পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রাম এবং মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে স্থানীয় মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠিসমূহ একটি বৃহৎ "কনফেডারেন্সী" ধরনের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চায় (Burman, 1983) ভবিষ্যতের ঐ পরিকল্পিত স্বাধীন রাষ্ট্রটির আয়তন হবে সমস্ত বাংলাদেশের চেয়ে কয়েকগুণ বড়। ঐ রাষ্ট্রটির ভাবি রূপকাররা ও সমুদ্র সংযোগ পথের প্রয়োজনে চট্টগ্রামের উপকূল রেখার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা এবং কম্যুনিস্ট গ্রুপসমূহের সাথে সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায় (Sukhwal, 1971, and Burman, 1983) এবং বাস্তব-ভূরাজনৈতিক তাকিদে দূরবর্তী চীন ঐ সকল কম্যুনিস্ট এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর সম্ভাবনাময়গুলোকে একত্রিত, সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে এদের তৎপরতার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়।

উপসংহার ঃ ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি, কিংবা কৌশলগত যে কোন দিকের বিবেচনাই ক্ষুদ্রায়তন এবং গরীব বিপুল জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের জন্য স্বীয় এক-দশমাংশ সার্বভৌম এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিমেয়। ঠিক একইভাবে তাৎপর্যময় ভূ-রাজনৈতিক বা অবস্থাগত কারণে বিশ্বের দুই উদীয়মান শক্তি ভারত এবং চীনের কাছেও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলটি নিজ নিজ ইঙ্গিত বলয়ে প্রবেশের সম্ভাব্য ভবিষ্যত নির্বাচিত প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচ্য। অপর দিকে, পার্বত্য- চট্টগ্রামের পুরোনো বসতিস্থাপনকারী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভূক্ত উপজাতীয়দের কিছু সংখ্যক লোক, বিশেষ করে চাকমাদের কিছু সদস্য, কিছু যৌক্তিক এবং বেশীর অংশে অযৌক্তিক প্রেক্ষিতে এবং বহুলাংশে বাইরের স্বার্থন্বেষী শক্তির ইন্ধনে ঐ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার এক আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছে। তারা বিগত এক দশকে বহিঃশক্তির স্বকীয় সহায়য়তায় পার্বত্য-চট্টগ্রামের শান্তি পরিবেশকে করে রেখেছে দারুণ অশান্ত। শান্তিবাহিনী "নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্তা হামলায় এ পর্যন্ত শতাধিক অফিসারসহ প্রায় সহস্রাধিক সামরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং বাংলাভাষী ও উপজাতীয়সহ মোট প্রায় তিন/সাড়ে তিন হাজার নিরীহ পার্বত্য-চট্টগ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছে। এখানকার ঐসব পরিস্থিতির কারণে অসংখ্য লোকালয় উজাড় হয়ে গেছে এবং বিপুল পরিমাণে সম্পদের (বনজসম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি) ক্ষতিসাধিত হয়েছে। বিপুলজনশক্তি সমর্থিত, সুসংগঠিত, সুসজ্জিত প্রশিক্ষিত শক্তিশালী বাংলাদেশী নিরাপত্তা ও সামরিক বাহনীর প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপে এবং উৎপীড়িত অভিবাসী বাঙালী জনগোষ্ঠির ক্রোদ্ধ প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়ায় বিদেশী শক্তির সাহায্য নির্ভর মুষ্টিমেয় স্বল্প জনসংখ্যা সমর্থিত চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এক অবধারিত পরাজয় ও সম্ভাব্য বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপথগামী অভিমানী এসব পাহাড়ীদের এই অনাকাঙ্খিত ও করুন পরিনতির কোন বাংলাদেশীরই কাম্য হতে

পারে না। একই সাথে, ঐসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধ্বংসাত্তৎপরতা বা অযৌক্তিক দাবী দাওয়াকে মোটেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাদের উপস্থাপিত দাবী দাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাসমূহের সুস্পষ্ট লংঘন রয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন যা মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপর বাঙলাদেশের সার্বভৌমত্বের সার্বিক পরিসমাপ্তি ঘোষিত হবে।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, জাতীয় সার্ববৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রশ্নে বিশ্বের যে কোন উদার বা প্রগতিবাদী রাষ্ট্র বলে যারা অনেকের কাছে স্বীকৃত, সেসব রাষ্ট্র ও অত্যন্ত অপোসহীন ও কঠোর পদক্ষেপগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজতন্ত্রী চীন মাওবাদীকে নীতিকে অগ্রহ্য করে সংখ্যালঘু তিব্বতী জনসংখ্যার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমানোর জন্য এবং তিব্বতকে চীনের সার্বভৌম অখন্ড অংশ হিসেবে ধরে রাখার স্বার্থে বিরল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং ভিন জাতীয় এবং তিন সাংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তিব্বতের ভৌগলিক আয়তনের মধ্যে চীনের প্রধান জনগোষ্ঠি হুন জাতির (পুনজাতির চীনের মোট জনসংখার প্রায় ৯০% ধারণ করে) বিপুল জন-অভিবাসন ও পুর্নবাসন ঘটায় (Pye, 1975)। চীনের বৃহত্তর জন গোষ্ঠির এই পরিকল্পিত পূর্ণস্থাপন ((Resettlement) বর্তমানে চীন থেকে তিব্বতের স্বাধীনতা বা আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে প্রায় সম্পুর্ণরূপে অসম্ভব বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে ((Tripura, 1992) বা পূনর্বাসিত করে । এর ফলে এক সময়ের জম্মুর মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসংখ্যা বর্তমানে একটি সংখ্যালঘু জনসংখ্যায় পরিণত হয়েছে (Shahabuddin, 1989) বাংলাদেশের সাবেক দুইজন রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান ঐ একই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে এবং বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌম অংশ জনবিরল পার্বত্য-চট্টগ্রামে জনভারাক্রান্ত জিলাসমূহ থেকে বিপুল সমতলবাসী লোকের পূনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত আন্তরিক হলেও অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি রাষ্ট্র বিশেষ করে ইহুদী অর্থপুষ্ট কিছু তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থা বিশ্বব্যাপী প্রচুর হৈ-চৈ শুরু করে দেয় এবং তাদের এই অবৈধ হস্তক্ষেপ এখনো বলবৎ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডেন মার্ক ভত্তিকি "International work Group for Indigenous Affairs" ঠিক তেমনি এক বর্ণবাদী এবং ইহুদী অর্থপুষ্ট সংস্থা যা অত্যন্ত নগ্নভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যায় নাকগলিয়ে উদ্দেশ্য-মূলক ও কল্পিত বানোয়াট মানবাধিকার লংঘনের রিপোর্ট তৈরী করে। ধারণা করা হয় যে, এদের প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী এই সব রিপোর্টের পেছনে হয়তো উচ্চাভিলাসী ভারত-ইসরাঈল আতাঁতের গোপন সম্পর্ক রয়েছে (Mey, 1984)। বাংলাদেশের নিজ রাষ্টীয় সার্বভৌম অঞ্চলের অখন্ডতা রক্ষার যুক্তিসঙ্গত উদ্যোগের প্রখর সমালোচনা করলেও এসব সংস্থা এবং সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো প্যালেস্টাইন, বসনিয়া কিংবা কাশ্মীরের মুসলিম জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নো, এমনকি ঐসব অঞ্চলে অমুসলিম দখলদার শক্তির চরম অত্যাচার ও মানবাধিকারের চরম অমর্যাদায় ও সম্পূর্ণ নীরব। এদের তৎপরতার এই বৈষম্য থেকেই তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তির এসব সংস্থাসমূহ পুরোপুরি অবহিত আছে যে, তাদের পূর্বপুরুষরাই

অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা নিউজিল্যান্ড এবং বিশ্বের আরো অনেক জায়গায় মূল আদিবাসী (Aboriginal People)দেরকে চরম নৃশংসভাবে হত্যা করে কিংবা ধ্বংস করে দিয়ে নিজেরা ঐসব মহাদেশেও অঞ্চলের নিয়ন্তা হিসেবে জেঁকে বসেছে। আর ঐসব স্থানের মূল বাসিন্দারা "নিজগ্রহে পরবাসী"র মত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দূর্গমও অনুর্বর অঞ্চলে জবর দখলকারীদের দ্বারা বরাদ্দকৃত "রিজর্ভ" বা সংরক্ষিত উপজাতীয় অঞ্চলে চরম দারিদ্র ও হতাশার মধ্যে এখনো ধুকে ধুকে মরছে।

বাংলাদেশের অপামর জনসাধারণ মনে করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এখানে বসবাসরত নতুন এবং পুরাতন সকল অধিবাসীই বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রশ্নে সারা জাতি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এখানে বসবাসরত সকল জাতিসত্ত্বাও জনগোষ্ঠির লোকদের সকল বৈধ এবং ন্যায্য দাবী দাওয়া অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ষাটের দশকে কর্ণফূলী জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সময় কাপ্তাই ওদের গ্রামে স্থানীয় উপজাতীয় বা অ-উপজাতিয় জনগোষ্ঠির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ যথাসম্ভব এখনো পূরণ করে দিতে হবে। সাথে সাথে স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর সামাজিক সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাদের সার্বিক বিকাশ ওসমৃদ্ধির জন্য উদার ও মানবিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্যই চলতে দেয়া যাবে না এবং যে কোন তরফ থেকে এ ধরনের যে কোন অযৌক্তিক দাবী কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। পার্বত্যচট্টগ্রাম এবং অন্যান্য যে কোন স্থানে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের উপজাতীয় কিংবা অ-উপজাতীর সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতাকে দুর্বল করে এমন যে কোন তৎপরতা বা বহিঃশক্তির যে কোন অবৈধ চাপ বলিষ্ঠভাবে মোকবেলা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে। দেশের একদশমাংশ অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আক্রমণকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতাকে "সামাজিক অসন্তোষ" বলে তাকে নিতান্ত হালকা করে দেখে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করারই সকল উদ্যোগই সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত বাস্তব কারণে একান্ত পলায়নবাদী ও আত্মঘাতী পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোন সার্বভৌম এলাকার প্রকৃত মালিক সারা জাতি কোন একক গোষ্ঠি বা কোন বর্ণ-ধর্মের প্রকার হতে পারে না। দেশের বারোকাটি মানুষ দেশের যে কোন অংশের যে কোন ধরনের অঙ্গহানির কারণকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তথ্যপঞ্জি

Administrative Map of Bangladesh, 1992 , Graphosman, Dhaka.

Ahmed, N 1958, "The Evolution of Bourdanes of East Pakistan," Oriental Geopgrapher, vol ii No. - 4, Dhaka.

Ahmed, R 1990, :Krantikale Parbatta Chattagoamer Janagoshthhi; Ekti Paryalochans; Journal of Anthropology (in Bengali), Jahangir Nagar University, Dhaka, PP. 58-75.

Alam, S.M. and Akhtar, R. 1990, "Problem of Ethnic Identity and national Integration: A Case study from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh" The Jahangir Nagar Review, Vol XIII and XIV Par-2, Dhaka.

Amin, M.N. 1988/89 "Secessionist Movement in the Chittagong Hill Tacts," Regional Studeies, Vol VII, No.1 Islambad

Bernot, L. 1960, "Ethnic Groups of Chittagong Hill Tracts, In Pierre Bessaignet (cd) social Research in East Pakistan, Asiatic Society of Pakistan, Publication No- 5 Dhaka.

Bindra, S.S. 1982, "Indo-bangladesh Relations, Deep and Deep Publications, New Delli.

Brawer, M(ed) 1988, "Atlas of the Middle East, Mac- Millan Publishing Company, New York.

Burman, D.C. 1983 Regionalism in Bangladesh : The Study of Chittagong Hill Tracts," Regionalism in South Asia (ed by Rama Kant Asia Studies Centrc, Alekh Publishers, Jaipur, PP. 116-137.

Chatterjee, S.P. 1947 the Partition of Bengal A Monograph, Calcutta Geopgraphical Society Publication, No. 8 Calcutta University Calcutta.

Frankel, W. 1980. Israel Observed: An Anatomy of the state, London.

Grodo; D.C. 1980, Lebanon, he Fragmented Nation, London,

G.O.B 1974, Chittagong Hill Teacts District Gazetteer Government of Bangladesh, Dhaka.

G.O.B 1986 Constitution of the peoples Republic of Bangladesh Ministry of laq and Justice, Dhaka.

Hossain, A, 1989, Geopolitics and Bangladesh Foreign Policy "C.L.I.O Journal, Dhaka.

Hossain, S.A. 1990, "Shanti-Ashantir Dolachole Parbattya Chattagram," Weekly Bichitra, Vol- 26 '90 Dhaka.

Hossain, S.A. 1991, "Rligion and Ethnicity in Bangladesh Politics" The B.I.I.S S Journal Vol XII, No- 4 Dhaka.

Hutchinson, R.H.S. 1906, An Account of Chittagong Hill Tracts Calcutta.

Jaffa, J. 1989, "Chakmas : Victims of Colonialism and Ethno-Centric Nationalism," The Mainstream (Oct, 28, 1989), New Delhi, P. 107.

Hohnson, B.L.C. and Ahmed, N. 1957, "The Karnafuli Project: Geopgraphical Record," Oriental Geographer, Vol-I No. 1 (July) Dhaka.

Karan, P.P. 1953, "Indo-Pakistan Boundaries," The Indian Geopgraphicl Journal, Vol, 4, No 1.

Khan, F.K and Khisha, Al, 1970, "Shifting Cultivation in East Pakistan," Orental Geographer Vol. 14, Dhaka, P.P. 22-44

Khisha, Al 1966 "Shifting Cultivation in Chittagong Hill Tracts, (Un-Published M.A. Thesis) Department of Geopgraphy, Dhaka, University.

Kdikara, S. 1979, "Strategic Factors in Interstate Relations in South Aisa," Canberra, Papers on strategy and Defence, No. 19, Canberra.

Karksides, K.C. 1977, The Rise and Fall of the Cyprus Republic, London.

Mey, W.(ed), 1984, "Ginocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh," Document No. 51, International work Group of Indigenous Affairs-Copenhagen.

Montu, K. 1981, "Tribal Insergency in cluttagong Hill Tracts," Economicand political weekly.

P.R.P.C (B.B.S) 1991 Preliminary report of polulation Census of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistices, Dhaka.

Pye, L.W. 1975, "China: Ethnic Minorities and National Security," in N. Glazerand D.P. Moynihon (ed) Ethnicity: Theory and Experience Horvard University Press. Combridge

Raman. M. 1976, "Geographical Analysis of Bangladesh Boundaries B.N.G.A. Journal Vol-VI No. 1 J.N.U, Dhaka, PP. 31-51

Rahman, M. 1990, "The Problems behind the National Consensus "(in Banglali), B.I.I.SS Paers-12 Bangladesh Institute of International and Strategic studies, Dhaka, P. 39

Risley. H.H. 1891, The Tribes and castes of Gengal (Vol. 1), Calcutta P. 118.

Rob, M.A. 1989, "Changing Role of the shifting cultivation in chittagong Hill Tracts of Bangldesh, Abstracts of the Papers, International Seminar on the Role of Agriculture in the Economic Development of Thirld world Countries, A.M.U.G.S. Aligarh (2-7 sept, 1989), India

Rob, M.A. 1991, "Resource Potentials and Geopgrlitical Significance of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh," Seminar Papae Presented at A.M.U.G.S. (Sept, 1991) Aligarh, India

Roy, D. 1992, "The Jenural Problems of the Chittagong Hill Tracts" (in Bengali), The Daily Sangbad (15th July 1992), Dhaka.

Shahabuddin, S, 1989, "Repressin on the Muslims of Kashmir: An untold story," Muslim India Vol XXII New Delhi.

Shelley, M.R(ed) 1992, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untorld story, Centre for Develpment Research, Dhaka.

Subrahmanyam, K. 1983, "Indias Securities in Eighties," Strategic Analysis, Vol No. 6 (sept, 1983)

Sukhwal, B.L. 1971, India: A Political Geography, Allied Publishers, Bombay, PP. 219-223.

Susha. B.B. 1977, "Indo-Bangladesh Maritime Boundari Issue," Stategic Analysis.

Tyeb, A 1966, "Pakistan : A Political Geopgraphy The Oxford University Press, London.

Tripura, P. 1992, "The Colonies strike Back: Tribal Ethnicity and Modern state_Building in South Asia," Paper Presented at the National Seminar on Bangladesh and SAARC Issues, Perspectives and Outlooks, B.I.IS.S and I.R. department, D.U. (23-24 August, 1984), Dhaka.

The Daily Sangram, 1993, "Prospect of Mineral Resouces in Chittagong Hill Tacts" (In Bengali) Newspaper Report published on 24 the oct. 1993, Dhaka, PP. 3-4.

Vung, S.G. 1968, "Frontier of Freedom," Far-Eastern Economic Review, Vol. XLI No. 33 (August 15) P. 318.

Wadia, D.N. 1953, Geology of India, Mc. Millan and Company, London.

পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

পার্বত্য চট্টগ্রাম
ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

প্রথম প্রকাশ ঃ ০১ জানুয়ারী ১৯৯৭

প্রকাশক ঃ লেখকদ্বয়

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

গ্রাফিকস্ ঃ ডট প্লাস

মুদ্রণ ঃ চৌকস
১৩১, ডি.আই.টি. এক্সটেনশন রোড
(৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

CHITTAGONG HILL TRACTS: GEOPOLITICS AND ENDANGERED SOVEREIGNTY, by Dr. Hasanuzzaman choudhury and Dr. Mohammad Abdur Rob. First Published : 01 January 1998. Puhlished by : Authors. Copyright : Authors. Cover : Arifur Rahman. Graphics : Dot Plus. Printing : Chowkash, 131, DIT Extension Road (3rd floor), Dhaka-1000. Price : Taka 100 (One Hundred) only.

উৎসর্গ

সেই সব দেশপ্রেমিক সৎ মানুষকে,

যারা দেশকে অন্যের হাতে তুলে দেয় না

এবং

যারা দেশরক্ষার নামে বাস্তবে নিষ্ক্রিয় থেকে

জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে না

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ চাকমা প্রতারণা, লুক্কায়িত স্বার্থ এবং প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

প্রকৃত সত্য

সুদূর অতীত থেকেই সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে যুগে চট্টগ্রাম ছিল বাংলার হরিকল জনপদ নিয়ে গঠিত। এটি ছিল বরাবর বাংলাদেশের কন্টিগিউআস টেরিটোরি এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে এর সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ গঠন ও অবয়ব প্রদানকারী অঞ্চল। রেকর্ডেড ইতিহাস এই যে, মাত্র ১৮৬০ সালের ২৬ জুনের 'নোটিফিকেশন নাম্বার ৩৩০২' এর ভিত্তিতে এবং একই সালের ০১ অগাস্টের 'রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার এ্যাক্ট ২২ অফ ১৮৬০' অনুসারে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী তাগিদে চট্টগ্রামের পাহাড় প্রধান অঞ্চলকে স্বতন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় রূপ দেওয়া হয়। এরপর ১৯০০ সালের ০১ মে, 'নোটিফিকেশন ১২৩ পি.ডি.' হীল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশন জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বিচ্ছিন্ন এলাকা' (excluded area)-য় পরিণত করে অযৌক্তিকভাবে সেখানে এ দেশের মূল জনগণ তথা বাংলাভাষী বা বাঙালীর অবাধ গমনাগমন ও বসতি স্থাপনকে বিঘ্নিত করে ভূমিজ সন্তান (সান অব দি সয়েল) নয় এমন বহিরাগত ও বিদেশী এবং এদেশে অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) আরাকানী, লুসাই, টিপুরা উপজাতিদের ঠাঁই করে দেওয়া হয় (S. Mahmood Ali, "The Fearful State : Power People and Internal War in South Asia", London and New Jersy : ZED Books, 1993)। ১৯৮৯ সালে এ প্রক্রিয়ায় আরো মারাত্মক ইন্ধন যোগানো হয় (৫ম খণ্ড–বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি, বাংলাদেশ গেজেট, মার্চ ২, ১৯৮৯)। অথচ আজ চাকমারা বহিরাগত হয়েও সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে নিজেদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র এবং বাস্তবে যারা এ দেশবাসী সেই বাঙালীদেরকে বহিরাগত বলে ভারতীয় প্রভাবে এবং তাঁবেদার সরকারের নোংরা সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করে "জুম্মল্যান্ড" প্রতিষ্ঠার দাবী উঠিয়েছে। এই 'জুম' শব্দটি চাকমাদের ভাষার নয়, এটি কোলদের শব্দ। এছাড়া জুম চাষ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০%-এরও কম। আবার চাকমারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের

অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম তথা কেবল দশমিক বাইশ শতাংশ। তারা আরো ১২টি উপজাতির নাম ভাঙ্গিয়ে বাস্তবে তাদেরকে প্রতারিত করে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক-দশমাংশ ভূখণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামটি পর্যন্ত চিরতরে মুছে দিয়ে "জুম্মল্যান্ড" এবং প্রকৃত প্রস্তাবে "চাকমাল্যান্ড" কায়েম করতে চায় দেশীয় ষড়যন্ত্রী ও প্রতিবেশী প্রভু রাষ্ট্রের সহায়তায়।

যাহোক, এদিকে ইতিহাস বলে, এই বাংলাদেশে ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ এর পলাশীর যুদ্ধ — এই সুবৃহৎ কালে মুসলিম শাসন চালু ছিল ইংরেজ আগমনের পূর্বে। এ উপমহাদেশে এবং এক সময়ে বাংলাদেশেও মুঘল শাসন কায়েম হয় ১৫২৬ সালে ভারতে এর প্রতিষ্ঠার পর। মুঘল শাসন কায়েমের দেড় শতাব্দী কাল পরে চাকমারা আসে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং তৎকালের চট্টগ্রামে। মুসলমান সম্রাটদের অধীনে বাংলাদেশের সুলতান, নবাব, সুবেদার দ্বারা শাসনকৃত রাজ্যে অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক জমিদাররা পূর্বোক্ত উভয় পক্ষের নিকট পুরো অনুগত থেকেই জমিদারী চালাতেন, তা ক্ষেত্রবিশেষে তারা রাজা উপাধি পেলেও।

১৩৪০ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রামের বিরাটাংশ দখল করেন। ১৫৪২ সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এ অঞ্চল দখল করেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের স্থানীয় শাসক ছিলেন খোদা বখশ খান। তার শাসনাধীন ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রাম। এভাবে আরাকানের মুসলিম প্রভাবে এবং মুসলিম শাসনের অধীনে থাকতে থাকতে এক সময়ে এখানে ঠাঁই নেওয়া চাকমা রাজারা মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ইসলামী পরিভাষা, আরবী-ফারসী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং অনেকের মতে, মুসলমান হয়ে যান। আরাকানে থাকা অবস্থাতেই এদের অনেকে মুসলমান ছিলেন। ইতিহাস থেকে দেখা যায় ১৭৩৭ সালে শের মস্ত খাঁ, ১৭৪০ সালে সোনা খাঁ, ১৭৪৯ সালে শের জব্বার খান, ১৭৬৩/৬৫ সালে নূরুল্লা খান, ১৭৭১ সালে ফতেহ খান, ১৭৭৬ সালে শের দৌলত খান, ১৭৮৩ সালে জান বখশ খান, ১৮০০ সালে তব্বার খান, ১৮০১ সালে জব্বার খান, ১৮১২ সালে ধরম বখশ খান — এরা ছিলেন এতদঞ্চলের চাকমা রাজা। ১৮৭২ সালে হিন্দু গোপীনাথের পুত্র হরিশচন্দ্র রাজা হবার পর থেকেই চাকমা সর্দার মহলে মুসলমানী নাম ও খিতাব ধারণ ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এই শেষোক্ত রাজার সময়ও রাজমাতা নিজে ধরম বখশ খাঁর কন্যা হিসেবে সমগ্র জীবনকাল চিকন বিবি নামে পরিচিত ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, চাকমা রাজদরবারে মোগলাই পোশাক ও নিয়ম-কানুন চালু ছিল। কুর্নিশ, নজর, নিয়াজ চালু ছিল। রাজারা মৌলভী দিয়ে পাগড়ী পরতেন। রাজাদেরকে হুজুর এবং রাণীদেরকে রাণী সাহেবা ডাকা হতো। রাণী বা রাজমাতাদের বিবিও বলা হতো। চাকমা রাজ দরবারে সালাম, খোদা, খানা, ওয়াক্ত, তালাক, কুটুম — এসব শব্দের প্রচলন ছিল। এখনও চাকমাদের মধ্যে অনেক মুসলিম শব্দ, আরবী-ফারসী শব্দ চালু আছে।

ঐতিহাসিক প্রফেসর ডঃ আলমগীর এম. সিরাজুদ্দিন তার "Origin of the Raja's of the Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে (প্রকাশিতঃ Journal of the Pakistan Historical Society, Karachi : Vol. xix, Part 1, January

1971) দেখিয়েছেন, রাঙামাটির চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত প্রত্ন নিদর্শনে চাকমা রাজা শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীল (রাবার স্ট্যাম্প) সংরক্ষিত আছে, যাতে লেখা রয়েছে –"রোসাং, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি ১১১১ শের জব্বার খান"। এ থেকে খুবই স্পষ্ট যে, শের জব্বার খাঁর সময়ে চাকমাগণ আরাকানের রোসাং অঞ্চলে বাস করতো। শের জব্বার খাঁর সর্দারীর সময়কাল উল্লিখিত সীল মোতাবেক ১১১১ মঘী অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীস্ট সালে আরম্ভ হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৬৫ সালে তার মৃত্যু হয় এবং সে সময় থেকে চট্টগ্রামের এতদঞ্চলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয়। সতীশ চন্দ্র ঘোষের "চাকমা জাতির ইতিহাস" গ্রন্থে এবং সতীশ ঘোষের শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ানের "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে, বিরাজ দেওয়ানের "পাকিস্তানের উপজাতি" গ্রন্থে এসব তথ্যের স্বীকৃতি আছে। আরো দেখুন — সি.আর. চাকমা, "যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি মধ্যযুগ"।

উপরের তথ্যাদি থেকে এটি খুবই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, চাকমারা বাংলাদেশের ভূমিপুত্র নয়। তারা রোসাং, আরাকান বা উপমহাদেশের অন্য কোনো অঞ্চল বা আরো দূরের কোনো স্থান থেকে এসেছে। তারা নিঃসন্দেহে বহিরাগত।

পক্ষভুক্ত ইতিহাসবিদরা যা বলেন

সতীশ ঘোষ চাকমাদের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ভুরি ভুরি মিথ্যার আশ্রয় নিলেও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, চাকমাদের আদি নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় ; তারা বাইরে থেকে এসেছে। বাস্তবেও তাই (Bangladesh District Gazetteers, Chittagong Hill Tract, pp. 33-34)। সতীশ ঘোষের শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" (রাঙামাটি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৬৯) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ; "চাকমাদের পূর্ব পুরুষরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান নহে তাহা .... স্পষ্ট" (পৃঃ ৯৪)। সাংবাদিক জয়নুল আবেদীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরূপ সন্ধানে" (ঢাকা ঃ ১৯৯৭) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

কোনো কোনো চাকমা ইতিহাসবিদ নিজেদের আদি দেশ হিসেবে চম্পাপুরী কিংবা চম্পকনগর নামে যে রাজ্যের বর্ণনা তাদের লেখায় প্রদান করেন, সেটিও প্রমাণবিহীন বা বাস্তববর্জিত। কেননা ভারতে ও এর বাইরে অন্ততঃ পাঁচটি স্থানের নাম চম্পাপুরী বা চম্পকনগর। এগুলি হচ্ছে — উত্তর বার্মা তথা শান, প্রাচীন মগধ তথা আজকের বিহার, কালাবাঘা তথা আজকের আসাম, প্রাচীন মালাক্কা তথা আজকের মালয়, কৌচিন ও হিমালয়ের নিচে সাংগুপু নদীর তীর অর্থাৎ আজকের দিনের ব্রহ্মপুত্র তীর। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেও চাকমাদের আদি অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আসলে চম্পক, চম্পা– এসব শব্দের সঙ্গে চাকমা শব্দের খানিকটা মিল থাকায় চাকমারা কল্পনা মিশিয়ে আবিষ্কার করতে চান যে চম্পক বা চম্পানগর তাদের আদি বাসস্থান। "বর্তমান ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহু চম্পাপুরী বা চম্পকনগরের নাম পাওয়া যায়। এই জন্য এই নামটি নিয়ে বিভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক"। বলেছেন অশোক কুমার দেওয়ান ("চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার", খাগড়াছড়ি, ১৯৯১, পৃঃ ৩৫)।

চাকমারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের আদি উৎপত্তি কোথায়, এ জাতির যথার্থ পরিচয় কি — এসব ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। এছাড়া চাকমা জাতির কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। এ জাতির প্রকৃত নামটি পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছে। বিরাজ দেওয়ান তার গ্রন্থে এ সত্য মেনে নিয়েছেন। সুগত চাকমা নামে আরেক লেখক চাকমাদের আদি বাসস্থান নিয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন যে, "চাকমাদের বিশ্বাস সুদূর অতীতে তারা চম্পকনগর নামক একটি রাজ্যে বাস করত" ("পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি" রাঙামাটি, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭)) এদিকে সি.আর. চাকমা নামক আর একজন লেখক জানিয়েছেন যে, চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতক নাগাদ চাকমারা বার্মায় মার খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে প্রবেশ করে ("যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি মধ্য যুগ" হাওড়া ঃ লিলুয়া ১৯৮৮, পৃঃ ৬৭)।

বস্তুতঃ চাকমাদের প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না (দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া রায় চৌধুরী, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম", কলকাতা ঃ ১৯৯৬, পৃঃ ১১। তাদের সম্পর্কে গাল-গল্পই লভ্য হয়। বিরাজ দেওয়ান দেখিয়েছেন, চাকমা ভাষা আজকে বাংলা ও সংস্কৃতের মিশ্রণে চাকমা-বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে এ ভাষার শব্দ বাংলা-সংস্কৃতের মিশ্রণ। এটি বস্তুতঃ বাংলার অপভ্রংশ। বিরাজের মতে, "কালের স্রোতে চাকমা ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে"।

চাক ও চাকমারাও যে এক নয় এবং চাকদের ইতিহাসটুকু আত্মসাৎ করার জন্যই যে কোনো কোনো চাকমা ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, সে সত্যও বেরিয়ে এসেছে বিরাজ মোহন দেওয়ান, অশোক কুমার দেওয়ান, বঙ্কিমচন্দ্র দেওয়ান, দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া রায় চৌধুরী প্রমুখের লেখা থেকে। অশোক দেওয়ান জানিয়েছেন যে, সতীশ ঘোষদের প্রদত্ত চাকমা জাতির পনর শত বছরের ইতিহাস প্রকাণ্ড মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিভ্রম ও আজগুবী কাহিনীতে ভরা খিচুড়ী (অশোক দেওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৭৬)। অশোক দেওয়ান মিথ্যা ইতিহাস পরিত্যাগ করে সত্য ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

চাকমা লোকগাঁথা কি বলে

(১) চাকমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত দু'টি পঙক্তি হচ্ছে ঃ

"আদি রাজা শের মস্ত খাঁ, রোয়াং ছিল বাড়ী
তারপর শুকদেব রাজায় বান্ধে জমিদারী"।

এ থেকে মনে হয়, চাকমাদের আদি বাস ছিল উত্তর আরাকানের রোসাং-এ (Roang/Rohang/Roshang)।

(২) চাকমাদের অতি পরিচিত লোকগীতি হচ্ছে ঃ

"ঘরত গেলে মগে খায়
ঝারত গেলে বাঘে খায়
বাঘে ন খেলে মগে খায়
মগে ন খেলে বাঘে খায়"।

এই লোকগীতি থেকে মনে হয়, চাকমারা আরাকানের মগদের কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাংলার চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে অর্থাৎ আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় নেয়।

ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ আবদুল করিমও এরকম মত পোষণ করেছেন যে, প্রাচীন মানচিত্রে পর্তুগীজ জোয়ান ডি ব্যারোজ চাকোমাস নামের এক অঞ্চল নির্দেশ করেছেন যা রাইংক্ষ্যং এবং সুবলং উপ-নদীদ্বয়ের উৎস অঞ্চলের পূর্বদিকে চীন পাহাড় এলাকায় অবস্থিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর আরাকানে চাকমাদের আদি বাসভূমি ছিল (Dr. Abdul Karim, "The Map of Joan de Barros, Dated about 1550 AD., Journal of Asiatic Society of Pakistan, 1963, Vol. VIII, No. 2)।

লিউইন, হাচিনসন, উইলসন্স,পার্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক টি.এইচ. লিউইনকে এ অঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়ে অথরিটি বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন, "উপজাতীয়দের মধ্যে যারা আজকের দিনে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করছে, তাদের অধিকাংশ প্রায় দু' পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত, যেসব কিছু চট্টগ্রামের কালেক্টরেটের রেকর্ডে রয়েছে (T.H. Lewin, "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein", pp. 28-29)।

টি.এইচ. লিউইন আরো জানান, তৎকালীন বার্মার (মায়ানমার) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে ইংরেজদের যোগাযোগের সবচেয়ে পুরনো দলিল হচ্ছে দু'টি পত্র। এর একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অন্যটি আরাকানের রাজা কর্তৃক ইংরেজ অধিকৃত চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত। সম্ভবতঃ ২৪ জুন ১৭৮৭ সাল এই তারিখে পাওয়া গেছে। লিউইন তার গ্রন্থে চিঠি দু'টি তুলে ধরেছেন (Lewin, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯)।

হাচিনসন জানিয়েছেন, "এই উপজাতীয় মানুষেরা নিজেদেরকে দেশত্যাগী সেসব বিহারবাসীর বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখণ্ডে আরাকানী রাজাগণের শাসনকালে বসতি তৈরি করেছে" (Hutchinson, "An Account of Chittagong Hill Tracts", Calcutta, 1906, p. 89)।

উইলসন জানিয়েছেন যে, চাকমারা আরাকান অঞ্চল থেকে পালিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে (Wilsons, Narrative of the Burmesewar, p.25)।

বি.আর. পার্ন-ও জানিয়েছেন যে, আরাকানের আক্রমণ ও লুটপাটের কালে সেখানকার রাজার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এ দেশে চলে আসে চাকমারা (Journal of Burma Research Society The King Bering page 44/48, Dt. 23/11/1933)।

উপরের আলোচনা থেকে এটি পুরোপুরি প্রমাণিত যে, চাকমারা অন্য দেশ থেকে এখানে এসেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী নয়, ভূমিপুত্র তো নয়ই।

অন্যান্য উপজাতিও বহিরাগত

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় উপজাতি মারমারা মায়ানমার থেকে আরাকান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে। মারমা শব্দটি 'ম্রাইমা', 'মায়ানমার' এদের কাছাকাছি। আর.এইচ.এস. হাচিনসন জানিয়েছেন, মারমা রাজা ১৭৫৬ সালে মুঘলদের দ্বারা মূল বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে আরাকানে এবং সেখান থেকে প্রথমে তৎকালীন রামুতে, ঈদগড়ে, এরপর মাতামুহুরী এলাকায় এবং অবশেষে আজকের বান্দরবান শহরে আশ্রয় নেন (হাচিনসন, প্রাগুক্ত)। সুগত চাকমাও তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে এই তথ্য দিয়েছেন। ম্রো শব্দ থেকে উদ্ভূত মুরং। এরাও উত্তর বার্মা থেকে ১৮ শতকের শেষের দিকে চট্টগ্রামে আগমন করে। এরা পূর্বে বার্মার আরাকান রাজ্যে বাস করতো। এখন এরা থাকে বান্দরবানে (আবদুল হাফিজ, "পাকিস্তানের উপজাতি", ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৫। সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭। M.R. Shelley, The Chittagong Hill Tract of Bangladesh : The Untold Story, Dhaka : Centre for Development Research, 1992, p. 83)। ত্রিপুরা উপজাতি যারা মূলতঃ পার্বত্য খাগড়াছড়িতে থাকে, তারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগমন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে (সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)। লুসাইরা যারা মূলতঃ রাঙামাটির সাজেক এলাকায় বাস করে, তারা ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড় অঞ্চল থেকে এ দেশে আসে দেড়শ' বছর পূর্বে (Shelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭)। খুমীরা ১৭ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার আগে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকানের অধিবাসী ছিল (T. H. Lewin, প্রাগুক্ত এবং Shelley, পৃঃ ৫৮)। বোমরা ১৮৩৮ সালের দিকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয় এবং এখন থাকে বান্দরবান জেলার রুমা এলাকায়। আঠারো শতকের খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষিয়াংরা আরাকানের উমাতানং পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। এখন তারা থাকে পার্বত্য রাঙামাটির কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা অঞ্চলে (Shelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২)। চাকরা সম্ভবতঃ মায়ানমারের সীমানায় চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে আরাকান হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছিল। এটি নিশ্চিত, তারা আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে (সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪)। পাংখোরা ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড় এলাকা থেকে এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে (Shelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪)। তনচইঙ্গারাও বাইরে থেকে এ দেশে এসেছে। তারা চাকমাদের উপশাখা হলেও এখন স্বতন্ত্র পরিচয় দেয়।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নরাজি ও উপলব্ধি

(১) উপরের আলোচনা থেকে এটি একেবারে স্পষ্ট যে, চাকমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো উপজাতিই এ দেশের ভূমিপুত্র নয়, আদিবাসী নয়। তারা বহিরাগত, অভিবাসী। কিন্তু এর পরও তারা বাঙালীদের, এ দেশের মূল অধিবাসীদের কিভাবে বহিরাগত বলে অত্যাচার, নিপীড়ন, সন্ত্রাস ও হত্যার শিকার করে তুলছে? কিভাবে তারা বাঙালীকে বহিষ্কার করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে? কিভাবে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে শত শত বাঙালী পরিবারকে উৎখাত হতে হয়েছে এবং ছাড়তে হয়েছে তাদের জমি, বাগান,

ব্যবসা ও অন্যান্য বিষয়াদি? কিভাবে বাঙালী সরিয়ে পুনর্বাসিত হয়েছে চাকমারা? এত কিছুর পরও কেন চাকমারা সন্তুষ্ট নয় (লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং চাকমাদের সঙ্গে আলাপ দ্রষ্টব্য। ২৯ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর ১৯৯৭)। খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউসে শান্তিবাহিনীর সদস্য মেজর জয়েস চাকমা, শান্তিবাহিনী ও পিসিজেএসএস-এর অঙ্গ সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সন্ত্রাসী নেতা প্রসিত খীসার পিতা অনন্ত বিহারী খীসার সঙ্গে আলাপ করেছেন লেখক। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানার বড় মেরুং মৌজার লক্ষ্মীপুর পাড়ায় প্রবীণ চাকমা, কমল জ্যোতি চাকমা, চিত্তরঞ্জন চাকমা, নীলমণি চাকমা, সদানন্দ চাকমা, উত্তম চাকমা, রমণী কুমার চাকমা, জয়ন্ত চাকমা, লিটন চাকমা, চন্দ্রশেখর চাকমা, প্রতিময় খীসা প্রমুখের সঙ্গে আলাপ করেছেন বর্তমান লেখক।

লেখকের ধারণা তৈরি হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আলাপ ও মতামত গ্রহণ থেকে। এছাড়া বর্তমান লেখকের আরো —জিজ্ঞাসা — পার্বত্য রাঙামাটির ঘাঘরা জোনের নাভাঙ্গা আর্মী ক্যাম্পের কাছে কুকী পাহাড়ের (কালা পাহাড়) নিকটে ০১/১০/৯৭ তারিখে লেখকের সঙ্গে আলাপরত রাণীহাট কলেজের ছাত্র আশীষ চাকমা, তুহিন চাকমা, নয়ন তালুকদার, পিন্টু চাকমা, বিধু বিকাশ চাকমার আসল পরিচয় কি? তারা কি চায়? বিভূতিভূষণ চাকমার মনের কথাই বা কি?

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে– কিভাবে চাকমারা বিশেষতঃ শান্তিবাহিনী, জনসংহতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), হীল ওমেন এসোসিয়েশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদেরকে নিজ দেশে পরবাসী করে তুলছে? কেন একের পর এক সরকার বিশেষতঃ ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে, বিন্দু বিসর্গ না জেনে, আগ-পিছ না ভেবে অতি মুষ্টিমেয় চাকমা উপজাতি সন্ত্রাসী ও তাদের সংগঠন শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির কথায় নাচছে, উঠছে-বসছে? কেন আওয়ামী লীগ সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়েও স্বীয় নীতির সঙ্গে পরস্পরবিরোধিতা করে অতি সামান্যসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমার কাছে মাথানত করে বাঙালীদের উপর পীড়ন, বহিষ্কার ও হত্যাকাণ্ড চালাতে দিচ্ছে? কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যেখানে খাগড়াছড়ির মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং ২২ বছর (১৯৭১–১৯৯২) ধরে আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবও নিজেরসহ বাঙালীদের অধিকার, ভূমিকা, ক্ষমতার বিষয়ে হতাশ এবং সেখানে বাঙালীদের ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ে আছেন? কেন প্রাক্তন পৌর চেয়ারম্যান আবুল কাসেম সাহেব উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্যে রয়েছেন? (লেখকের সঙ্গে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে — সরকার এর পরও শান্তিবাহিনীকে এত ছাড় দিচ্ছে কি করে এবং কিভাবে তাদেরকে জামাই-আদর করা হচ্ছে? এর পেছনে বর্তমান সরকারের অজ্ঞতা, জিদ, অপরিণামদর্শিতার সাথে সাথে ভারত-ভীতি, ভারত-প্রীতি এবং স্বীয় ক্ষমতা সংরক্ষণের সংকীর্ণ স্বার্থ-যোগ আছে কি? কেন একতরফা শান্তিবাহিনীর সঙ্গেই কেবল আলোচনা? ওখানকার বাঙালীরা কেন আলোচনায় নেই? কেন সামরিক বাহিনীর কোনো প্রতিনিধিত্ব বা বক্তব্য নেই? কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী বিষয়ক সেনা

সদস্য বিশেষজ্ঞকে আলোচনায় রাখা হয়নি এবং আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন এ ব্যাপারে একেবারেই নভিস একজন রাজনীতিক?

প্রশ্ন হচ্ছে — কেন ভারতীয় আধিপত্যবাদের দালাল ধান্দাবাজ মুষ্টিমেয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মনগড়া ও মিথ্যা প্ররোচনায় সরকার তাল দিচ্ছে? কি কারণে ১৯৯২ সালে শান্তি বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে তাদের কর্তৃক একতরফা যুদ্ধবিরতি (Unilateral Ceasefire) ঘোষণার পরও তৎকালীন সরকার বিষয়টির তাৎপর্য বোঝেনি? কেন ১০৯৫ বার যুদ্ধবিরতি লংঘন করার পরও (০৮/১১/৯৭ পর্যন্ত) আজ সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলে, রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে ভারতের আঞ্চলিক, ভূ-কৌশলগত, রণকৌশলগত, আর্থিক ও বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে? কেন পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? কেন চট্টগ্রামকে বিপদগ্রস্ত করা হচ্ছে? কেন চট্টগ্রাম বন্দরকে ও বঙ্গোপসাগরের আমাদের জলসীমাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের গেইটওয়ে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে বাংলাদেশকে বিধ্বস্ত করা হচ্ছে? কেন 'র' পারছে পার্বত্য বিষয়ে স্বীয় প্ল্যানকে কার্যকরী করতে? কেন বাংলাদেশকে ভূটানের ও নেপালের মত ল্যান্ডলকড্ করার ষড়যন্ত্রে পা দেওয়া হচ্ছে? কেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? (দ্রষ্টব্য — বর্তমান লেখক ও অপর একজন লেখকের গবেষণাদ্বয়ের সংক্ষিপ্তসার। দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রাম, নিউ নেশন, সাপ্তাহিক বিক্রম, অতন্ত্র জনতা বাংলাদেশ-এর পার্বত্য চট্টগাম বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ, স্বতন্ত্র প্রচারপত্র এবং ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম-এর উপসম্পাদকীয়তে লেখকদ্বয়ের গবেষণার সার-সংক্ষেপ ও রেফারেন্সসমূহ। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭)।

(২) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি উপজাতির জনসংখ্যার শতকরা হার এক ভাগও নয়। অর্ধেক ভাগও নয়। কেবল ০.৪৫ ভাগ। এর ভিতর ১২টি উপজাতি চাকমাদের সঙ্গে নেই। তাদের দু' একটির দু' চারজন শান্তি বাহিনীর সঙ্গে বাধ্যতা, ভীতি, লোভ, বিভ্রান্তির কারণে গেলেও বাকিরা বুঝতে পেরেছে যে, উপজাতীয়দের স্বার্থ, পাহাড়ীদের স্বার্থ ইত্যাদির কথা বলে চাকমারা এককভাবে নেতৃত্ব, সুবিধা, অর্থবিত্ত, আখের — সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছে, মাখন সব খেয়ে ফেলছে। স্বাধীন জুম্মল্যান্ডের দাবি তুলে বাস্তবে তারা চাকমাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দিকে এগুচ্ছে। এজন্য এবং চাকমা ও শান্তিবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ১২টি উপজাতির লোকেরা বাংলাদেশের অনুগত নাগরিক হিসেবে এ দেশে থেকে বাঙালীদের সঙ্গে সহাবস্থান করে, সমানাধিকার নিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে। অন্যান্য উপজাতির লোকেরা, বিশেষ করে ত্রিপুরা, পাংখো উপজাতির লোকেরা, নেতারা একথা বর্তমান গবেষক-লেখককে জানিয়েছে, পার্বত্য খাগড়াছড়িতে, পার্বত্য রাঙামাটিতে — মূল কেন্দ্রে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে (সেপ্টেম্বর ২৯ থেকে অক্টোবর ২, ১৯৯৭)। পাংখো উপজাতির নেতা লাল এ্যাংলিয়ানা এবং তার উপজাতির অন্য সদস্যরা এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছে। খাগড়াছড়িতে যতীন্দ্র ত্রিপুরার কাছ থেকে লেখক জেনেছেন তার মতামত। আলিক্ষ্যিয়াং, পাংখো পাড়া, বিলাইছড়িতে পাংখোদের সঙ্গে লেখকের দীর্ঘ সাক্ষাত ও আলাপ হয়েছে। বর্তমান গবেষক-লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে (০১/১০/৯৭ তারিখে) লাল এ্যাংলিয়ানা (শিক্ষক, প্রাক্তন উপজেলা

চেয়ারম্যান, পাংখো নেতা), ক্লু আনা (প্রাক্তন সদস্য, রাঙামাটি স্থানীয় পরিষদ), লাল ছোক লিয়ানা (জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক), আব্রাহাম পাংখোয়া (নিউ টেন শ্রেণীতে পড়ে), গামতার পাংখোয়া (নিউ টেন শ্রেণীতে পড়ে) – এদের। শেষ দু'জন বিলাইছড়ি হাই স্কুলের ছাত্র। গিলাছড়া পাহাড়ে লেখক গিয়েছেন, বিভিন্ন পাহাড়ে ওঠা-নামা করেছেন, উপজাতীয়দের বাড়ি-ঘর দেখেছেন, উপজাতীয় নারী-পুরুষের কাজ-কারবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাইংক্ষ্যং খালের পাড়ে হেঁটেছেন। পাংখো পাড়ায় লাল এ্যাংলিয়ানা লেখককে বলেছেন, তারা এ দেশের মানুষ হিসেবে সবার সঙ্গে থাকতে চান। তারা ভারতে যেতে চান না। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে চান না। শান্তিবাহিনীর হাত থেকে নিরাপত্তা চান, শিক্ষা চান, কাজ চান, হেরিংবন্ড রাস্তা চান কেননা গভীর দুর্গম পার্বত্য এলাকায় তাদের রাস্তাই নেই। তিনি জানান, চাকমারা উপজাতি উপজাতি করে নিজেরা ৭২% শিক্ষিত হয়ে গেছে, অথচ পাংখোদের মধ্যে এম.এ. পাস বা ডাক্তার নেই। তিনি বললেন, 'শান্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য তারা চাপ দিত, মার দিত, শাস্তি দিত। চাঁদা আদায় করত'। এ্যাংলিয়ানার মামা শান্তি বাহিনীর গুলীতে মারা গেছে। তাদের উপজাতিতে একজনও শান্তিবাহিনী নেই। তারা বাঙালীদের সঙ্গে সম সুযোগ নিয়ে বাঁচতে চান। তিনি বললেন, 'আমরা ভারতে যেতে চাই না। মরলে এখানে মরবো, বাঁচলে এখানেই বাঁচবো'। তিনি 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে শ্লোগানও দিলেন শ' দেড়েক মানুষের সামনে।

কাজেই এই যখন অবস্থা, তখন স্পষ্ট যে, শান্তি বাহিনী ও জনসংহতি মূলত চাকমা সন্ত্রাসীদের নিয়ে জুম্মল্যান্ডের নামে চাকমাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্যেই ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট হয়ে বর্ডারের ওপার থেকে তৎপরতা চালাচ্ছে।

উপরের পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ০.৪৫% জনগণের মধ্যে চাকমাদের অবস্থান পুরো দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ০.২২%। এখন এই ক্ষুদ্র লোকসমষ্টির অতি ক্ষুদ্র (মাত্র ছয়-সাত হাজার) সন্ত্রাসী চক্রের সংগঠন ক'টির তথা শান্তিবাহিনী, জন সংহতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ (পিজিপি), হীল ওমেন এসোসিয়েশন, গণ লাইন, পঞ্চায়েত – এগুলির কাছে কেন বাংলাদেশ সরকার নমনীয় হচ্ছে, মাথানত করছে? কেন সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে? কিভাবে শান্তি বাহিনী প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে? কিভাবে তারা চাঁদাবাজি করছে, কোর্ট বসাচ্ছে, শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে? কিভাবে তারা ট্যাক্স কালেক্ট করছে? কিভাবে করছে সন্ত্রাস? কিভাবে তারা নির্বিচারে লুটপাট, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার শিকার করছে বাঙালী মুসলমানদের?

আবার এই ০.২২% বা যদি আরো ১২টি উপজাতিসহ ০.৪৫% উপজাতি জনসংখ্যাও ধরি, তাহলে এই সামান্য বহিরাগতদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ মর্যাদা, বিশেষ কোটা, প্রতি বাঙালী মুসলমান অপেক্ষা প্রতি উপজাতীয় ব্যক্তি ২১ গুণ বেশি সুবিধা লাভ – সবকিছু দেবার পরও কেন তাদেরই দাবি অনুযায়ী দেশের এক দশমাংশ (৫০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩২৯৪.৭১ কিলোমিটার) তাদের জন্য এককভাবে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে রিজিওনাল কাউন্সিল, উপজাতীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে পার্বত্য শাসন,

ভূমির উপর অন্যায় দখলদারির ব্যবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী গমনে বাধা, পুলিশ নিয়োগসহ নানা উপঢৌকন দিয়ে? লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনবসতি এলাকাসমূহের ৭০ ভাগই এককভাবে উপজাতীয়দের দখলে। কেবল অবশিষ্ট ৩০ ভাগে বাঙালীর সাথে তাদের সহাবস্থান। তাও চাকমারা সহ্য করতে রাজি নয়, যদিও তারা নিজেরাই এ দেশে বহিরাগত। ওদিকে চাকমারা ৭২% সাক্ষর, বাঙালীরা ১০% থেকে ২০%। তাতেও চাকমা শান্তিবাহিনী (এস.বি.) সন্তুষ্ট নয়। নচেৎ কেন সেখানকার ৫০% বাঙালীর জীবন বিষিয়ে তোলা হচ্ছে? কেন তাদেরকে জমি, বাগান, দোকান, পুকুর, অন্যান্য ব্যবস্থা, শিল্প ও সম্পত্তি, মেহনতের ফসল, শ্রমের অধিকার — সব কিছু থেকে চ্যুত করে মানবেতর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তথা গুচ্ছগ্রামের ন্যূনতম রেশনের, নিয়ন্ত্রিত গতি-বিধির অনিশ্চিত জীবনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে? (রাঙামাটির ইসলামপুরের মানবেতর গ্রামে লেখক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন)।

বর্তমান গবেষক-লেখক শুনেছেন নিপীড়িত মুসলমান জনতার কাছে – কিভাবে শান্তিবাহিনী হত্যা করেছে তাদের বাচ্চাদের। কিভাবে চাঁদা আদায় করা হয়েছে ও হচ্ছে। কিভাবে বাঙালীদের, মুসলমানদের উচ্ছেদ করা হয়েছে .জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর থেকে। কিভাবে ধরে নিয়ে গেছে মানুষকে। কিভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে বোন, ভাবী, বউ, মা ও মেয়েকে। কিভাবে ধর্ষণের পর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে দেহের অঙ্গসমূহ। কিভাবে গুলী করে বা কসাইয়ের পশু জবাইয়ের মত করে বাঙালীকে, মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। কাপ্তাইয়ের প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলমান বনি আদমের গুমরে ওঠা কান্না দেখেছেন, শুনেছেন বর্তমান লেখক। তার তখন মনে পড়েছে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি. এর কার্যালয়ে ডিসপ্লে বোর্ডে দেখা বাঙালী মুসলমানদের উপর পরিচালিত অত্যাচার, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট দলিল— বিভৎস, আতংক সৃষ্টিকারী, বুক ভাঙ্গা আর্তনাদের স্মারক ফটোগ্রাফগুলির কথা।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন — কেন বাঙালীদের, মুসলমান বনি আদমদেরকে শান্তিবাহিনীর দ্বারা হত্যার ও বহিষ্কারের শিকার করা হয়েছে? শ্রীলংকায় ১৩% তামিল যে সুযোগ পায়নি, বাংলাদেশে মাত্র ০.২২% চাকমা সে সুযোগ পায় কি করে? অনেক বড় ভূখণ্ড হয়েও, প্রদেশের মর্যাদায় থেকেও বায়াফ্রা কি নাইজেরিয়াতে এত সুযোগ পেয়েছে? ইরাকে কুর্দীরা কি এই সুযোগ পেয়েছে? অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা; এ্যামেরিকার নিগ্রোরা কিংবা ১৮৬১-৬৫তে সাউথ কি এমন সুযোগ পেয়েছে? ভারতে নিজ দেশে পাঞ্জাবের শিখদের প্রতি, গুর্খাল্যান্ডের দাবীদারদের প্রতি , দখলকৃত কাশ্মীরে মুসলমানদের প্রতি, সাত রাজ্যসমূহের মানুষ ও গেরিলাদের প্রতি ভারত সরকার কি আচরণ করছে? কীভাবে সে স্থলে বিশাল সংখ্যক সেনা মোতায়েন রয়েছে, নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হচ্ছে ইনসার্জেন্সী? কীভাবে সেখানে চূড়ান্ত সেনা কর্তৃত্ব এবং সেজন্য বিশেষ আইন করা হয়েছে? সেই ভারত বাংলাদেশে কেন শান্তিবাহিনীকে মদদ দিচ্ছে? কেন তাদেরকে ভারত আশ্রয়-প্রশ্রয়, অর্থ, বৈষয়িক সুযোগ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, পশ্চাদ্ভূমি, রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনিক সহায়তা, প্রচার সুবিধা ইত্যাদি অকাতরে দিয়ে চলেছে? কেন বাংলাদেশ সরকার এসব দেখেও প্রতিবাদ করার সাহস রাখে না এবং উটপাখীর মতো বালিতে মুখ গুঁজে রাখে?

প্রাসঙ্গিক আরো প্রশ্ন হচ্ছে--কেন সামরিক বাহিনী উইথড্র করার দিকে এগোনো হচ্ছে? বরকল, লোগাং, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ির পানছড়ি, মাটিরাঙা, সদর থানার কুমিল্লা টিলা, বান্দরবান জেলার কিছু কিছু সেনা চৌকি, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, মারিস্যা প্রভৃতি সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত স্থানে কেন সেনা ক্যাম্প তুলে নেওয়া হচ্ছে? কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্ভাবনা--সম্পদরাজি, আর্থনীতিক সুযোগ, ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব সবকিছুকে চাকমা সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ও ভারতের পায়ে নিবেদন করা হচ্ছে? যে বাঙালী মুসলমানের ভাই গুলী খেয়েছে, যে বাঙালীর ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার সন্তানকে খুন করা হয়েছে, যার পরিবারের মহিলাকে বেইজ্জত করা হয়েছে, তাদের জন্যে কি করেছে সরকার বাহাদুর? কাউখালী ম্যাসাকারে যে মুসলমান ভাইয়ের তিন ছেলেকে জবাই করেছে শান্তিবাহিনী এবং সেখানে তাদের কবর আছে এবং যে হত্যাকাণ্ডের জন্যে কোনো মামলা নেয়নি থানা কর্তৃপক্ষ, সেই উদ্‌ভ্রান্ত মুসলমান ভাইয়ের জন্যে কোনো সান্ত্বনা আছে কি? তিনি নিজেও তো উৎখাত হয়ে গুচ্ছগ্রামে মানবেতর জীবনে রয়েছেন।

কাপ্তাই লেক স্পীড বোটে পেরিয়ে ইসলামপুর গুচ্ছগ্রামে গিয়াস উদ্দিন ব্যাপারী, জসীম উদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম, পার্বত্য যুব পরিষদের সভাপতি কাজী ইউসুফ আলম, মোসলেম খাঁ, শফিউল আলম, ইসলামপুর মসজিদের ইমাম দিদারুল হক আনসারীসহ অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেছেন বর্তমান লেখক। (০১/১০/৯৭ তারিখ, ইসলামপুর, কাপ্তাই, রাঙামাটি)।

কেন ৪৪০.০৪ বর্গমাইল এলাকা যেখানে উপজাতীয় ও বাঙালীরা থাকে, সেই এলাকা ছাড়িয়ে, কেন্দ্রশাসিত জাতীয় অঞ্চলের (সংরক্ষিত বন, মুক্ত খাস পাহাড়ী অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় অঞ্চল, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি) বিশাল ৪৬৫২.৯৬ বর্গ মাইল এলাকার কর্তৃত্বও সেখানকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীকে, মুসলমানকে বঞ্চিত করে, সারা দেশবাসীকে বঞ্চিত করে কেবলই ০.২২% চাকমার সন্ত্রাসী প্রতিভূ শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, বাঙালী বহিষ্কার, নিজস্ব পুলিশ, প্রবেশের অনুমতি (Inner Line Regulation) ইত্যাদির প্রক্রিয়ায়? আমাদের অকুতভয় সেনা সদস্যরা শ্রম, ঘাম, সময় ও জীবন দিয়ে তথাকার বাঙালীদের সহায়তায় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা করছে, তা আমরা ছেড়ে দেবো কেন? আমরা তো ভুলে যেতে পারি না যে, লেফটেন্যান্ট মুশফিক, ক্যাপ্টেন আরিফসহ আরো হাজারো দেশপ্রেমিক এদেশেরই এক-দশমাংশ 'ল্যান্ড অফ প্রমিজ' পার্বত্য চট্টলার জন্যে জীবন দিয়েছেন। তাহলে সরকার সমগ্র দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে ভারতে লালিত মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীকেই কেবল জানতে দিয়ে কী ধরনের চুক্তি করছে তাদের সঙ্গে? সরকার কি এর পরিণাম বুঝতে পারছে না? একি শান্তির পথে এগোনো, না আরো বড় অশান্তি ডেকে আনা?

এসব প্রশ্নের জবাব সরকারকে অবশ্যই দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দেওয়া, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-ফেনীকে বিপদগ্রস্ত করা, বন্দর হাতছাড়া করা, ভারতকে খবরদারী বিস্তার করতে দেওয়া, বঙ্গোপসাগরের জলসীমা হারানো — এসব মেনে নেবে না দেশের

জনগণ। প্রতিবাদ উঠেছে ও উঠবে, প্রতিরোধ করা হবে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী নয়, সারা দেশের ১২ কোটি মানুষ রুখে দাঁড়াবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে, দেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতার সঙ্গে বেঈমানী করলে জনগণ তা ক্ষমা করবে না কোনোদিন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও ক্ষমা করবেন না। পাবলিক এক্সচেকারের পয়সার হিসাব এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ও পার্বত্য বাঙালীর শ্রম, দেশপ্রেম, রক্ত, হাহাকার আর জীবনের যে ব্যয়, সেটির জন্যে জবাবদিহি করতে হবে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে।

দেশের সংবিধান বিরোধী, রাষ্ট্রের-প্রজাতন্ত্রের ইউনিটারী বা একক চরিত্রবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তি বাহিনী তথা ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া বা আঞ্চলিক পরিষদ ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেবার অধিকার সরকারের নেই। এসব কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং সংবিধান লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কোর্টে মামলাযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেখানকার ভারতীয় তস্কর সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে কেন? কেন "ভিসা' লাগবে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতে? কেন সংবিধানের ৩৬ ধারা, ৪২ ধারা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে বাঙালীর জন্যে, ১২ কোটি মানুষের জন্যে অস্বীকার করা হচ্ছে? কেন ১২ কোটি দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে; সংসদ, জনমত, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে পদদলিত করে এবং Oath of office কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে; পার্বত্য বাঙালীকে উপেক্ষা করে, সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে কেবল ভারত-পুষ্ট সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে তাদেরই মর্জিমাফিক এককভাবে চুক্তি করা হচ্ছে? সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাঙামাটি, পার্বত্য বান্দরবান (১৯৮৮ সালে তিনটি জেলার মর্যাদায় বিভক্ত। দ্রষ্টব্য ঃ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বাংলাদেশ গেজেট, ২ মার্চ ১৯৮৯) আমাদের, এদেশের ১২ কোটি মানুষের। সাজেক, কাসালং, মাইনী, চেঙ্গী, তবলছড়ি, কালা পাহাড়, বন্দুকভাঙ্গা, হরিণা, গোবাইছড়ি, সিতাপাহাড়, রাইংক্ষ্যং, চিম্বুক, মওদাক, মিরিঞ্জা প্রভৃতি রেঞ্জ ও ভ্যালীসমূহ আমাদের। মাইনী রিজার্ভ ফরেস্ট, কাসালং রিজার্ভ ফরেস্ট, মাতামুহুরী রিজার্ভ ফরেস্ট, রাইংক্ষ্যং রিজার্ভ ফরেস্ট, ঠেগা রিজার্ভ ফরেস্ট, সাংগু রিজার্ভ ফরেস্ট আমাদের। কর্ণফলী, কাসালং, মাইনী, চেঙ্গী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ফেনী নদী আমাদের। কাপ্তাই লেইক আমাদের, এই বাংলাদেশের। যারা বা যে সরকার বাংলাদেশের অরণ্য, পাহাড়, সম্পদরাজি, ঝরণা ও হ্রদ ছেড়ে দেবে শত্রুদের হাতে, তাদেরকে বা সে সরকারকে কোনোদিন জনগণ ছাড়বে না। কোনোদিনও না। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। আল্লাহ্ হাফিজ।

রচনাকাল ঃ জমাদিউস সানি ১৪১৮। কার্তিক ১৪০৪। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭।

দৈনিক ইনকিলাব- এ প্রকাশিত। ১১, ১৪,১৫ নভেম্বর ১৯৯৭। সাপ্তাহিক বিক্রম, প্রচ্ছদ কাহিনী, ১১-১৭ নভেম্বর ১৯৯৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্তাক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম গোপন চুক্তির রহস্য কোথায়

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, অরক্ষিত। সেখানকার পাহাড়ে অরণ্যে, চরাচরে আজ মুসলমান বাংলাভাষী জনতার হাহাকার, আহাজারি আর আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে আছে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা দখলকারী আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে কয়েক দফা অতি গোপনভাবে আলোচনা চালানোর পর এখন চাকমা শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, উষাতন তালুকদার প্রমুখের সঙ্গে ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭-এ সম্পাদিত হতে না পারা গোপন অসম দেশখাদক চুক্তিটি ২৬ নভেম্বর ১৯৯৭-এ সমাধা করতে যাচ্ছে। অবশ্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরালের ঢাকায় আগমন স্থগিত হওয়ায় এবং তাকে দিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি চাপ দিতে না পারায় এ চুক্তি সম্পাদন পিছিয়েও যেতে পারে।

কোন্ সংগঠনের নাম শান্তিবাহিনী? যাদের দাবি ছিল ১৯০০ সালের ফিউডাল "হীল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশন" বজায় রাখা। অথচ যারা ১৯৮৯ সালে পেয়েছে লক্ষ গুণ বেশি অধিকার ও সুযোগ। এখন যারা চাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে। এই শান্তি বাহিনী বিগত ২৩/২৪ বছর ধরে প্রথমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে, প্রীতি চাকমার উপদলীয় নেতৃত্বে এবং আজ সন্তু লারমার নেতৃত্বে আর জনসংহতির (পিসিজেএসএস) সাথে সংযুক্ত পাহাড়ী ছাত্র সমিতি (পিসিএস), হীল ওমেন এসোসিয়েশন ইত্যাদির সহায়তায় হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমানকে খুন করেছে। এক হিসাবে শান্তিবাহিনীর হাতে খুন হওয়া মুসলমানের সংখ্যা, বাংলাভাষী বাংলাদেশী মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজারের মত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই খুন হচ্ছে মুসলমান বাংলাভাষীরা। বড় বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছে বহুবার। এর মধ্যে কাপ্তাই থানার চন্দ্রঘোনায় পেট্রোলরত ৭জন সৈনিক হত্যাকাণ্ড, লংগদু হত্যাকাণ্ড, কাউখালী হত্যাকাণ্ড, বরকলের ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ড, পানছড়ি হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার নব খাগড়াছড়িতে ৭ জন সৈনিক হত্যাকাণ্ড, রামগড় থানার ঋগড়াবিল্ল বাজার হত্যাকাণ্ড,

খাগড়াছড়ির লোগাং হত্যাকাণ্ড, নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ার হত্যাকাণ্ড, রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার গুলশাখালী, গাঘাছড়া, মাইনী, বড় মাহিল্লা ও কালাপাকজ্জার ৩৪ বাঙালী কাঠুরের হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির কুমিল্লা টিলার হত্যাকাণ্ড, নাইক্ষ্যংছড়ি পাড়া ও বলিপাড়ার হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলমানরা, বাংলাভাষী মানুষেরা হাজার হাজার হত্যার শিকার হবার ব্যাপারে সবাই এক কথা বলেছে। রাঙামাটির কাপ্তাইয়ের গিয়াসউদ্দিন ব্যাপারী, রিজার্ভ বাজারের জাহাঙ্গীর আলম, পার্বত্য যুব পরিষদের সভাপতি কাজী ইউসুফ আলম, ইসলামপুরের ক্ষুদে ব্যবসায়ী মোসলেম খাঁ, লঞ্চের কেরাণী শফিউল আলম — এরা সবাই শান্তিবাহিনী কর্তৃক মুসলমান হত্যা, বাংলাভাষী মানুষ হত্যার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন বর্তমান লেখকের কাছে ০১/১০/৯৭ তারিখে রাঙামাটিতে। যাহোক, কয়েক হাজার মুসলমান বাংলাভাষী যে শান্তি বাহিনীর হাতে বিগত বছরগুলিতে নিহত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালীদের মতে এই সংখ্যা ত্রিশ হাজারের মতো। বাংলাদেশের আর্মী, বিডিআর, আর্মড পুলিশ, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি এর কয়েক শত সদস্যও শান্তিবাহিনীর সাথে সংঘাতে, শান্তিবাহিনীর এ্যামবুশ-এ প্রাণ দিয়েছে। এছাড়া বাঙালীদের, সেনা সদস্যদের আহত করা, অপহরণ করা, গায়েব করে দেওয়া — এসবও ঘটেছে শত শত ক্ষেত্রে। বাঙালীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র খুনীরা। মা-বোন-বউ-মেয়ের ইজ্জত হরণ করেছে ধরে নিয়ে গিয়ে, কিংবা পরিবারের অন্যান্যদের সামনে অস্ত্রের মুখে বা হাত-পাত বেধে রেখে। মারধর, চাঁদা আদায়, হুমকি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার, গৃহ ও দোকান লুট ইত্যাদি তো লেগেই আছে। এই শান্তিবাহিনী ১০ আগস্ট ১৯৯২ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব লুপ্ত হবার আশংকায় এবং ব্রীদিং স্পেস লাভের মাধ্যমে রিঅরগেনাইজড হবার গোপন স্বার্থে একতরফা সীজফায়ার বা অস্ত্র বিরতি ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে আজ নভেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত তারা ১২০০ বারেরও বেশি এ অস্ত্রবিরতি লংঘন করেছে। তারা অপহরণ, গুম, খুন, চাঁদা আদায়, বেসামরিক মুসলমান বাংলাভাষী হত্যা, বেসামরিক ব্যক্তিকে আহত করা, সেনা সদস্যসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের আহত করা, গুলি বিনিময়, এ্যামবুশ, নানাবিধ সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ নানাভাবে লংঘন করেছে নিজেদের অস্ত্রবিরতি।

বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতে লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট, তথায় হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠাকারী, তথায় ট্রেনিং লাভকারী, তথা থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ-এক্সপ্লোসিভ-মাইন লাভকারী, অর্থ লাভকারী, নৈতিক ও প্রচার-সমর্থন লাভকারী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভকারী, ভারতীয় বিএসএফ-এর কাভার লাভকারী, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র"-এর সার্বিক ও কার্যকর সহায়তা লাভকারী, দেশদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী খুনী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীকে চূড়ান্ত অবজ্ঞা করে, চরম অন্ধকারে রেখে এক অশুভ চুক্তি করতে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? এ কথা খুব পরিষ্কার, আমরা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চাই, আমরা চাই পার্বত্য বাংলাভাষী, পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমান এবং পার্বত্য উপজাতীয়রা এক সঙ্গে শান্তি, সমতা, সমসুযোগ, সহযোগিতা, সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্মানজনক, স্বস্তির সুখী জীবনে বসবাস

করুক। কিন্তু বাংলাভাষীদের স্বার্থ বিকিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করে নিশ্চয়ই কোনো গোপন অসম চুক্তি আমরা ১২ কোটি মানুষ চাইতে পারি না।

যুক্তি, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, সততা, সাংবিধানিকতা, গণতন্ত্র, জনগণের ম্যান্ডেট, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ, জোর করে জাত-শত্রু হয়ে যাওয়া ভারতের এ যাবৎকার এবং বর্তমানের আচরণ, ভূমিকা ও তৎপরতা পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালীদের স্বার্থ ও অস্তিত্বসহ এক কথায় দেশের সামগ্রিক অস্তিত্ব— এসব কিছু আন্তরিকভাবে গভীর বিশ্লেষণ সহকারে বিবেচনায় আনলে আওয়ামী সরকারের পক্ষে এ অসম চুক্তির ন্যায় আত্মঘাতী চুক্তি করা কোনোকালেই সম্ভব হতো না।

এই চুক্তি গায়ের জোরে, ভারতের সমর্থনে এবং সংকীর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণের স্বার্থের তাগিদে এবং অনেকখানি অযোগ্যতা-অজ্ঞতা-জিদ-লুক্কায়িত গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত ঋণ শোধ — এ সবের কারণেই সমাধা করতে যাচ্ছে সরকার, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন আসে সঙ্গতভাবেই। ১২ কোটিরও বেশি মানুষের দেশে শতকরা ৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে কীভাবে টেকনিক্যাল মেজোরিটির জোরে ক্ষমতা দখল করে সরকার এই দেশ-ডোবানো চুক্তি করতে যাচ্ছে?

শুধু আওয়ামী লীগ বাধ্য তাদের দলীয় প্রধান ও তাদেরই থেকে উত্থিত সরকার প্রধানের এই অপরিণামদর্শী আচরণকে সমর্থন করতে। এরা সমর্থন না করলে নিজেরা আস্ত থাকবে না — পদ পদবী, হালুয়া-রুটি, সুযোগ-সুবিধা, লাইসেন্স-পারমিট, মালকড়ি — সব কিছু হারাবে। সমর্থন দিতেই হবে তাই, যুক্তিগ্রাহ্য হোক বা না হোক ; ভাল লাগুক বা না লাগুক ; দেশ থাকুক বা গোল্লায় যাক্।

কিন্তু এ অবস্থা তো অন্যদের নয়। তাই অন্যান্য সকল দল, নেতৃত্ব, কর্মী এবং সাধারণভাবে জনগণের তরফ থেকে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ সংগঠিত, সংঘটিত হচ্ছে। অগ্রসর, সচেতন, বিবেকবান এক বুদ্ধিবৃত্তিক অংশ জন সমাজকে, দেশবাসীকে এ ব্যাপারে কমিউনিকেট করেছেন, কনশাস করেছেন, কনভিন্স করেছেন এবং এ্যাকটিভ করে তুলেছেন।

জনমত সম্পূর্ণ বিপরীতে থাকা সত্ত্বেও, সারা দেশে নজীরবিহীন প্রতিবাদ সত্ত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে হরতাল, কাফনের কাপড় পরে মিছিল, সারাদেশে হরতাল হওয়া সত্ত্বেও, এত বোঝানো সত্ত্বেও সরকার কেন জনমত ও দেশবাসীকে সম্পূর্ণ বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, তাচ্ছিল্য করে, দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিচ্ছে— শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতে আশ্রয় লাভকারী খুনীদের কাছে? কেন তাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে কল্পনাতীত আদর-আপ্যায়ন ও তোয়াজ-খাতির করে, সামরিক হেলিকপ্টারে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে এনে জামাই যত্ন করে এই অসম দেশবিরোধী চুক্তি করা হচ্ছে?

অবস্থা দেখে এও মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতীয় প্রভুদের একক ইচ্ছায় তাদের দালাল শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে চুক্তি হয়তো বা হয়েই গেছে। আগামী দিনে যে কোনো সময়ের বৈঠকে হয়তো বা একটি স্টেজ ম্যানেজড্ শো দেখানো হবে।

আই ওয়াশ হয়তো বা করা হবে। বর্তমান সরকারের ন্যায় একই আওয়ামী–বাকশালী দলীয় সরকার, ১৯৭২-৭৫-এর সরকার চুক্তি করে বাংলাদেশকে ভারতীয় কব্জায় রেখেছিলো এ যাবৎ — সাত দফা গোপন চুক্তি ও ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি করে। আবার, চুক্তি করে তারা বেরুবাড়ী দিয়ে দিয়েছে। আজ ২৫ বছর পার হয়ে গেলেও বেরুবাড়ীর বদলে তিন বিঘা ভারত দেয়নি। কেবল যখন ভারতের ইচ্ছা চার ঘণ্টার জন্যে মানুষ চলাচল করতে দেয় বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতায়। সার্বভৌমত্ব তিন বিঘায় ভারতের। পতাকা ওড়ে তাদের। সেনা সদস্য ও বিএসএফ পাহারা দেয় সেখানে। বাংলাদেশকে কাঁচকলা দেখিয়েছে তারা। এভাবে তালপট্টির ওপর সকল নিয়ম ভঙ্গ করে দখল নিয়েছে আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। ফারাক্কা দিয়ে বাংলাদেশকে শেষ করছে ভারত। ভারতীয় রাজ্যসভায় সদস্যরা, ভারতীয় কর্মকর্তারা, ভারতীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা সেচমন্ত্রী বাংলাদেশকে প্রাপ্য পানি দেয়নি বলে স্বীকার করলেও, মমতা ব্যানার্জীর মতো রাজনীতিবিদ ভারত বাংলাদেশকে পানি চুক্তির মাধ্যমে পানি থেকে বঞ্চিত করে ঠকিয়েছে বললেও, বাংলাদেশের আওয়ামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ক'জন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রী পানি পেয়েছেন বলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন এবং সাফল্যের খুশীতে উদ্বাহু নৃত্য করছেন। এদিকে পদ্মার বুকে চর, মানুষ হেঁটে যায়, বাস–গাড়ী চলে, চায়ের দোকান বসে, জনসভাও হয়, বাচ্চারা ডাংগুলি খেলে। ভারতের কাছ থেকে পানি না পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে চলতিপথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে অর্থাৎ জল বিয়োগ করে নদীতে পানি আনয়নের কথা বলে ব্যঙ্গ করে ক্ষোভ মিটায় লোকেরা। একজন নিবন্ধকার বেশ কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় এক নিবন্ধ লিখে তার সামনে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছিলেন।

ভারত উজান থেকে পানি প্রত্যাহার করে, অন্যত্র চ্যানেলাইজ করে আমাদেরকে দারুণ অন্যায়ভাবে প্রতারিত করছে। কখনো দেখাচ্ছে দীর্ঘদিনের তৃষিত নদীর পানি শুষে নেওয়ার ছেলে ভোলানো ফাজলামো অজুহাত। আর কখনো খেলা দেখাচ্ছে হিমালয়ের বরফ গলেনি এমন ধূয়া তুলে। বাংলাদেশের সরকার পক্ষ গলায় শিকল পরা অবস্থায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ডুগডুগির বাজনা শুনে লাফালাফি করে চলেছেন। এদিকে বাঁধ-গ্রোয়েন দিয়ে ভারত অভিন্ন আরো ৫৪টি নদীর পানি আটকে বা সরিয়ে নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে চতুর্দিক থেকে মেরে ফেলছে। এরপরও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে একান্তই ভারতীয় স্বার্থে, ইচ্ছায় ও দাপটে চুক্তি করা সাজে কি?

মনে পড়ে, ১৯৭১-এর পূর্বে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে যখন "ফারাক্কা মৃত্যুর পদধ্বনি" নাম দিয়ে বি এন আর থেকে বই প্রকাশ করেছিলেন ড. হাসান জামান (অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), তখন বলা হয়েছিল এটি পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত, এটি ভারতের বিরুদ্ধে অহেতুক শত্রুতা, এটি বাঙালীর স্বার্থ বিনাশের গূঢ় স্বার্থে মিথ্যা প্রচারমাত্র। কিন্তু হায়, আজ ফারাক্কা বাঁধ সত্যিই বাংলাদেশের জন্যে মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদেশের চূড়ান্ত মৃত্যুর পদধ্বনি শোনাচ্ছে।

বর্তমান লেখক আরেক ড. হাসানুজ্জামান (অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) তার কয়েক দফা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, তার যাবতীয় পড়াশোনা, খোঁজ-খবর, গবেষণাকর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমিনার করে, বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে, প্রচারপত্র দিয়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-দলের সঙ্গে মত বিনিময় করে পার্বত্য চুক্তির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আরো কিছু সহযাত্রী দেশপ্রেমিকের ন্যায় দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করার জন্যে নিরলস সচেষ্ট আছেন। কিন্তু দেশবাসী শুনেলেও, বুঝলেও সরকারী কাঠামোর যারা শোনার তারা শুনছে কি? কানে তুলো, চোখে ঠুলি কি এখনও তাদের নেই? তারা কি হাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে দেওয়ার গানই গাইছে না?

আবার ওদিকে বিরোধী দলগুলি ও তাদের নেতৃত্ব প্রতিবাদ করলেও, চেঁচালেও প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকর এবং বাস্তবে চুক্তি রোধকারী কিছু কর্মকাণ্ড চালাতে পারছে কি? পারছে কি,বা পারবে কি তারা চুক্তি ঠেকাতে? যদি না পারে তারা, যদি না শোনে সরকার, যদি শেষ পর্যন্ত হয়েই যায় চুক্তি, তবে দেশের যে ক্ষতি হবে তার জন্যে এরা পক্ষ-বিপক্ষ যার যার অবস্থান থেকেই দায়ী থাকবে। তখন অবশ্য কিছুই করা যাবে না। বেরুবাড়ী ও ফারাক্কার ন্যায় পার্বত্য চুক্তি বিষময় ফল দেবে। বাসি হলে গরীবের কথা ফলবে। যেমন ফলেছে আগের বারে ফারাক্কা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী, তেমনি ফলবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া সংক্রান্ত এবারকার ভবিষ্যদ্বাণী। শুধু দেশকে ভালবাসা, শুধু এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাখতে চাওয়া; শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদরাজি ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্বকে দেশের কল্যাণে যথাযথ ব্যবহারের স্বপ্ন দেখা; শুধু বঙ্গোপসাগরের জলরাশির উপর আমাদের অধিকারকে বজায় রাখা এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার গেইটওয়ে থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের একান্ত কাম্য বাসনা লালন করা; শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বদেশবাসী মুসলমান ভাই, বাংলাভাষী ভাইদের ন্যায্য অধিকার ও জীবন রক্ষার লড়াইয়ে সাথী হওয়া; শুধু দেশের সংবিধানের মর্যাদা ও কার্যকারিতা রক্ষা; শুধু আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার আগ্রহ; শুধু দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ — এই বাক্যে এর তাৎপর্যসহ বিশ্বাস করা; এবং সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে হাযির-নাজির জেনে ঈমানী দায়িত্ব, দ্বীনী দায়িত্ব, হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে সংঘটিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমরা। এ না হলে; এই বিপদে দেশ ও মানুষের পাশে না এলে সততা, যুক্তি ও প্রতিরোধের পক্ষে না দাঁড়ালে মানুষ হিসাবে আমাদের সত্যিকার পরিচয়ই লুপ্ত হবে।

তাই প্রশ্ন জেগেছে মনে। ১২ কোটি মানুষের এক সমস্যা সঙ্কুল দেশে, এত ঘন বসতির দেশে মাত্র ০.২২ ভাগ চাকমার উপর চেপে বসা ভারতীয় অর্থ-অস্ত্র-ট্রেনিং-গোলাবারুদ-সমর্থন-পশ্চাদভূমি ও সামরিক সহায়তা লাভকারী সন্ত্রাসী খুনী দেশদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে, সন্তু লারমা, উষাতন তালুকদার, রূপায়ন দেওয়ানের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে কেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার দেশের এক দশমাংশ (৫০৯৩ বর্গমাইল / ১৩২৯৪.৭১ স্কয়ার কিলোমিটার) সর্বাধিক সম্পদ-সমৃদ্ধ,

সম্ভাবনাময়, কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড তুলে দিতে চায়? উত্তর পাওয়া একান্ত দরকার। জানা দরকার, শান্তি বাহিনীর মেজর মলয় (উষাতন তালুকদার, ফিল্ড কমান্ডার) মেজর পেলে (তালুকদার, ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার), মেজর রূপায়ন দেওয়ান (রিপ, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক এবং বিদেশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত), মেজর অশোক (গৌতম দেওয়ান), মেজর মিহির (কালী মাধব), মেজর তাপস চাকমা, মেজর দেবাশীষ চাকমা, মেজর সমেশ চাকমা, মেজর সুধাসিন্ধু খীসা, মেজর উল্লাস, মেজর শংকর, মেজর ধীরেন, ক্যাপ্টেন নৈতিক, ক্যাপ্টেন অজিত চাকমা, মেজর বরুণ, ক্যাপ্টেন কমল, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অনল, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নিবিড়, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট প্ল্যানেট এরা কারা? এরা কোথায় থাকছে, কোথায় ট্রেনিং অস্ত্র, গোলাবারুদ পেয়েছে? ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে এদের কি সম্পর্ক তাও জানতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এত বাঙালী বাঙালী করেও, বাঙালী জাতীয়াতবাদের প্রবক্তা হয়েও কেন পাঁচ লাখ বাঙালীকে শান্তিবাহিনীর হায়েনাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। এভাবে আরো বোঝা যাবে, এই মুসলমান বাঙালীদের সম্পদ লুটপাট, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালানো, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, তাদের নারীদের ধর্ষণ, তাদের শিশুদের বিভৎসভাবে হত্যা করা, তাদেরকে আহত-নিহত করা, তাদের জমি কেড়ে নেয়া, তাদেরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা, তাদেরকে ঐ অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি কুকর্ম শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের দ্বারা এত বছর চলার পরও এখন আবার চুক্তি করে কেন বর্তমানে ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ সরকার এসব কিছু করার বৈধ লাইসেন্স তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে।

সরকার তো এক পক্ষকেই চোখে দেখছে। ভারতীয় স্বার্থ ও শান্তিবাহিনী তাদের কাছে মুখ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে তো অন্য পক্ষগুলিও আছে। সেখানকার বাঙালীদের কেন সরকার চুক্তিতে ডাকেনি? কেন সেখানকার আরো ১২টি উপজাতিকে বাদ দিয়ে সরকার কেবল সকল মাখন এ যাবৎ উদরস্থ করায় পটু ও সিদ্ধহস্ত এবং একচ্ছত্র সন্ত্রাসী চাকমা শান্তিবাহিনীরই সাথে কেবল গোপন আলোচনা ও গোপন চুক্তি করছে? চাকমারা তো সেখানে অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালীদের তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবে কেন তারা একক মোড়ল এবং আওয়ামী সরকারই বা কেন কেবল চাকমা শান্তিবাহিনী তোয়াজে ব্যস্ত?

কেবল চাকমাদের এবং এর মাধ্যমে ভারতকে খুশি করতে চেষ্টা করলে পরিণামে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালীদের মধ্যে বিদ্রোহী ও সশস্ত্র শক্তির আবির্ভাব যে ঘটবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? তাছাড়া কেবল চাকমাদের সঙ্গে চুক্তি তো অন্যদের অধিকার ও সুযোগ হরণ মাত্র। এতো রীতিমত অযৌক্তিক, অন্যায় ও অবৈধ। আবার দেশবাসীও কি কোনো চুক্তি আদৌ চেয়েছে? তারা শান্তির পক্ষে হলেও শান্তির নামে আরো বড় আইনী অশান্তি চায় না। তারা চায় না পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক। সরকারের সাহস থাকলে জনমত যাচাই করে না কেন?

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ২৬ বছর ধরে যে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী দেশ রক্ষা করলো, বিদ্রোহ দমালো, স্বাধীনতা বাঁচালো জীবন দিয়ে, ঘাম ও রক্ত দিয়ে, তাদের কোনো মতামত নেই কেন? এত বাঙালী মারলো, এত মুসলমান হত্যা করলো

যে–শান্তিবাহিনী, তাদের সঙ্গে দরকার না থাকা সত্ত্বেও নতজানু হয়ে গোপন চুক্তি করতে, তাদের হাতে দেশের এক-দশমাংশ তুলে দিতে সরকারের এতটুকু বিবেকে বাঁধছে না?

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এই গোপন চুক্তিতে যারা ইনসার্জেন্ট বা বিদ্রোহী পক্ষ; এদের নেতা সন্তু লারমা, উষাতন তালুকদার, রূপায়ন দেওয়ান আর এদের সহযোগী উপেন্দ্র লাল চাকমা বা হংসধ্বজ চাকমা — এদেরকে মোকাবিলা করতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবেচনায় তেমন প্রতিনিধি, যেমন এক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী, মেজর জেনারেল আবদুস সালাম এদের কাউকে বাংলাদেশ সরকার স্বীয় পক্ষে রাখেনি কেন? সালাম সাহেবের কথা উঠলেও কেন শান্তি বাহিনী মানেনি? লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খান, যার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তিনি তো শাসক দল আওয়ামী লীগের সদস্য, আওয়ামী লীগের এমপি, আওয়ামী লীগের জ্বালানী মন্ত্রী — তাকেও কেন রাখা হয়নি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনায়, চুক্তির খসড়া তৈরিতে ও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে? আবার চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বর্তমানে খাগড়াছড়ি রিজিওনের বিগ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আশফাক কিংবা রাঙামাটি রিজিওনের ৩০৫ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জহিরুল আলম — এদের যে কাউকে রাখা যেত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যথাযোগ্য আলোচনার স্বার্থে। কিন্তু তা না করে কেবল দলীয় চীফ হুইপ অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং প্রায়শঃই যিনি বলেন যে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর ভারতের অধিকার আছে সেই যোগ্যতাশূন্য চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন (যিনি ১৯৯৬-এ ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে চট্টগ্রামে সর্বাধিক তৎপর ছিলেন)কে কিভাবে সরকারী পক্ষে আলোচনায় সদস্য করা হল? ফলতঃ শান্তিবাহিনীর ইচ্ছা পূরণ তো হলই, তারা পুরোপুরি কর্তৃত্বও করলো। চুক্তিও গেল একতরফা তাদেরই পক্ষে। অন্ততঃ অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে।

আওয়ামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, তার ফুফাতো ভাই এবং তার দলীয় এক স্তাবক নেতা জানলেই কি চলবে গোপন চুক্তির শর্তাদি? দেশবাসীর কি কোনো অধিকার নেই? তারা কি কিছু জানবে না? এ কেমন কথা?

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা বলছেন, বিএনপি সদস্যরা এসে সহযোগিতা করলেই জানতে পারতো চুক্তিতে কি কি আছে। বিস্মিত হতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কথা ও বিবেচনা বোধ দেখে! তিনি ও তার লোকজন রাত-দিন বিএনপির নেত্রী ও অন্যান্যদের 'চোর' বলে ডাকবেন, তাদের বিরুদ্ধে সর্ববিধ হামলা-মামলা চালাবেন, সব কিছু স্বেচ্ছাচারীভাবে গোপনে করবেন আর অন্যদিকে সহযোগিতার কথা বলবেন, তাতো হয় না।

তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও তার লোকজন বা মন্ত্রীরা কিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে তাদের সঙ্গে এসে বিএনপি জানলেই সমাধান হয়ে গেল? দেশ কি প্রধানমন্ত্রীর দল ও বিএনপির পৈত্রিক সম্পত্তি যে, কেবল তারা দু'পক্ষ জানলেই হবে এবং আর কারো জানার কোনো অধিকার নেই? এতদ্ব্যতীত বিএনপি তো দেশবাসীকে গোপন চুক্তির কথা

জানানোর দাবিই তুলেছে। আর আসল ক্ষমতার অধিকারী তো সংবিধান অনুযায়ী জনগণ। এত সংবিধানের দোহাই দেন অথচ সেই সংবিধানের ৭(১) নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণ কর্তৃত্বের অধিকারী ; এই অনুচ্ছেদ ও সংবিধানের প্রস্তাবনা মতে জনগণের ইচ্ছায় সংবিধান অনুযায়ী সরকার দেশ চালাবে। জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি এই সংবিধানের সঙ্গে অসমঞ্জস যে কোনো আইন বাতিল হয়ে যাবে (৭ অনুচ্ছেদের ২ উপ অনুচ্ছেদ)। অথচ সেই জনগণকে, তাদের মতামতকে, তাদের ম্যান্ডেটকে, তাদের স্বার্থকেই তোয়াক্কা করছেন না। জনগণকে রেখেছেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আন্দোলন ও প্রতিরোধ দেখে বলছেন, বিএনপি জানলেই হলো। দেশ কি দলাদলি করে টোঁপের কায়-কারবার করে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপার? ভোটের সময় কি বলেছিলেন? কীভাবে হাত জোড় করে, তসবিহ নিয়ে, পট্টী মাথায় দিয়ে, ক্ষমা চেয়ে, চোখের পানি ফেলে, একটিবার মাত্র এতিমকে ভোট দেয়ার কথা বলেছিলেন — মনে নেই সেসব কথা? শপথ করেছেন তো সংবিধান রক্ষার, দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার, স্বীয় সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু না করার। এখন ভুলে গেছেন কি করে?

আরো বহু প্রশ্ন আছে। Treaty বা চুক্তি তো করবেন বিদেশের সঙ্গে। নিজের দেশের একেবারে হাতে গোনা বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতীয় দালাল সন্ত্রাসী, খুনীর সঙ্গে চুক্তি হয় কি করে?

আবার চুক্তি যখন করছেন, তা এত গোপনে কেন? কেন কেউ জানবে না তা পূর্বাহ্নে, তা সমাধাকালে? কেন প্রধানমন্ত্রী, তার ফুফাতো ভাই ও দলীয় এক নেতা জানলেই চলবে? যদি চুক্তিতে আপনাদের চিৎকার মতো খারাপ কিছু, দেশের স্বার্থ বিরোধী কিছু না থাকে তাহলে এত লুকাচ্ছেন কেন? সন্দেহ তো এ জন্যই হচ্ছে। তলে তলে কারবার সেরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তি বাহিনীর নামে ভারতের হাতে তুলে দিলে তখন দেশের কি হবে? তখন কার কি করার থাকবে? বড় মুখ করে তো বেরুবাড়ী দিয়েছিলেন। বদলে পেয়েছেন অশ্ব ডিম্ব। এই আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব বেরুবাড়ি দেওয়া ছাড়াও ১৯৭৪ সালে ৪১ দিনের জন্যে কেবল পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার জন্য ভারতকে সম্মতি দিয়েছিলেন। তার ফল তো দেখাই যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ মরুভূমি। এবার শেখ হাসিনা ৩০ বছরের জন্য ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি করে আরবিট্রেশন, গ্যারান্টি ক্লজ — সব বাদ দিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে এখন দেশের গলায় ফাঁস পরিয়েছেন। পানি আর এলো না। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলাদেশকে শেষ করে দিতে চাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হয়েও আজ ভারতের প্রদেশের মর্যাদায়, তাদের সমতলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি দাদার সঙ্গে কথা বলছে, তার কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। বাংলাদেশ কি ভারতের প্রদেশ? কেন বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের লেজে ধরা? কেন সরাসরি দিল্লীর সঙ্গে বসতে পারে না? এভাবে গ্যাস, বিদ্যুৎ, ট্রানজিট, করিডোর — সব ব্যাপারে বাংলাদেশের লেজে-গোবরে অবস্থা, ভারতের কাছে নতজানু নীতি। পানি চুক্তিতে ঠকার পিছনে স্বার্থান্ধ মতলববাজ মঞ্চ আমলার অযোগ্যতা ও কারসাজি ছিল। এবার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা কালেও খলনায়ক আমলাটি কর্তৃত্ব করছে। এ লোক যেমন ফারাক্কা বিষয়ে

বিশেষজ্ঞ নয় তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। অথচ কলকাঠি ঠিকই নাড়ছে। সেবা করে চলেছে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সংকীর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের এবং ভারতীয় প্রভুর। "বী এ রোমান হোয়াইল ইন রোম" তত্ত্বের সার্থক প্রবক্তা মঞ্চ-নায়ক আমলা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা দেশ ডুবিয়ে ছাড়ছে ও ছাড়বে। রাস্তায় মঞ্চ বানিয়ে যা পাবার তা তো পাওয়াই গেছে। এখন এই আগাছা আমলা অংশকে ঝেড়ে ফেললে আওয়ামী লীগ সরকারের মঙ্গলই হবে।

আরো প্রশ্ন আছে। সংবিধান অনুযায়ী লব্ধ ইউনিটারী রাষ্ট্রের চরিত্র কি সংবিধান লংঘনপূর্বক বদলে ফেলতে পারে আওয়ামী সরকার? যদি না পারে, তাহলে কীভাবে তারা সংবিধানকে শিকেয় তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতীয় স্বার্থের যোগানদার শান্তি বাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছে তাদেরই দাবী অনুযায়ী স্পেশাল স্টেটাস দিয়ে? আমাদের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থনে সংবিধান না পাল্টে কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া যায়? কী করে সেখানে রিজিওনাল কাউন্সিল করা যায়?

দেশের অন্যান্য উপজাতি বা সংখ্যালঘুরা বা দেশের অপর কোনো অঞ্চল যদি এ দ্বারা উৎসাহিত হয়, তাহলে কি হবে? তাদের এমন দাবীও কি মেনে নেওয়া হবে? ইতোমধ্যেই তো সিলেটে মনিপুরী ও খাসিয়াদের নেতৃত্ব দানের জন্যে, তাদের উপর বঞ্চনার ধূয়া তুলে তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে একটি খাসিয়া সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে লারমা ভ্রাতৃদ্বয়ের কায়দায়। এম.এন. লারমার মতো সিলেটের এই যুবকও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। একদিকে আসাম থেকে, শিলচর থেকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, পত্র-পত্রিকা সিলেটকে তাদের বলে দাবী তুলেছে, 'সিলেট দখল' আন্দোলন গড়ে তুলছে। অন্যদিকে সরকারও মাগুরছড়ার নাটক করে, রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিধ্বস্ত রেখে সিলেটে বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ গড়ে উঠতে সহায়তা দিচ্ছে। সিলেটের ঐ যুবক খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতা প্রয়াত টিলসন প্রধানের ছেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পাঠ শেষ করা ঐ পিভিশন প্রধান সুছিয়াং সিলেট অঞ্চলের খাসি, মনিপুরি, গারো, ত্রিপুরা, হাজং, ল্যাংগাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী দলের সমন্বয়ের কথা বলে "বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম" গঠন করে নিজে তার আহ্বায়ক হয়েছে। দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় এর উপরে সংবাদ, এর ছবি ও সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। এবার সিলেটে আরেক বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় দেখা দিলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। সিলেটের যাবতীয় সম্পদরাজি এবং তামাবিলে ইউরেনিয়ামের সম্ভাবনা — ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের চোখ পড়েছে গভীরভাবে। যেমন এই হায়েনাদের আরো আক্রমণ চলছে দেশের এক বিশাল অঞ্চলে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন নামে। তাহলে এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের আর থাকবে কি? ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের অখণ্ড ভারত ও রামরাজত্ব ; ভারতীয় বিজেপি-শিবসেনার, আদভানী-বাল থ্যাকারের "রাম আউর রোটি" তত্ত্ব, "গুজরাল ডকট্রিন" সব কিছু মিলে-মিশে একাকার হয়ে বাংলাদেশকে শেষ করতে উদ্যত। সত্যিই নেহরুর কথা মোতাবেক দেখা যাচ্ছে, বিভক্ত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বাংলা তারা মেনে নিয়েছেন, ঐ

পথেই আবার অখণ্ড ভারত গড়ে তোলা যাবে বলে। আর আমাদের সরকার এবং ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও উঠে-পড়ে লেগেছেন। ভারতীয় 'র'-এর টাকায় যারা সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন, কিংবা দেশে ও ভারতে যারা নানা ধান্ধা করে বেড়াচ্ছেন, যারা ইসলামের কথা শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, সেই দাদাপন্থী বুদ্ধিজীবীরা একইভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো দুই বাংলা এক করার কথাও বলছেন, আবার ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ভুল ছিল বলে সাতচল্লিশ-পূর্ব অবস্থায় ফেরৎ যেতে চাইছেন। এ দেশের ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ওপারের দাদাদের তুলনায়ও এক ডিগ্রী অধিক অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার সৈনিক সেজেছেন। এই ডামাডোলের মধ্যে পড়ে সুযোগ-সন্ধানী ও ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ বুদ্ধিজীবী কেউ একজন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে 'শহীদ' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। একজন খুনী, দেশদ্রোহী, ভারতের দালাল আজ শহীদ। আজকাল বাংলাদেশে হিন্দু শহীদও পাওয়া যায়। এমনকি নাস্তিক শহীদও পাওয়া যায়। নাস্তিকরাও মৃত নাস্তিককে শহীদ বলতে পিছপা হয় না। যদিও নাস্তিকরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, ইসলামকে ঘৃণা করে। অথচ 'শহীদ' শব্দটি কেবল ইসলাম ধর্মেরই পরিভাষা। ইসলামের cause-এর জন্যে যে জীবন দেয়, সেই কেবল শহীদ, অন্য কেউ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যে গোপন চুক্তি করছে, সে ব্যাপারে আরো প্রশ্ন আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকার ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল হচ্ছে জাতীয় অঞ্চল। কেবল ৪৪০.০৪ বর্গমাইল হচ্ছে বসতি এলাকা। এখন শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করে রিজিওনাল কাউন্সিল ও স্পেশাল স্টেটাসসহ সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে ওই ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল জাতীয় অঞ্চল যার মধ্যে রয়েছে বনাঞ্চল, পাহাড়ী অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল, কর্ণফুলী হ্রদ, খাস জমি, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও শিল্পাঞ্চল, খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা — এগুলির উপর বাংলাদেশ অর্থাৎ জাতীয় সরকার বাস্তবে কর্তৃত্ব হারাবে না কি?

সমগ্র বাংলাদেশের উপর বিশাল জনসংখ্যার চাপ যাচ্ছে। এখন দেশের ১২ কোটি মানুষকে গড়ে ৩০০০ জন প্রতি বর্গমাইলে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি বর্গমাইল ১৯০ জন রাখার কোনো মানে হয়? আরো এক কোটি সমতলবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠাঁই করে দেওয়া যায় অনায়াসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সময় ছিল চট্টগ্রাম জেলার ভিতর। ১৮৬০ সালে আলাদা করা হয়েছে। সারা জীবন এটি ছিল বাংলাদেশের ভিতরে, সেই প্রাচীন হরিকেল জনপদ থাকা অবস্থায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের কন্টিগিউআস্ টেরিটোরি। কাজেই, কেন বাংলাদেশীরা নিজ দেশের এক অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে, বসবাস করতে, স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না? সংবিধানের ৩৬ এবং ৪২ ধারার মৌলিক অধিকারের বলে কেন তারা সেখানে জমি-জায়গা কিনতেও পারবে না? কেন তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকবে? কেন তারা চাকমা শান্তিবাহিনীর দ্বারা অত্যাচারিত হবে, হত্যার শিকার হবে? কেন তারা নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবে? কেন বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ হয়েও, চাকমা ও অন্যান্য উপজাতির তুলনায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সেখানে একজন চাকমার প্রাপ্ত সুবিধার ২১ ভাগের এক ভাগ পাবে? কেন তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হবে? সংবিধানের মৌলিক

অধিকারের ২৯ এবং ৩১, ৩২ অনুচ্ছেদের সুযোগ কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী মুসলমানরা পাবে না?

শান্তিবাহিনীর ও জনসংহতির স্বায়ত্বশাসনের সঙ্গে আরেকটি দাবী হচ্ছে বাঙালী উচ্ছেদ। কোন্ সাহসে চাকমা সন্ত্রাসী ভারতীয় দালাল শান্তিবাহিনী এই দাবী তোলে? আর কেনই বা তাতে সায় দেওয়া হয়? চাকমারাসহ কোনো উপজাতিই এ দেশের আদিবাসী নয় (দেখুন, বর্তমান লেখকের প্রকাশিত গবেষণাকর্ম– "পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ চাকমা প্রতারণা, লুক্কায়িত স্বার্থ এবং প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি", ১৯৯৭)।

তারা আরাকান বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, কেউবা আরো দূর থেকে এসেছে। তারাই অনুপ্রবেশকারী, অভিবাসী, পরদেশী, তারা এখানকার ভূমিপুত্র নয়। কোন্ সাহসে বাংলাদেশের রাজধানীতে চুক্তি করতে বসে শান্তিবাহিনী বাঙালীদেরকে নিজ দেশে 'বহিরাগত', 'সেট্‌লার' বলে অভিহিত করে এবং বাঙালীদের বহিষ্কারের দাবী তোলে? কেন সরকার এ অবস্থাকে সহ্য করে?

এখানেই শেষ নয়। এই চুক্তির মাধ্যমে আরো সমস্যা হবে। ভারতীয় চাকমারা এখানে চলে আসবে এবং চাকমা মেজোরিটি তৈরি করে কেবল "জুম্মল্যান্ড" নয়, বরং বাংলাদেশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ভারতীয় সামরিক সহায়তায় বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন "চাকমাল্যান্ড" বানিয়ে ফেলবে। বস্তুতঃ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের, গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এবং ভারতীয় এ্যানালিস্ট ও পত্র-পত্রিকার ভাষায় "জুমল্যান্ড" বদলে গিয়ে "চাকমাল্যান্ড" কথাটি এসে গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

শান্তিবাহিনীর দাবী অনুযায়ী তাদরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর একচ্ছত্র অধিকার, কর্তৃত্ব ও মালিকানা দেওয়া যায় না। এটি সংবিধান বিরোধী, মৌলিক অধিকার বিরোধী, দেশবাসীর অধিকার হরণের সামিল। ভূমির উপর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে তথাকথিত শান্তিচুক্তির ফলে রিজিওনাল কাউন্সিলের কাছে যে পরিমাণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হবে, যেসব বিষয় তাদের হাতে চলে যাবে তার ফলে সেখানে শান্তিবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। বাঙালী মুসলমান ও অন্যান্য উপজাতি নিগৃহীত হবে, হত্যা ও বহিষ্কারের শিকার হবে। পরিণামে আরো গোলযোগ, হানাহানি, গণহত্যা এবং এমনকি গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

এই চুক্তির ফলে কাপ্তাই হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্থাপনাসহ অন্যান্য বিশাল রাষ্ট্রীয় স্থাপনাসমূহ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ-খনিজ-মৎস্য সম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপস্থিতিতে চট্টগ্রামের পুরুত্ব (Thickness)-এর সুবিধা ইত্যাদি হারাবে বাংলাদেশ। ভারত সাত বোন রাজ্যের ল্যান্ড ব্লকড্ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। ঐ অঞ্চল থেকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সম্পদরাজি এক্সপ্লোর করার সুবিধা পাবে। সাত বোন রাজ্যের বিদ্রোহ দমনের সুযোগ পাবে। কলকাতা বন্দর নিয়ে ভারতের অসুবিধা দূর হবে। চট্টগাম বন্দরের উপর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারত ত্রিপুরা-মিজোরাম থেকে এসে সোজা বঙ্গোপসাগরে যাবার পথ বের করবে। বঙ্গোপসাগরের জলরাশির উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। মায়ানমারের সঙ্গে স্থলপথে বাংলাদেশের

সংযোগ সম্ভাবনা ভারতীয় প্রভাবাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের কারণে বিচ্ছিন্ন ও তিরোহিত হবে। চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতে বা যুদ্ধে চিকেন-নেক শিলিগুড়ি করিডোর হারালে বা বিধ্বস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে চীন থেকে দূরে ভারত একটি বড় পশ্চাদভূমি পাবে। সাত বোন রাজ্যে সামরিক ও অন্যান্য সরবরাহ ও যাতায়াত সে স্থল ও সমুদ্র পথে করতে পারবে এখনকার মারাত্মক অসুবিধা কাটিয়ে উঠে।

এদিকে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল সম্ভাবনাময় সম্পদরাজি হারাবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য স্থাপনাগুলি হারাবে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের খপ্পরে চলে যাবে। চট্টগ্রাম পোর্টের উপর বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ হারাবে, ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। এদিকে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন জোরালো করে ভারত খুলনার চালনা বন্দরকেও নিয়ন্ত্রণে অভিলাষী। তাহলে বাংলাদেশের থাকলো কি? বাংলাদেশ এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতের থাবায় পড়ে কাশ্মীর, সিকিম, হায়দরাবাদ, জুনাগড়, মানভাদারের অবস্থায় চলে যাবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর দিয়ে বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেইটওয়ে। দূরপ্রাচ্যেও বাংলাদেশ যেতে পারে। ওদিকে বার্মা বা মায়ানমার দিয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সম্ভাবনাময় এশিয়ান হাইওয়ে করে বাংলাদেশ সহজেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ মায়ানমারের পথে ভারতের কোনো খবরদারীরও সুযোগ নেই। এসব সুযোগ সব নষ্ট হবে শান্তিচুক্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হলে। ভারত যে কত ছোটলোকী, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিবেশীদের ব্যাপারে চণ্ড নীতি প্রদর্শন করতে পারে তার প্রমাণ তো এই মাত্র ক'দিন আগেই দেখা গেল। নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রানজিট-এর বিষয়টি চালুর দিনই ১৫ মিনিটের মাথায় বাতিল করে দিল ভারত একতরফাভাবে, গায়ের জোরে। বাংলাদেশের নতজানু সরকার বাহাদুর কিছুই বলতে পারলো না।। আর এমনটি হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় এজেন্ট শান্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তথায় আমাদের সরকারের আদৌ কিছু করার থাকবে কি? ভারতীয়রা যেমন জানিয়েছে তাদের দরকার ট্রানজিট-করিডোর, বাংলাদেশের গ্যাস-বিদ্যুৎ, চট্টগ্রাম পোর্ট, তেমনি শান্তিবাহিনীর নেতারাও, চাকমা বুদ্ধিজীবীরাও একইভাবে ভারতের পক্ষে দাবী উঠিয়েছে। এছাড়া এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ দেশের কিছু দেশদ্রোহী ভারতীয় দালাল বুদ্ধিজীবী। এই ত্রিচক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে এবং এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার, পোর্ট, বঙ্গোপসাগরের আমাদের পানি সীমাকে ভারতের দখলে নেবেই।

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তির আরেক দিক হচ্ছে, বাংলাভাষীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতে সন্তু লারমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রিজিওনাল কাউন্সিলের অনুমতি লাগবে। এটি কি এক দেশের মধ্যেই 'ভিসা' ব্যবস্থার সমার্থক নয়? অথচ আশ্চর্য, চাকমারা সারা বাংলাদেশে যেখানে ইচ্ছা যাবে, চাকরী করবে, ব্যবসা করবে, কোটার জোরে ছাত্রত্ব-বৃত্তি-চাকরী-ঠিকাদারী-ব্যবসা আদায় করবে। কিন্তু নিজ দেশে বাংলাভাষীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে পারবে না। কেন এমনটি মেনে নেওয়া হবে? বাংলাদেশ কি ভারতীয় ও শান্তি বাহিনীর হায়েনাদের কাছে গরীবের বউ, যে যখন ইচ্ছা ইজ্জত নিয়ে টান দেবে?

চাকমারা, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এখন মহানন্দে আছে। তারা এত বছর যাবৎ এককভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাখন খেয়েছে উপজাতীয় ও পাহাড়ীদের নাম ভাঙ্গিয়ে, এখন তারা ভারতেও সুবিধা পাচ্ছে, বাংলাদেশেও সুবিধা পাচ্ছে এবং এখানে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) একজন বাঙালী অপেক্ষা একুশ গুণ বেশি সুবিধা পাচ্ছে। এরপর তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের একক কর্তৃত্ব মুফ্‌তে পেয়ে ঐ অঞ্চলে "চাকমাল্যান্ড" কায়েম করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ সংবিধানের 'প্রজাতন্ত্র'-এর সংজ্ঞা, 'জাতীয়তা'র সংজ্ঞা, সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারের ৩৬ নাম্বার ও ৪২ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তারা কি উপরোক্ত অবৈধ সুযোগ ছিনতাই করতে পারে? বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে পশ্চাদপদ অংশের উন্নয়ন প্রশ্নে ২৮ (১, ২, ৩) অনুচ্ছেদ বাধা হবে না বলে যে ঘোষণা রয়েছে, সেটির সুযোগ তো চাকমারা পেতে পারে না। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা ৭২% শিক্ষিত, বাঙালীরা ২০%। কোথাও বা ১০% এরও কম। অন্যান্য উপজাতিদের সামান্য কিছু ব্যতিক্রম (মারমা) বাদে একই অবস্থা। অর্থনৈতিকভাবেও চাকমারা এগিয়ে, চাকরী-বাকরীতেও। তাহলে পশ্চাদপদ অংশ সেখানে তো বাঙালীরা; পাংখো, বোম ও অন্যরা। সুতরাং পশ্চাদপদ অংশের উন্নয়ন করতে হলে চাকমাদের নয়, পার্বত্য বাঙালী ও ক্ষুদে উপজাতিগুলিরই করতে হবে।

এছাড়া এতগুলি বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সকল থানায়, ইউনিয়নে এবং আরো পরের স্তরের যে অভূতপূর্ব উন্নতি করলো বাংলাদেশের সরকার বহু হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তার ফল চাকমারা ভোগ করে এখন কেন ঐ উন্নত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করবে? এই যে শিক্ষার হার এত বাড়লো, আধুনিকতা এলো; এই যে এত হাসপাতাল হলো, মর্টালিটি রেইট কমলো, আয়ু বাড়লো; এই যে স্কুল, কলেজ, মিলনায়তন, মার্কেট, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় স্থাপনাসমূহ হলো; এই যে স্টেডিয়ামগুলি হলো; এই যে সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি হলো; এই যে বিশাল রোড নেটওয়ার্ক হলো; এই যে কর্মের এত সংস্থান হলো; এই যে সামরিক বাহিনীর ভাষায় শান্তি রক্ষার পাশাপাশি ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, শিক্ষা, সচেতনতার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল কাজ করা হলো এবং এখনও করা হচ্ছে— এগুলির পর চাকমারা বঞ্চনার দাবি তোলে কীভাবে? বর্তমান লেখক নিজে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা কেন্দ্রগুলি এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে ঘুরে চাকমাদের অবস্থাও দেখেছেন আর সেখানকার বাঙালী ও অন্যান্য উপজাতির অবস্থাও দেখেছেন। বলাবাহুল্য, বাঙালীদের মুখে হাসি নেই। আতঙ্কে, টেনশনে, অনিশ্চয়তায় ও আসন্ন সমূহ বিপদের সম্ভাবনায় তারা পাগলপারা হয়েছে। ওদিকে দাপটের সাথে আছে চাকমারা। লেখক আরো দেখেছেন, ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৯৩, ১৯৯৫-এর তুলনায় ১৯৯৭-এ রাস্তা-ঘাট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কি অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। এত কিছুর পরও ভারতীয় চরদের, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের কল্প-কথাকে মেনে নিতে হবে কেন? ১৯৮৯ সালেই তো এরশাদ সরকার চাকমাদেরকে আইন করে স্থানীয় পরিষদ করে স্থানীয়ভাবে এত কর্তৃত্ব দিয়েছে যে, তাদের দাবির বাড়াবাড়ি আজ চরমে উঠেছে।

খাগড়াছড়ি সাবডিভিশন (বর্তমানে জেলা) মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং ১৯৭১-১৯৯২ এই বাইশ বছর ধরে আওয়ামী লীগের খাগড়াছড়ি শাখার সভাপতি আলহাজ্জ্ব দোস্ত মোহাম্মদের ভাষায়, ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে চাকমাদের বিপরীতে তিনি যেন "মমি করে শো-কেসে রাখা" অবস্থায় ছিলেন (বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ — খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউস, ৩০/৯/৯৭)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপন চুক্তির মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তথায় অত্যন্ত গভীর অরণ্য ও পাহাড়ী অঞ্চলের ও সীমান্ত প্রদেশের ভূখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে খুবই জরুরী ৭৩টি হেলিপ্যাডের অবস্থা কি হবে? বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একবার ফিরে এসে যাতে সেখানে না যেতে পারে, সেজন্যে হেলিপ্যাডগুলিই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারপর পায়ে হেঁটে বা যেভাবেই হোক সেনাবাহিনী সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করলে এ্যামবুশ করে শেষ করা হবে। পিছনে কাভার দেবে ভারতীয় সেনাশক্তি।

আবার, শান্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব পেলে খাগড়াছড়ি জেলার পশ্চিম পাশে ভারতের ত্রিপুরা বর্ডারের ২৩৭ কিলোমিটার; রাঙামাটি জেলার পূর্ব পাশে ভারতের মিজোরাম বর্ডারের ১৭৬ কিলোমিটার— এ বিশাল এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ওদিকে রাঙামাটি জেলার কিছু অংশ এবং বান্দরবান জেলার পূর্ব পাশে মায়ানমারের সাথে যে ২৮৮ কিলোমিটার বর্ডার, সেটিও কন্ট্রোল করবে শান্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাশক্তি। খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় থানার ফেনী নদীর ৩০/৩৫ ফুট পানি-সীমার ওপারের দিক থেকে ভারতীয় সামরিক শক্তি অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ পাবে। তাই, কীভাবে বাংলাদেশের আওয়ামী সরকার এ আত্মঘাতী চুক্তি স্বাক্ষর করছে, তা বোঝা দুষ্কর। মনে রাখতে হবে, চোরাচালানী, অস্ত্র আনাগোনা, নারী পাচার, ড্রাগ ট্রাফিকিং — এ অবস্থায় চরমে পৌঁছাবে। বাংলাদেশ হবে এক শকুনের ভাগাড় — পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে।

শান্তিবাহিনীর ৪৫টি সশস্ত্র অবস্থান বা ক্যাম্প এখন ঘিরে আছে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং পরোক্ষভাবে কিছুটা দূর থেকে হলেও বান্দরবানের বর্ডারিং এরিয়ার সন্নিকটস্থ ভারতীয় অংশ থেকে। এগুলি দিয়ে তখন ভারতীয় সেনাশক্তি বাংলাদেশে ঢুকবে। শান্তি বাহিনী এবং ভারতের শান্তিবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকরা (যেমন তথাকথিত হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরাম) এখনই সরাসরি ভারতীয় হস্তক্ষেপ দাবি করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে। বোঝাই যায়, চুক্তির পর শান্তি বাহিনীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এলে এদের চাপ কি পরিমাণ বাড়বে।

প্রকাশ্যে শান্তিচুক্তি হবার আগেই বেশ কিছু দিন (গত কয়েক বছরের হিসাবগুলি বাদ দিয়ে) ধরে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, রামগড়, মানিকছড়ি, পানছড়ির বাংলাভাষী মুসলমানদের উৎখাত করে, এ দেশের আসল নাগরিকদের বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, বাগান-পুকুর, দোকান-পাট থেকে উচ্ছেদ করার কাজ চলছে নিষ্ঠুরভাবে। সম্পত্তিশূন্য, কপর্দকহীন, ঘরবাড়ী হারা হয়ে যাচ্ছে বাংলাভাষীরা। হাজার হাজার পরিবার, রাতারাতি আশ্রয়হীন ভিক্ষুক হয়ে যাচ্ছে। এরা গুচ্ছগ্রামে মানবেতর জীবনে যাচ্ছে বা বহিষ্কৃত হচ্ছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা থানা এলাকা থেকেও বাঙালীদের ব্যাপক হারে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরা থেকে আগত উপজাতীয় শরণার্থীদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাঙালী শাসন কর্তৃপক্ষই শান্তির নামে শান্তিবাহিনীকে খুশী করতে একাজ করছেন। এ-ও দেখা যাচ্ছে, এমন উপজাতীয়কে এমন জায়গায় নির্দ্বিধায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে সে আদৌ ছিল না। তাছাড়া ভারতের অনেকেও এ সুযোগে চলে আসতে পারছে। এছাড়া এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটিতে মসজিদ দখল হচ্ছে, মাদ্রাসা দখল হচ্ছে। চাকমারা এসব করছে। তারা বলছে মসজিদ ভেঙ্গে কিয়াং বানাবে।

দেখা যাচ্ছে, শান্তিবাহিনীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার আগেই বাঙালীরা যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিষ্ঠুর উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে, তাহলে শান্তিবাহিনীর দখল এসে গেলে তা যে কোন্ মাত্রায় উঠবে, সেটি সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাভাষী ও মুসলমান-মুক্ত হতে যাচ্ছে। এরপর যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হয় রিজিওনাল কাউন্সিলের কর্তৃত্বে; যদি শান্তিবাহিনীর দাবী মোতাবেক চুক্তিতে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাদের কর্তৃক পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত নিয়োগ দানের অধিকার, তাহলে আর দেখতে হবে না। শান্তিবাহিনীর সদস্যরাই অচিরে সাব-ইন্সপেক্টরসহ পুলিশের পদসমূহ দখল করে সম্পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতীয়দের উপর, বাংলাভাষী মুসলমানের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তাদেরকে নিধন অথবা বহিষ্কারের কাজ সম্পাদন করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী এত দিনও চাঁদা আদায় করছিলো কোটি কোটি টাকা। এখন তারা রীতিমতো ট্যাক্স কালেক্ট করছে। প্যারালাল গভর্নমেন্ট বসেছে সন্তু লারমার। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ির দুদুকছড়িতে এখন সন্তু লারমার শান্তিবাহিনী সরকারের রাজধানী চলছে। আর ঢাকায় চলছে অবশিষ্ট বাংলাদেশের রাজনীতি। দৈনিক ইনকিলাবের এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে এমন চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে (১৮ নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্যবাহিনীও উইথড্র করা হচ্ছে। সরকার যেমন বলছেন সংবিধান লঙ্ঘন করে কিছু করবেন না এবং চুক্তি হবেই, অথচ বাস্তবে সংবিধানকে পদদলিত করছেন; তেমনি সরকার মুখে অস্বীকার করলেও বাস্তবে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন ধরে। রাঙামাটির বরকল, খাগড়াছড়ির লোগাং, খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙা, সদর থানার কুমিল্লা টিলা, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, মারিস্যার সেনা ক্যাম্প এবং বান্দরবান জেলার কিছু সেনা চৌকি তুলে নেওয়া হচ্ছে। আরো অনেক প্রত্যন্ত প্রদেশে থেকে সেনা প্রত্যাহার চলছে। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, দুদুকছড়ি ও পানছড়ি থেকে ১৩টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ জন্যেই এসব জায়গায় শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির হাজার হাজার সশস্ত্র সদস্য অবস্থান নিয়েছে। সন্তু, রূপায়ন, উষাতন চালাচ্ছে দুদুকছড়ি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব। পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও অন্যান্য সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিও আছে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জলপাই রঙের সামরিক পোশাক পরে ঘোরা-ফেরা করছে। দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে-"পানছড়ির দুদুকছড়িতে ভারতের উর্ধ্বতন

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সেনা বিশেষজ্ঞরা অবস্থান নিয়ে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছে এবং বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও রণকৌশলগত দিক নির্ণয় করছে"। মাটিরাঙায় শান্তি বাহিনীর দখল খুবই পোক্তভাবে হয়েছে। ইউনিয়ন নির্বাচন তারা কন্ট্রোল করছে। মাটিরাঙা থানার শহরের পাশে ওয়াসু, সাতমারা,তৈ কাথাং ও দলদলি মৌজা সম্পূর্ণ শান্তিবাহিনীর দখলে চলে গেছে (দৈনিক দিনকাল, ২১ নভেম্বর ১৯৯৭। মাটিরাঙা সীমান্ত থেকে প্রেরিত প্রফুল্ল দত্ত এবং অলি আহমদের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য) এদিকে খাগড়াছড়ি থেকে আরো আট হাজার বাঙালী পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। বাঙালীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে (দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৭। লীড এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

এমতাবস্থায় বর্তমান লেখকের মনে পড়ছে ০১-১০-৯৭ তারিখ রাঙামাটির কাপ্তাই লেইক পেরিয়ে ইসলামপুর নামক মানবেতর গুচ্ছগ্রামে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়ে আসা মানুষদের ভীড়ে মোসলেম খাঁ (ক্ষুদে ব্যবসায়ী)-এর উক্তি। তিনি বলেছিলেন, শান্তি চুক্তির পরও বিপদ হবে। সরকারের শান্তিচুক্তি নিয়ে তাদের সন্দেহ রয়েছে। তিনি ও তার সঙ্গে লোকেরা প্রশ্ন রেখেছিলেন, সরকার কেন বাঙালীদের, মুসলমানদের বাদ দিয়ে কেবল শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করছে। তারা উপজাতি-বাঙালীর সমতার দাবি তুলেছিলেন আলাপ চলাকালে। যাহোক, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার প্রসঙ্গে মোসলেম খাঁর উক্তি ছিল ঃ "সেনাবাহিনী চলে গেলে পাবলিক কেন, কুকুরও থাকতে পারবে না" (লেখকের সঙ্গে আলাপকালে, ০১-১০-৯৭ তারিখে রাঙামাটির ইসলামপুর গুচ্ছগ্রামে)।

আজ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে হবার আগেই, সামরিক বাহিনী খানিকটা প্রত্যহার করতে না করতেই বাঙালীদের উপর অত্যাচার চরম মাত্রায় পৌঁছেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, ঠিকাদার, বাস-ট্রাক-টেম্পো-মটর সাইকেল সবকিছু থেকে পুরোদস্তুর নিয়মিত ট্যাক্স উঠানো হচ্ছে আগের চেয়েও বেশি। কোনো ট্রাক-বাস আজ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটিতে চলতে পারে না। শান্তিবাহিনীর টোকেন ছাড়া। দুদুকছড়িতে শান্তিবাহিনীর সচিবালয় বসেছে (দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৭)।

এরপর অচিরেই যদি চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে যায়, তাহলে পার্বত্য মুসলমানরা, বাংলাভাষীরা সেখানে থাকতে পারবে না একেবারেই। সন্তু, রূপায়ন উষাতনই নয়; লিয়াজোঁ কমিটির নেতা হংসধ্বজ চাকমা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা, রিফিউজী রিহেবিলিটেশন টাস্ক ফোর্সের নেতা অক্ষয় কুমার চাকমাই নয়; নয় কেবল প্রসীত খীসা, সঞ্চয় চাকমা। এদের থেকে শুরু করে খাগড়াছড়িতে বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ কালে মেজর জয়েস চাকমাও এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন (৩০/৯/৯৭ তারিখ সকালে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে)। শান্তিবাহিনীর উপরস্থ ও অধীনস্ত সকল সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদীই মুসলমান ও বাংলাভাষী-মুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আদতে তাদের স্বাধীন জুম্মল্যান্ড বা চাকমাল্যান্ড গঠনে বদ্ধপরিকর। লক্ষণীয় যে, জনসংহতির আদি পাঁচ দফার মধ্যে ছিল ৪৭ দফা বিস্তৃত দাবী। এখন ঐ মূল পাঁচ দফা উনিশ দফা পর্যন্ত গড়িয়েছে। দিনে দিনে নিত্য নতুন দাবি উঠাচ্ছে তারা। অতএব, যদি অশুভ চুক্তি করে ফেলা হয়, যদি শান্তিবাহিনীর কাছে মাথানত করা হয়, যদি ভারতীয়

চক্রান্তের বাস্তবায়ন ঘটানো হয় পূর্ণ মাত্রায়, যদি শান্তিবাহিনী নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া হয়, যদি সন্তু পায় মন্ত্রীর মর্যাদা, যদি পুলিশ ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর তাদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদি বাঙালী উচ্ছেদ অব্যাহত থাকে, যদি শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র সমর্পন পুরোপুরি না ঘটে, যদি সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তাহলে এত কিছুর পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের থাকবে, ভারতীয় কব্জায় যাবে না— এমনটি ভাববে কেবল আকাট মূর্খ বা অতি মতলববাজ কেউ।

কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবার আগে এই শেষ মুহূর্তে হলেও দেশবাসী এগিয়ে আসুন। প্রতিরোধ করে, লড়াই করেই রক্ষা করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে। সর্বোচ্চ গণ প্রতিরোধ সংগ্রাম ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ্ হাফিজ।

রজব ১৪১৮ হিজরী, অগ্রহায়ণ ১৪০৪ বাংলা, নভেম্বর ১৯৯৭ ঈসায়ী।

পার্বত্য জেলা বাঙালী ছাত্র আন্দোলন পরিষদ-এর 'রক্তাক্ত জনপদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ। জাতীয় প্রেস ক্লাব, ভিআইপি লাউঞ্জ, ২৪ নভেম্বর ১৯৯৭, সোমবার, বিকাল ৩-৩০।

সাপ্তাহিক বিক্রম, একাদশ বর্ষ শুরু সংখ্যা, ২-৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ শান্তিবাহিনী ও ভারতীয় অবৈধ সংযোগ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

ভারতীয় অবৈধ সংযোগ ঃ পিছন থেকে আজ অবধি

পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিরাগত উপজাতীয়রা বিশেষতঃ চাকমারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এর বিরোধিতা করেছিল। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান পাকিস্তানের সঙ্গে নয়, বরং হিন্দু ভারতের সঙ্গে যুক্ত দেখতে ও করতে চেয়েছিল। আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায়সহ চাকমাদের মূল অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। চাকমাদের এই আপাতঃ পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ভূমিকায় এক পরম্পরা ও সঙ্গতি ছিল। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তান থেকে সেকালে এবং বাংলাদেশ থেকে একালে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতার আবরণে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ভারতের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল একমুখী। অর্থাৎ ভারতের অবৈধ সহায়তা নিয়ে হয় বিচ্ছিন্ন-স্বাধীন হওয়া, নতুবা ভারতের সাথে মিশে যাওয়া।

এটি আজ ইতিহাস যে, বহু দাবির ফলে লব্ধ ১৯০৫-১৯১১ এর পর্যায়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত এতদঞ্চলের মুসলমানদের বৃহত্তর সত্তাকে ধ্বংস করেছে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু চক্র ও কংগ্রেস, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির চরম প্রাধান্যশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত হয়নি লেজিসলেটিভ এসেমব্লিতে বারংবার ভোটে সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও কেবলই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের সঙ্গে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ, ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন ও বিশেষতঃ লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর সম্পর্ক, যোগাযোগ ও শেষোক্ত জনের প্ররোচনায় লেডি কর্তৃক তার স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তারের প্রেক্ষাপট, মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল করার উৎকোচসহ বাউন্ডারী কমিশনের স্যার সিরিল রেডক্লীফের ভূমিকা ইত্যাদির কারণে। কেবল অসম্পূর্ণ পাকিস্তানই নয়, 'মথ ইটেন এ্যান্ড ট্রাংকেটেড' বাংলাদেশও আমরা ১৯৪৭ সালে পেয়েছি যুগপৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ ও হিন্দু ব্রাহ্মণবাদী দলের ভূমিকার কারণে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রক নেহরু অবশ্য ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তার বক্তব্য ও পত্রে একথা না

লুকিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, বিভক্ত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বাংলা তারা মেনে নিয়েছেন কেবল ঐ পথেই পুনরায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন বলে।

আর বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা নেতারা ঐ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা কর্মসূচীরই সহায়ক শক্তি। একথা এরা তাদের গৃহীত অবস্থান, ভূমিকা, আচরণ এবং পূর্বাপর যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড দ্বারা একেবারেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই অবস্থা অবশ্যই বরাবর দ্বিমুখী সূত্র ও সহযোগিতাই নির্দেশ করেছে। যেমন চাকমারা উৎসাহ প্রদর্শন ও তৎপরতা চালিয়েছে, তেমনি সহযোগিতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত মাতব্বরী প্রদর্শন করেছে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের প্রতিটি সরকার একের পর এক সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আজ ১৯৯৭ সাল অবধি।

ঊনিশ শত চল্লিশের দশকের শুরু থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন অনেক উপজাতীয় নেতা দিল্লী, বোম্বে (মুম্বাই) ও কলকাতা সফর করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাকমা নেতা দু'জন ছিলেন স্নেহ কুমার চাকমা এবং কামিনী মোহন দেওয়ান। এ দু'জন নেতা কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, আচার্য কৃপালিনী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুলেছিলেন। এ সময় কংগ্রেস নেতা এ.বি. ঠক্কর সহ অন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিধিদল নিয়ে এসে সেখানকার উপজাতীয়দের ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে প্রকাশ্যে প্রবল প্রচারণা চালায়। কিন্তু একদিকে কংগ্রেস ভারতের পক্ষে আরও অনেক সুযোগ রেডক্লীফের সীমানা কমিশন থেকে হাতিয়ে নেওয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরাসরি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৬ সালে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চাকমা উপজাতীয় নেতারা "The Hillmen Association" গঠন করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি উঠান যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে একান্তই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলে যেন কুচবিহার, ত্রিপুরা, খাসিয়ার ন্যায় রাজা-শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে একটি আলাদা কনফেডারেশন গঠন করা হয়, যেটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত হবে।

যাহোক, স্যার সিরিল রেডক্লীফ এওয়ার্ড বা রেডক্লীফ রোয়েদাদ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম তৎকালীন পূর্ব বাংলার সঙ্গে থেকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেই থেকে আজ অবধি চাকমা নেতারা বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেনি। ষাটের দশকে কাপ্তাই হ্রদ প্রকল্প সৃষ্ট সমস্যার সমাধান প্রয়াস সত্ত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কাজ সত্ত্বেও চাকমা নেতারা নিজেদেরকে এ অঞ্চলের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত করেনি। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধিতাও সেজন্যে ঘটেছে তাদের তরফ থেকে। আর চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তো ব্যক্তিগতভাবে আজো পাকিস্তানপন্থী। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশী জাতিসত্তার বদলে বাঙালী জাতিসত্তার বিষয়টিকে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা দিলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (১৯৭২-৭৫ এ সংসদ সদস্য) এর প্রতিবাদ করেন, শেখ মুজিবের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যান, স্মারকলিপি দেন। এসব প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনকালেই আন্ডারগ্রাউন্ড-এ গিয়ে

১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী তারিখে সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। সেই ১৯৭৩ সালেই এই শান্তিবাহিনী মোকাবিলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের শৃঙ্খলা, অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্যে শেখ মুজিব বিধি করে তথায় পুলিশ ডেপ্লয় করেন। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব সরকার আর্মী ডেপ্লয় করেন, যা আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে (দ্রষ্টব্য— "The Chittagong Hill Tracts : Falconry In The Hills", Edited by Khaled Belal. Compiled by Mirza Zillur Rahman and G. M. Mesbahuddin Bahar, Chittagong, March, 1992, p.20)। এছাড়া দেখুন, সুনীতি বিকাশ চাকমা, রণবিক্রম ত্রিপুরা, চা থোয়াই অং মারমা, আবদুল অদুদ ভুঁইয়া সম্পাদিত, "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামঃ এখনো ষড়যন্ত্র— আজকের প্রেক্ষাপট ও কিছু কথা", চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ২১-২২)। শেখ মুজিবের ভ্রান্ত নীতির কারণে, উগ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে চাকমা সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গড়ে উঠলেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দিতে যাননি। যদিও তার সরকার মুজিব বাহিনীর শেখ মণির সহযোগিতামূলক কাভার দিয়ে ভারতীয় জেনারেল উবান ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-কে পার্বত্য চট্টগ্রামে "অপারেশন ঈগল" চালাতে দিয়ে একদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের দমনে সহায়তা দিয়েছেন, অন্যদিকে ঐ অপারেশনের সুযোগে চাকমা ইনসার্জেন্টরা ভারতীয়দের সহানুভূতি, সহযোগিতা, পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রের বখরাসহ বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন চালানোর ক্ষেত্র তৈরির উপযোগী প্রেক্ষাপট পেয়েছে। যদিও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম. এন. লারমা) ১৯৭৫ সালে বাকশালেও ঢুকেছিলেন এবং এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্য এগিয়ে নিয়ে যাবার মতলবে ছিলেন, তথাপি ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্টের পটপরিবর্তনের পর তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ১৯৭২-৭৫-এ নিজেদের তাঁবেদার সরকার থাকায় ভারত এম. এন. লারমাকে ও শান্তিবাহিনীকে হাতে রেখেও বেশি বাড়তে দেয়নি। ১৯৭৫-এর অগাস্টের পর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী অনুভূতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা-নীতি-সিদ্ধান্ত-কর্মকাণ্ড-বৈদেশিক নীতি এবং ভারতের কাছ থেকে পানি, অস্ত্র, সম্পদ, সীমানাসহ যাবতীয় বিষয়ে ন্যায্য হিস্যা লাভ– এসব ব্যাপারে স্বাধীন, সম্পন্ন, স্বাতন্ত্র্যসূচক মোড় পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারত শান্তিবাহিনী ও লারমা নামক তুরুপের তাসকে ব্যবহার করা শুরু করে জোরেশোরে। যদিও ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৭ — এই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার বহু হাজার কোটি টাকা (২২ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা) ব্যয় করেছে; সম্পদ, মানব সম্পদ, সুযোগ, দক্ষতা ইত্যাদি প্রযুক্ত ও ব্যবহার করে, কাজে লাগিয়ে আজকের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন এনে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয়েছে ওখানকার বাংলাভাষী বাঙালী মুসলমান জন অংশ এবং পুরো জাতিকে বঞ্চিত করে।

তবুও বিচ্ছিন্নতার ষড়যন্ত্র এবং শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, লুটপাট, হত্যা আর ভারতীয় স্বার্থ সংযোগ তিরোহিত হয়নি। বরং তা ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আজ মহীরুহ হয়ে গেছে রাতরাতি। ১৯৯২-এর দিকে পার্বত্য অঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাস-অত্যাচার, ভারতে বাধ্যতা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে

তাড়িয়ে নেওয়া রিফিউজী বা শরণার্থীদের প্রতারিত হবার বোধ ও মরণাপন্ন অবস্থা, বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমা ঘোষণা ও অভূতপূর্ব সুযোগের পুনর্বাসন কর্মসূচী, পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর শান্তিরক্ষা কৌশল ও চাপ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যৌথ ফল, শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও খুনোখুনি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তথায় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও শান্তিবাহিনী অলমোস্ট ডাই-ডাউন করছিল। এসময় শান্তিবাহিনী একতরফা সীজফায়ারের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

সেই মরণ দশা থেকে, বিরোধী দলের ভাষায়, ভারতীয় সহায়তায়, আমলা বিদ্রোহের সমর্থনে এবং স্রেফ ভোট ও নির্বাচন জালিয়াতি করে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ নতুন করে শান্তিবাহিনী, জনসংহতি ও সন্তু লারমা গোষ্ঠীকে নবজীবন দেয়। ভারতীয় স্বার্থে ও নির্দেশে এবং নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা-স্বার্থ রক্ষার তাগিদে জামাই আদর করে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে এনে গোপন চুক্তি করে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্তিবাহিনী তথা ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভারত তার সাতবোন রাজ্যে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে যেভাবে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন দমাচ্ছে কেবল নিষ্ঠুরভাবে, ঠিক তেমনি উল্টোভাবে বাংলাদেশে চাকমা বিচ্ছিন্নতা বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে এবং আরো বেশি কূটকৌশল, প্রতারণা, মিথ্যাচার, গায়ের জোর আর আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ভঙ্গ করে সমর্থন দিচ্ছে। আর এদেশে ভারতের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ সরকার ভারতীয় নির্দেশে ও যোগসাজশে চাকমা বিদ্রোহীদের সাথে গোপন চুক্তি সেরে ফেলছে।

পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, কামিনী মোহন দেওয়ান, স্নেহ কুমার চাকমা কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ভুক্তির স্বপ্ন ছেড়ে দেননি। ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলে ভারতীয় কংগ্রেস নেতা এ. বি. ঠক্করের প্ররোচনায় রাম-রাজত্বের মোহে উম্মাদ চাকমা নেতারা রাঙ্গামাটিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের সামনে ভারতীয় অশোকচক্রের পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় কি ঘটে তা একজন চাকমা লেখকের ভাষায় শোনা যাক্ ঃ "এত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতীয় পতাকা উড়ানো হলেও সঙ্গে সঙ্গেই রশির গিঁট খুলে নিজেই পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। ফ্ল্যাগ পোল থেকে নিজে নিজে খুলে পড়ায় সেদিন অনেকেই বলেছিলেন — মনে হয় এই মাটিতে ভারতীয় পতাকা কোনোদিন উড়বে না। অগত্যা এক তরুণ বালকের বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার মত কয়েকবার চেষ্টা, পরিশেষে তিন চার গিট দিয়ে ভারতীয় পতাকা উড়ানো নিশ্চিত করলেও এ. বি. ঠক্কর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারেননি" (এস. বি. চাকমা, "উপজাতীয় নেতৃত্ব ঃ সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিকথা")। এ সময় তিনদিন ধরে রাঙামাটিতে ভারতীয় পতাকা উড্ডীন থাকার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এসে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে তথায় পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে। এ সময় উপজাতীয় নেতারা বিশেষত চাকমা নেতারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহকরতঃ স্বল্পকাল মধ্যে ভারতে আশ্রয় নেন।

কাজেই সেই যে ১৯৪৭ সাল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতভুক্তির স্বপ্ন ছিল কংগ্রেস নেতা ও চাকমা নেতাদের মনে, মগজে ও কাজে, সেই স্বপ্নই এম. এন.

লারমার পথ ধরে আজ তারই ছোট ভাই সন্তু লারমার এবং শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

আরেকজন চাকমা লেখক প্রদীপ খীসা শান্তিবাহিনীকে পুরোপুরি সমর্থন করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনকে সমর্থন করেও খুবই খোলাখুলি জানিয়েছেন যে, চাকমা শান্তিবাহিনী (এসবি) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস বা পাচজসস) ভারত-নির্ভর, ভারতে আশ্রয় লাভকারী, ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা লাভকারী এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing) -এর সমর্থনপুষ্ট। ১৯৭৫-এর ঘটনার পর RAW নিজেই নাকি জনসংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। RAW-এর সমর্থনের ফলেই নাকি 'লম্বা গ্রুপ' (দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী) বা 'লারমা গ্রুপ' শক্তিশালী হয় এবং 'বেঁটে গ্রুপ' (স্বল্পমেয়াদী লড়াইয়ে বিশ্বাসী) বা 'প্রীতি গ্রুপ' কোণঠাসা হয়ে 'হতাশার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়' (প্রদীপ্ত খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, অগাস্ট ১৯৯৬, পৃঃ ৫০-৫৬)।

সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের উপদেষ্টা এবং বর্তমানে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ভারতের ত্রিপুরাকেন্দ্রিক নেতা আর শান্তিবাহিনীর সঙ্গে গোপন চুক্তির ব্যাপারে বিরাট মাতব্বর উপেন্দ্র লাল চাকমা এবং ভাগ্যচন্দ্র চাকমা কলকাতার মাসিক "আলোকপাত" পত্রিকায় পরিষ্কার জানিয়েছেন, তারা কি চান। তারা প্রকাশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির জন্যে তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছেন। তাদের ভাষায়ঃ

"স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মুজিবকে এত সাহায্য করল ভারত। অথচ আমরা (চাকমারা) প্রো-ইন্ডিয়ান বলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ দুই সরকারই আমাদের উপর অত্যাচার করল। দেশভাগের সময় নেহরুকে এত অনুরোধ করলাম, আমরা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য, নেহরু শুনলেন না; '৭১-এ ইন্দিরা গান্ধী পারতেন অন্তত চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে; তাও করলেন না। অথচ 'ভারতকে ভালবাসি' শুধু এই কারণেই চাকমাদের এত দুর্দশা" (মাসিক আলোকপাত, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এখানে "চাকমাদের এত দুর্দশা" কথাটি কেবল সর্বৈব মিথ্যাচার। কেননা এতগুলি বছর যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে প্রদত্ত যাবতীয় সম্পদ ও কোটার সুযোগ থেকে সবচেয়ে বেশি মাখন উদরস্থ করেছে চাকমারাই, বাঙালী ও অন্যান্য উপজাতিকে বঞ্চিত করে।

যাহোক, আরো উল্লেখ্য যে, সাতচল্লিশ সালের ১৫ অগাস্ট দেশ বিভাগের সময় 'চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা উড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, আমরা হিন্দুস্থানের সঙ্গে থাকতে চাই, পাকিস্তানের সাথে নয়'। সেই একইভাবে ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তৎকালীন চাকমা নেতারা চেয়েছিলেন 'যদি ভারতের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে দেওয়া যায়' (মাসিক আলোকপাত, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ভারত ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সম্পৃক্ততা ঃ বহু চিত্র, স্বীকারোক্তি ও বিশ্লেষণ

চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী কেন্দ্রীয় নেতাদের, শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির নেতাদের, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রধান এবং পার্বত্য গোপন চুক্তির ক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়ায় অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা ও অপর নেতা ভাগ্যচন্দ্র চাকমার স্পষ্টতম স্বীকারোক্তি কলকাতার পত্রিকা থেকে পাঠ করার পরও কি কারো কোনো সন্দেহ আছে যে, শান্তিবাহিনী, জনসংহতি, পার্বত্য ছাত্র পরিষদ, হীল ওমেন এসোসিয়েশন, গণ লাইন, গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রাপ) কি চায়! জনসংহতির পাঁচ দফা, এর ভিতরের সাতচল্লিশ দফা, এর পর নিত্য-নতুন দেওয়া আরো বহুবিধ ও বহু সংখ্যক দফা-দাবী মিটিয়ে গোপন চুক্তি যা সমাধা হচ্ছে, সেটির খবর আজ ০২/১২/৯৭ তারিখের আওয়ামী লীগ সরকারের অন্ধ সমর্থক 'ভোরের কাগজ', 'জনকণ্ঠ', 'আজকের কাগজ', 'সংবাদ'সহ সরকার বিরোধী 'ইনকিলাব', 'দিনকাল', 'সংগ্রাম'-এ প্রকাশিত হয়েছে। 'ভোরের কাগজ' "চুক্তিতে যা থাকছে" শিরোনামার রিপোর্টে যথেষ্ট বিস্তারিত জানিয়েছে। এরপরও কেউ যদি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিবাহিনী তথা ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে তিনি হয় মূর্খ, নচেৎ মতলববাজ। স্বয়ং সন্তু লারমা, রক্তোৎপোল, রূপায়ন দেওয়ান—এরাই খুশীতে বাগ্ বাগ্ হয়ে চুক্তি সম্পর্কে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলেছে।

এরশাদের ১৯৮৯ সালের আইনের মাধ্যমে বিরাট কনশেসনের পর এবার জনসংহতির পাঁচ দফা, এর ভিতরের সাতচল্লিশটি উপ-দফা, নতুন দফা-দাবী—সবকিছু খুব ভালভাবে মেনে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এসব কিছু করা হয়েছে গণতন্ত্র ও জাতীয় সংসদকে শেষ করে দিয়ে, সংবিধানকে পদতলে পিষ্ট করে, মৌলিক অধিকারকে ধ্বংস করে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, গায়ের জোরে, গোপনে, জিদে ও অজ্ঞতায়, ভারতকে তুষ্ট করে ক্ষমতায় থাকার অভিলাষে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শান্তিবাহিনীকে যে ভারতই আশ্রয়, অর্থ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, সমর্থন, প্রচার সুযোগ, বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ দেওয়া, ভারতীয় বিএসএফ-এর কাভার, ভারতীয় 'র'-এর তত্ত্বাবধান ও সমর্থন ইত্যাদি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর শান্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়ে সে অঞ্চল ও চট্টগ্রাম বন্দরকে নিজে কব্জা করতে চাচ্ছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় যোগাযোগ, এক্ষেত্রে ভারতীয় সমর্থন, তত্ত্বাবধান, উসকানি ও কাজে লাগানোর বহু প্রমাণ রয়েছে।

চিন্ময় মুৎসুদ্দী তার বইয়ে জানান, ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ভারতের তাবেদার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের উৎখাতের পর থেকেই ভারত সরাসরি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তার ভাষায়, "ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহী হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে যোগাযোগ করল। . . . . . . লারমা কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় এসে আত্মগোপন করলেন" (চিন্ময় মুৎসুদ্দী, "অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা

বাজার, ১৯৯২, পৃঃ ১৪)। এ প্রসঙ্গে আরেকজন লেখক জানান, "With the political change-over in mid-1975 M.N. Larma went underground and crossed over to India to lead the armed insurgency" (M.R. Shelley, General Editor, "The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story", Dhaka: Centre For Development Research, December1992, p. 22)। একইভাবে চিটাগাং হীল ট্র্যাক্টস কমিশনের ভাষায়, "It is widely Known that the Indian Government of Indira Gandhi gave active support to Shanti Bahini insurgents allowing them to operate from bases in India" (Life is not our's : Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, p.16).।

ভারত যে শান্তিবাহিনীকে পুষছে; সমর্থন, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিচ্ছে ; শান্তিবাহিনী যে সন্ত্রাস চালিয়ে, জোর করে চাকমাদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে ত্রিপুরা ও মিজোরামে শরণার্থী ক্যাম্পে ভারতীয় খবরদারীতে আটকে রাখছে এবং সেখান থেকে বাধ্যমূলকভাবে রিক্রুট করছে শান্তিবাহিনীর সদস্য, তা আর গোপন কোনো বিষয় নয়। "The Chittagong Hill Tracts : Falconry in the Hills" গ্রন্থের (Edited by Khaled Belal. Compiled by Mirza Zillur Rahman and G.M. Mesbahuddin Bahar, Chittagong March 1992) পাতায় পাতায় তার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। এ জন্যে দেখা যায় ঐ বইয়ের পৃষ্ঠাঃ ১০-১১, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৬,৫৮, ৭৭, ৮২, ৮৬-৮৭, ৯১, ১০২, ১০৬।

উপরে উল্লিখিত বইয়ে প্রকাশিত সৈয়দ মর্তুজা আলীর প্রবন্ধের শিরোনামা হচ্ছে ঃ "Shanti Bahini : Name of an Across-Border Conspiracy." এতে বলা হয় যে ঃ "It is needless to mention that the Shanti Bahini continue to thrive so long they receive assistance and other logistic support from the neighbouring country (A Monthend Newspaper ORATION, 2 February 1992, p. 56 of the present book).

সাপ্তাহিক সুগন্ধার ৭ অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যায় শান্তিবাহিনী যে ভারতপন্থী তা জানানো হয়েছে। দৈনিক মিল্লাতের ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যায়ও শান্তিবাহিনী যে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে এবং ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। দৈনিক মিল্লাতের ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যায়ও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। দৈনিক সংগ্রামের ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যায় ভারতের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর যোগাযোগের reference রয়েছে। সাপ্তাহিক আগামী-এর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ "শান্তিবাহিনীর সদস্যরা উপজাতিদের জোর করে সীমান্ত পার করে ভারতে নিয়ে যেতে থাকে। এতে তাদের দু'টি ফায়দা হলো (এক) শরণার্থীদের দেয়া খাদ্য ও অর্থের সিংহভাগ তারা পেতো, (দুই)

বিশ্বের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারলো যে, তাদেরকে বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা ভারতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা জোরদার করে" (দ্রষ্টব্য ঃ ঐ)। সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ-এর ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্পষ্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরায় কীভাবে শান্তিবাহিনীর নেতারা বাড়ী-ঘর বানিয়েছে। পত্রিকায় আরো জানানো হয়েছে ঃ "সেই উপেন্দ্র বাবু (উপেন্দ্র লাল চাকমা) এখন শান্তিবাহিনীর নেতা হিসেবে সীমান্তের বাইরে অবস্থান নিয়েছেন" (সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১)।

দৈনিক সংগ্রামের ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সংখ্যার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ "প্রথমে শান্তিবাহিনী তৎপরতা শুরু করে স্থানীয়ভাবে তৈরী অস্ত্র নিয়ে। পরে ভারতে তৈরী চেক রাইফেল থেকে শুরু করে মেশিনগান পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তাদের সরবরাহ করা হয়। যখনই তারা নতুন অস্ত্র পেয়েছে তখনই তাদের হামলা ও হত্যাকাণ্ড বেড়েছে"।

"নিরাপত্তা বাহিনী সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় এবং জনসমর্থন হ্রাস পাওয়ায় শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অবস্থান এখন সীমান্তের ওপারে ও গহীন জঙ্গলে"।

সাপ্তাহিক সন্দ্বীপের ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় "শান্তিবাহিনী দমনে ভারতীয় সহযোগিতা প্রয়োজন" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

"কয়েকশ' শান্তিবাহিনীর সদস্য কি করে গোটা পার্বত্য এলাকাকে অশান্ত করে দেয়, তছনছ করে আজ এটাই প্রশ্ন। তাদের মোকাবেলা করার জন্য হাজার হাজার নিরাপত্তা কর্মী তৎপর। বছরের পর বছর তারা সেখানে নিয়োজিত। অনেক নিরাপত্তা কর্মী প্রাণ দিয়েছেন শান্তিবাহিনীর হাতে।.... শান্তি বাহিনীর ভয়ে এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ২৫ হাজার চাকমা আশ্রয়রত। ভারত দাবী করে এর সংখ্যা ৫৭ হাজার। বাংলাদেশ বলেছে মোটেও ঠিক নয়। শান্তিবাহিনী সুকৌশলে চাকমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তারা এ থেকে ফায়দা নিতে চায়। এর পেছনে রয়েছে ভারতের প্রত্যক্ষ কারসাজি। ভারতের সহযোগিতা না পেলে শান্তিবাহিনী একদিনও টিকে থাকতে পারবে না। ভারত তাদের প্রশিক্ষণ দেয়, খাবার দেয়, অর্থও যোগান দেয়। রাজনৈতিক প্রচারণা চালানোর সুযোগও দেয় তারা। ভারত ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে চাকমাদেরকে বিদেশে পাঠায় বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য। ভারতের পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার ছাপা হয়েছে ভারতীয় এলাকায় শান্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেয়ার ছবি ও খবর"।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বকোণ-এর ৫ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার জীবংগাছড়া গ্রামের ৩৬ বছর বয়স্ক নিরুপম চাকমা বিরোধ হওয়ায় শান্তিবাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন। রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দৈনিক পূর্বকোণের প্রতিনিধিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তিনি ১৯৭৪-৭৫ সালে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তার মন্তব্য হচ্ছে ঃ "কিন্তু শান্তিবাহিনীর নেতারা জনগণের মুক্তির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। এতে জনগণের দুর্দশা বাড়ছে। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ সাধারণ পাহাড়ী

জনগণকে শোষণ করে ভারতে বড় বিল্ডিং-এর মালিক হচ্ছে। জনগণের নিকট হতে জোরপূর্বক চাঁদা নিয়ে নিজ নিজ স্ত্রীদের শরীর স্বর্ণালংকারে ভরিয়ে দিচ্ছে। তাই জনগণের পক্ষ হয়ে শান্তিবাহিনীর বিরোধিতা করছি"।

শান্তিবাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারতীয় RAW। স্বয়ং শান্তিবাহিনীর নেতার স্বীকারোক্তি এটি। সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত ও বার্তা সংস্থা পরিবেশিত সংবাদে জানা গেছে, এরশাদের এক সময়কার উপদেষ্টা এবং বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থানকারী জনসংহতি সমিতি নেতা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা শান্তিবাহিনী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সংগঠনের নেতৃত্ব এখন ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হাতে' (সুনীতি বিকাশ চাকমা, রণ বিক্রম ত্রিপুরা, চা থোয়াই অং মারমা, আবদুল অদূদ ভূঁইয়া সম্পাদিত "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ এখনো ষড়যন্ত্র", চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ১৬১)।

বস্তুতঃ ভারত শান্তিবাহিনীর জন্মদাতা, পৃষ্ঠপোষক, নিয়ন্ত্রক, আশ্রয়দাতা, উস্কানিদাতা এবং তাদের মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধারকারী। শান্তিবাহিনীর 'mentor' ভারত; শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প সীমান্ত পেরিয়ে 'alien soil'-এ বা বিদেশী ভূখণ্ডে। শান্তিবাহিনীর "safe sanctuaries" হচ্ছে "far across the border"-এ (Friday, 15-21 February 1991)। এগুলি ভারতের ত্রিপুরায় ও মিজোরামে।

কুরিয়ার পত্রিকায় লেখা হয় যে, শান্তিবাহিনী (SB)-এর সশস্ত্র সদস্য recruit করা হয় মূলতঃ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী ক্যাম্পগুলি থেকে। কুরিয়ার-এ আরো জানানো হয় ঃ

"There are about 30 secret SB training camps at Ayelmara, Shilachari, Uluchari, Joytonbari, Aminnagar, Pakjin, Marapara, Mowajam, Punkhal, Bhalukchara, Tripura ghat, Kajaichari, Mijoram, Narayanbari, and Pekhon. Except Pekhon under Arakan Province of Burma, all other training camps are reportedly located either in Tripura or in Mijoram.

"Shanti Bahini's Sylhet Headquarters is understood to be situated at Bowalkhali in Tripura, three miles south of Indian Kachuchari border outpost. At Narayanbari is located the SB Headquarters. Shantu Larma is the Supreme commander of the Shanti Bahini while Sunil Chakma is the field commander" (Courier, February 15-21, 1991).

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি.-তে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার ফোরামের "Chittagong Hill Tracts : Problems and Solutions" শীর্ষক সেমিনারে বলেন, India is using the Hill Tract problem as a leverage to interfere in Bangladesh affairs (The Daily star, 11 February. 1991).

ডায়লগ পত্রিকার ২২ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায়ও শান্তিবাহিনীর ভারতকেন্দ্রিক ভিত্তির সত্যতা তুলে ধরা হয়।

দি ডেইলী স্টারের ১৮ নভেম্বর ১৯৯১-এর এক রিপোর্ট বলা হয় ঃ "Hardline Shantibahini men aided by the Indian Border Security Force (BSF) have taken preventive measures like the setting up of outposts along the border to stop fellow insurgents from availing the amnesty by the Bangladesh government, sources said" (Hardliners, BSF block SB surrender, The Daily Star, 19 November 1991).

মর্নিং সান পত্রিকায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের বিএসএফ-এর যোগসাজশ ও যৌথ আক্রমণ পরিচালনার উল্লেখ করে এক প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ "They alleged that the armed activists of the outlawed Shantibahini had been committing acts of terrorism in the region in direct collaboration with the Indian Border Security Force (BSF) (Morning Sun, 13 November 1991).

শান্তিবাহিনী যে ভারতীয় বি.এস.এফ-এর প্রত্যক্ষ মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা চালাচ্ছে তার আরো প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। তথ্য নিম্নরূপ ঃ

"শান্তিবাহিনীর একজন গ্রেফতারকৃত সদস্য সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে গত ২৯ জুন (১৯৯১) রামগড়ের খাগড়াবিলে যে হামলা চালিয়ে ১০ জন ঘুমন্ত মানবকে হত্যা করা হয়েছিলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর প্রত্যক্ষ মদদেই তা সংঘটিত হয়। পরবর্তী টার্গেট রামগড় বাজার আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বে পুনরায় বিএসএফ তাদের একজন সদস্যকে নদী পার করে সীমান্তের এপারে পাঠায় সব কিছু দেখে শুনে যাবার জন্যে এবং কর্তব্য সেরে ফিরে যাবার সময় সে বিডিআরের হাতে ধরা পড়ে" (প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ; এখনো ষড়যন্ত্র, পৃঃ ১৩৬)।

সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের যোগসাজশ এবং শান্তিবাহিনী যে ভারতীয়দের হাতের ক্রীড়নক—এ উভয় সত্য ফুটে উঠে সাপ্তাহিক "Friday" পত্রিকার এক প্রতিবেদনে। এতে বলা হয় ঃ "মানবেন্দ্র লারমা ১৯৭৫ সালে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (RAW)-এর কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন" (Friday, June 3, 1988)। একই পত্রিকা আরো জানায়, "The attempt of M.N. Larma to negotiate a settlement with Zia was failed as the armed wing of the Jona Sanghati Samity was compelled to initiate armed operation under Indian pressure in mid 1976" (Friday, June 3, 1988).

আরেকজন লেখক ভারতের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর যোগসাজশ তুলে ধরে বলেন ঃ "The transborder security dimension of ethnic conflicts engineered by a small group of disgruntled members of a tribe arises out of reported Indian involvement. The first reported involvement was

during the Mujib Government (1972-75) when a joint Indo-Bangladesh operation against the insurgents was planned. But the plan could not be carried out because of a sudden political change in Bangladesh in mid-1975. Since then India gave active support to the insurgents allowing them to operate from bases well within its borders. At present there are more then 25 camps in Tripura and six to ten camps in Mizoram. Besides moral and material support from India, the SB insurgents also get tactical advice from relevant quarters in India. Even as late as December 1991 Upendra Lal Chakma (referred to above) was reported by the Indian press to have admitted that the leadership of SB was now in the hands of Indian intelligence officials". There have also been reports of SB raiding Bangladesh Rifles (BDR) camps along the border and deep into Bangladesh territory under cover provided by Indian Border Security Forces (BSF)" (M.R. Shelley, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh The Untold Story, p. 126).

লর্ড ডেভিড এনালস্, যিনি এশিয়ান কমিটি ফর দি বৃটিশ রিফিউজী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি ১৯৯২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফরে এসে শান্তিবাহিনী কর্তৃক নিরীহ মানুষ হত্যার বিষয়টি দেখতে পেয়ে 'strongly condemn' করেছিলেন এবং তিনি ডেইলী স্টারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শান্তিবাহিনী যে 'aided and assisted by forces beyond the borders' হচ্ছে, তা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছিলেন (Lord David Ennals-এর সাক্ষাৎকার, The Daily Star, Dhaka, Weekend, Friday, May 22, 1992)।

ভারতীয় কুটিল সম্পৃক্ততার আরো চিত্র ঃ স্বীকারোক্তি ও তথ্য বিশ্লেষণ

১৯৭৬ এর দিকে বিরাট অনিশ্চয়তার মুখে ভারতীয় "let loose" করা শিখণ্ডী হওয়া সত্ত্বেও শান্তিবাহিনীর নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জিয়া সরকারের সঙ্গে আপোষে যেতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে শান্তিবাহিনীতে অন্তর্দ্বন্দ্বও দেখা দেয়। ভারত এবং 'র' চায়নি বাংলাদেশ বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তাদের তুরুপের তাসের খেলা বন্ধ হয়ে যাক। তাতে করে এতদঞ্চলে তাদের ভূ-কৌশলগত এবং আর্থ-রাজনীতিক আগ্রাসী স্বার্থ ও কূট পরিকল্পনা বিনষ্ট হতো। সম্ভবতঃ ভারত এম.এন. লারমাকে অবিশ্বাস করা শুরু করেছিল। সে জন্যে লারমা গ্রুপের সঙ্গে প্রীতি গ্রুপের উপদলীয় সংঘাতকে তীব্রতম করে দেয় RAW, উস্কানি পেয়ে প্রীতি গ্রুপ ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে ভারতের ত্রিপুরার অমরপুর সাবডিভিশনে শান্তিবাহিনীর কল্যাণপুর ক্যাম্পে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তার আট জন সহযোগীকে হত্যা করে। ভারতীয় গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ

RAW এ সময় থেকে আজ অবধি প্রীতি গ্রুপের নেতা প্রীতি কুমার চাকমাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। কোনো থানা পুলিশ, বিচার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রীতি ও তার উপদলের উপর নেমে আসেনি। এ থেকে স্পষ্ট যে, RAW-এর ইঙ্গিতেই পরবর্তীকালে আপোষে চলে আসতে প্রস্তুত এম.এন. লারমাকে হত্যা করা হয়েছে। এ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে, শান্তিবাহিনীর লারমা ও প্রীতি গ্রুপ উভয়েই ভারতে আশ্রিত-লালিত এবং তাদের নির্দেশের গোলাম।

এম.এন. লারমার মৃত্যুর পর তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (জে.বি. লারমা ওরফে সন্তু লারমা) জনসংহতি এবং শান্তিবাহিনীর নেতা হিসেবে ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত আছেন এ যাবৎ এবং তিনিও গত কয়েক বছর ধরে সেখানে থেকেই কিংবা সাময়িকভাবে এখানে এসে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সন্তু লারমাও সম্পূর্ণভাবে RAW-এর পরিকল্পনামাফিক চলছেন। RAW সন্তু লারমার সম্ভাব্য অবাধ্যতা মোকাবিলার প্রয়োজনে শান্তিবাহিনীতে অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ ও বিকল্প নেতৃত্ব খাড়া করে রেখেছে। একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক সচিব রূপায়ন দেওয়ানের সঙ্গে সন্তু গ্রুপের বিবাদ ও পরিণামে সশস্ত্র সংঘাত। এটি ১৯৯৪ সালের ২ অক্টোবর ভারতের ত্রিপুরার রাইসাবাড়িতে চলমান সংলাপের ব্যাপারে মতবিরোধের আপাতঃদৃষ্ট কারণে সংঘটিত হয়। এতে উভয় গ্রুপের বহু সদস্য আহত হয়। তখন সন্তুর আবদারে রূপায়ন দেওয়ানকে ভারত সরকার সামান্য কিছুদিনের জন্যে গৃহে আটকে রাখলেও অচিরেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। লক্ষণীয়, এ ঘটনাও ভারতে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পে সংঘটিত হয় এবং এতে করে শান্তিবাহিনীর ভারত ভিত্তিও স্পষ্ট হয়।

ভারতীয় RAW জনসংহতির বিকল্প বহু সংগঠন তৈরি করে রেখেছে। এর উদ্দেশ্য divide and rule policy নিয়ে শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গোলযোগ লাগিয়ে তাদেরকে কব্জায় রেখে নিজস্ব দূরপ্রসারী গূঢ় আগ্রাসী স্বার্থ উদ্ধার করা। এ জন্যে লারমা গ্রুপের পাশাপাশি প্রীতি গ্রুপকেও পুষে রাখছে। ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে প্রীতি গ্রুপের ২২৯ জন নেতা রাঙামাটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও ভারতের আগরতলায় প্রীতি ভাল অবস্থান নিয়েই আছেন সে দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে। ভারত তার যাবতীয় খরচপাতি দিচ্ছে। ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর এম.এন. লারমার সঙ্গে তার আরেক ভাই শুভেন্দু লারমা, শান্তিবাহিনীর ডাক্তার কল্যাণময় খীসা, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ানসহ আরো কিছু নেতা পর্যায়ের শান্তিবাহিনী সদস্য নিহত হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপিং চাঙ্গা করে রাখা ছাড়াও আরো অনেকগুলি সংগঠন দাঁড় করিয়েছে নামসর্বস্ব হলেও। এগুলি হচ্ছে—জুমল্যান্ড রিজিওনাল কাউন্সিল, জুম্ম কণ্ঠ, জুম্ম লিবারেশন ফ্রন্ট, জুম্মজাতি। এসব সংগঠনের অফিস ও অন্যান্য খরচাপাতি ভারত যেমন দেয়, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে চাঁদাবাজি করে, অপহরণ করে, জিম্মী রেখে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থও তাদের কাজে লাগে। এম.এন. লারমার বিধবা স্ত্রীর নেতৃত্বে

ভারতের ত্রিপুরায় শান্তিবাহিনীর আরেকটি গ্রুপ গড়ে রেখেছে RAW। এদের আশ্রয়, নিরাপত্তা, অপারেশনসহ যাবতীয় দিক দেখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। শান্তিবাহিনীর এক ইঞ্চি ভূমিও দখলে নেই বাংলাদেশে। এদের শিকড় ভারতে। এরা সম্পূর্ণ ভারত-নির্ভর। সমীরণ দেওয়ান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান থাকাকালে প্রকাশ্য এক প্রেস কনফারেন্সে ভারত সরকারকে দায়ী করেছিলেন শান্তিবাহিনীর আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দানের জন্যে। সমীরণ দেওয়ান আরো বলেছিলেন, শান্তিবাহিনীর নেতাদের আসল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন নয়, বরং ভারতের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি (দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১২ নভেম্বর ১৯৮৯)।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও RAW-এর অর্থে ও যোগসাজশে Peace Campaign Group (India), Humanity Protection Forum (India) কাজ করে যাচ্ছে। এরা পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালায়। Propaganda War চালানোই এদের কাজ। এগুলি ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে শান্তিবাহিনীর পক্ষে Propaganda চালায় Centre for Human Rights (Geneva), Hill Watch Human Rights Forum, CHT Commission (Europe), Human Rights Coordination Council (Headed by Father R.W. Timm).

এসব ছাড়াও RAW-এর দায়িত্বে ১৯৮৬ সালে আমস্টারডামে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে চাকমা সম্মেলন হয়। লক্ষণীয় যে, উপজাতীয় সম্মেলনও নয়, কেবল চাকমা সম্মেলন। এই সম্মেলনে ইতালীর রোমে নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন এ্যাম্বেসেডর এস. কে. লাম্বা নিজে বক্তৃতা দেন। আরো বহু চাকমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এবং ভারতীয় ডিপ্লোমেটদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং তত্ত্বাবধানে। যেমন, ১৯৮৭ সালে ভারতের কলকাতায়, ১৯৮৯ সালে জার্মানীর হামবুর্গে, ১৯৯২ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে, ১৯৯৩ সালে নেদারল্যান্ডে এবং ভারতের কলকাতা ও অরুণাচল রাজ্যদ্বয়ে, ১৯৯৭ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে।

শান্তিবাহিনীর ভারত-আশ্রিত ও পৃষ্ঠপোষিত অবস্থান সম্পর্কে খোদ শান্তিবাহিনীর বহু সদস্য তথ্য দিয়েছে। যেমন ১৯৯১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী একটি এল.এম.জি. (লাইট মেশিনগান) নিয়ে আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য শান্তিচাকমা (রাঙামাটির নানিয়ারচরের হাতিমারা গ্রামে বাড়ী) এবং ১৯৮৯ সালের ১৭ অক্টোবর ৫ জন সহযোগীসহ শান্তিবাহিনীর আরেকজন আত্মসমর্পণকারী সদস্য ক্যাপ্টেন রিকো-ও স্বীকার করে যে, ভারতই শান্তিবাহিনীকে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

RAW ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে অনেকগুলি সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শান্তিবাহিনীর একজন আঞ্চলিক অধিনায়ক জানান। ১৩ বছর ধরে শান্তিবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়কের পদে থেকে ১৯৯৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণকারী ত্রিবিদ চাকমা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের পর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, রিফিউজী সমস্যা,

শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতার এবং বানোয়াট প্রপাগান্ডার মাধ্যমে ভারতই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করার কাজে নিয়োজিত। তিনি স্বীকার করেন এ কথা যে, ভারতের নির্দেশেই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জোর করে উপজাতীয়দের ভারতে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং আটকে রাখে শরণার্থী শিবিরে। বস্তুত ১৯৯১-৯৪ পর্যায়ে এই সত্য বারংবার বহু তথ্যসহ ভারতে ও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক, ত্রিবিদ চাকমা জানান যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম, শিলাইছড়ি, বোয়ালপাড়া, কদমতলী, দায়েক, বারাছড়ি, রালমা, ত্রিমাখা, রত্নমনগরসহ বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। শান্তিবাহিনীর বড় ধরনের সন্ত্রাসী সদস্যদের দেরাদুনে ট্রেনিং দেওয়া হয়। মায়ানমারেও শান্তিবাহিনীর রয়েছে কয়েকটি ঘাঁটি।

১৯৮৮ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখে নেপালের কাঠমণ্ডু থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ পাক্ষিক পত্রিকা "Spot Light"-এর একটি নিবন্ধে বলা হয় ভারত থেকেই শান্তিবাহিনীকে sabotage করার জন্যে উস্‌কে দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। "Spot Light" জানায়, sabotage করে দ্রুত সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালানোর সময় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতে তৈরি প্রচুর সাবমেশিনগান, কারবাইন, এস.এল.আর. স্টেনগান এবং ৩০৩ রাইফেল ফেলে যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত থেকে এসে ভারতের দেওয়া অস্ত্রেই শান্তিবাহিনী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। পত্রিকাটি আরো জানায়, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রচারণার কারণেই ৩০ হাজার উপজাতি লোক ভারতে গমন করে।

বস্তুতঃ শান্তিবাহিনীর কাছে যেসব অস্ত্র পাওয়া যায় (অর্থাৎ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন সময়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যকে ধরে যেসব উদ্ধার করেছে) তার মধ্যে ভারতে নির্মিত অস্ত্রই প্রধান। এছাড়া অন্যান্য দেশের অস্ত্রও ভারত থেকে লাভ করে শান্তিবাহিনী। ১৯৭২ সালে মেজর জেনারেল উবানের অপারেশন ঈগলের সময় চাকমারা বেশ কিছু চীনা ও বিভিন্ন দেশী অস্ত্র পেয়েছে বখরা বাবদ। এগুলি পাকিস্তানীরা ফেলে গিয়েছিল। এছাড়া শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতে বসে পাইপগান, গাদা বন্দুক, কাটা রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ইত্যাদি তৈরির কৌশল শিখেছে। শান্তিবাহিনীর কাছে যেসব অস্ত্র রয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

(১) চায়নীজ রাইফেল, সাবমেশিনগান ও লাইট মেশিনগান।

(২) ৩০৩ রাইফেল, বৃটিশ এল.এম.জি.।

(৩) ভারতীয় এস.এল.আর, সাব মেশিন কারবাইন (স্টেনগান) এবং এল.এম.জি।

(৪) চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল / ৯ মিলিমিটার সাব মেশিন কারবাইন।

(৫) ৭.৬২ মিলিমিটার (জার্মান ও পাকিস্তানী) এইচ. কে. ১১-এ রাইফেল এবং এল.এম.জি।

(৬) সিঙ্গেল ও ডাবল ব্যারেল শট গান।

(৭) নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী পিস্তল ও বন্দুক।

(৮) ৩৬ এইচ ই হ্যান্ড গ্রেনেড।

(৯) ২ ইঞ্চি/ ৬০ মিমি মর্টার।

(১০) বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লোসিভ।

জানা যায় যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর মাধ্যমে শান্তিবাহিনী ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৯, ১৯৮৮, ১৯৮৯ সালে বড় আকারে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও এক্সপ্লোসিভ বা বিস্ফোরকের চালান পায়।

এছাড়া এ্যামেরিকা, রাশিয়া, বুলগেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের যেসব অস্ত্র ভারত তার সামরিক বাহিনীর জন্য অনেক বছর পূর্বে যোগাড় করেছিল, সেসব পুরনো অস্ত্রও শান্তিবাহিনীকে দেওয়া হয়। আবার থাইল্যান্ডের অস্ত্র চোরাচালানীদের সাহায্যে শান্তিবাহিনী অত্যাধুনিক মার্কিন এম-১৬ রাইফেল, রকেট লাঞ্চারও সংগ্রহ করেছে।

শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণকারী সার্জেন্ট মেন্তারাম ত্রিপুরা ও তার সহযোগীরা জানিয়েছেন যে, তারা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কান্তলুই ঘাঁটিতে গেরিলা ট্রেনিং পান। তারা জানিয়েছেন ঃ

"শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন মহলের হরদম যোগাযোগ রয়েছে। মিজোরাম প্রদেশের সীমান্তে পাহাড়ী এলাকায় তাদের কান্তলুই ঘাঁটির নিকটতম অপর দু'টি ঘাঁটিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র', এসআইবি, সিআইডি, এসবি সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে শান্তিবাহিনীর নেতাদের সাথে প্রায়ই শলা-পরামর্শ করে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ক্যাম্পও শান্তিবাহিনীর ঘাঁটির নিকট অবস্থিত। ..... প্রশিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সরকারী-বেসরকারী মহলের লোকজন। শান্তিবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ রসদসহ যাবতীয় মালামালের যোগান পায় ভারতে বসেই" (দৈনিক সংগ্রাম, ১ জুন ১৯৯৫)।

আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য আলোক বিকাশ চাকমার লেখা "২২ বছরের সন্ত্রাসী জীবনের ইতিকথা" (সাপ্তাহিক পার্বতী, ৩১ মে ১৯৯৬ সংখ্যা) থেকে জানা যায় যে, শান্তিবাহিনীর ৭/৮ হাজার লোকবলের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার সামরিক সদস্য। জানা যায়, জনসংহতির ও শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান ও ফিল্ড কমান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (ওরফে সন্তু লারমা), ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার (ওরফে মেজর মলয়), প্রাক্তন এমপি এরশাদের উপদেষ্টা ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা ও লিয়াজোঁ কমিটির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা, ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার তালুকদার (ওরফে মেজর পেলে), রূপায়ন দেওয়ান (ওরফে মেজর রিপ), গৌতম দেওয়ান (ওরফে মেজর অশোক), কালীমাধর (ওরফে মেজর মিহির), মেজর তাপস চাকমা, মেজর সমেশ,

মেজর দেবাশীষ চাকমা, মেজর বরুণ, মেজর সুধাসিন্ধু খীসা, ক্যাপ্টেন নিম্ময়, ক্যাপ্টেন অজিত চাকমা, লেফটেন্যান্ট পঙ্কজ— এদের সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বিশেষতঃ RAW-এর যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে। এরা সবাই ভারতে আশ্রিত-লালিত। ভারতের ত্রিপুরার কাঠালছড়ি , লেবাছড়াতে শান্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায়।

আলোক বিকাশ চাকমার লেখা থেকে আরো জানা যায় যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মাইনী মিশন ট্রেনিং একাডেমী, ত্রিপুরার মনতলা ক্যাম্প (সাধারণ এলাকা গন্ডাছড়া ও রতন নগর) এবং মিজোরামের সীমান্তে দু'টি সামরিক-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরা ও মিজোরামে আরো সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে।

আলোক বিকাশ চাকমা ভারতের সাবরুম শরণার্থী শিবির থেকে গিয়ে মাইনী মিশন মিলিটারী ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রিক্রুট করা হয় লোকজন ট্রেনিং-এর জন্যে। কাজে গেলে তারা বেতন পায়। আলোক বিকাশ চাকমা মাইন মিশন ক্যাম্পে নিম্নরূপ সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে চার পর্যায়ে তিন মাসে। চার পর্যায়ের প্রথম ধাপ হচ্ছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ যেখানে এলএমজি, এসএমজি, চায়নীজ রাইফেল, এসএমজি (স্টেনগান), জি-৩ রাইফেল ও রকেট লাঞ্চার চালনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিল্ড ক্রাফট, সেন্ট্রি ডিউটি, ক্যামোফ্লেজ, কনসিলমেন্ট, ভূমির ব্যবহার ও টার্গেট নির্দেশ বিষয়ক ট্রেনিং। তৃতীয় পর্যায়ে রেইড, এ্যামবুশ, এ্যাটাক, উইড্রয়াল, পেট্রোলিংসহ ট্যাকটিক্যাল ট্রেনিং। এক্ষেত্রে ফিল্ড ট্যাকটিকস্ শিখানো হয়। চতুর্থ পর্যায়ে রাজনৈতিক ট্রেনিং। এবার জনসংগঠন, লীডারশীপ, জনসংহতি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

আলোক বিকাশ চাকমা ছাড়াও মাইনী মিলিটারী ক্যাম্পে আরও যেসব শান্তিবাহিনীর সামরিক সদস্য ট্রেনিং পায়, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট পরবর্তীকালে আত্মসমপর্ণকারী সামরিক সদস্যদের ক'জন হচ্ছে ঃ (১) মেজর উল্লাস, পরিচালক — রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। (২) মেজর শংকর — রাজনৈতিক প্রশিক্ষক। (৩) ক্যাপ্টেন নৈতিক — মিলিটারী এ্যান্ড স্পেশাল কোম্পানী কমান্ডার। (৪) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অনল — পিটি ও ড্রীল শিক্ষক। (৫) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নিবিড় মিলিটারী এ্যান্ড আর্মস্ ট্রেইনার।

(৬) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট প্ল্যানেট— মিলিটারী ট্রেইনার। এরা জানিয়েছে যে, শান্তিবাহিনীতে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া উপজাতীয় সদস্য ছাড়াও বহুসংখ্যক ভারতীয় নাগরিক প্রকাশ্যেই সদস্য হিসেবে বিজড়িত আছে। এরা মূলত শান্তিবাহিনীর স্পেশাল কোম্পানীতে।

সীমান্তের বাইরে শান্তিবাহিনীঃ চুম্বকে অবস্থান চিত্র

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর তিন জেলাকে ঘিরে ভারতের সীমান্ত ভূখণ্ডে শান্তিবাহিনীর অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

পার্বত্য খাগড়াছড়ি ঃ পশ্চিম ও উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য

(১) শালবন ক্যাম্প—১৩০, হেডকোয়ার্টার, স্পেশাল কোম্পানী।

(২) জুরাছড়ি ক্যাম্প— ৫০, ট্রেনিং একাডেমী।

(৩) মিশন একাডেমী—১০০, ট্রেনিং ক্যাম্প।

(৪) রিজাংছড়ি ক্যাম্প—৬০, হেডকোয়ার্টার অফ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (PCJSS)।

(৫) সোনামুড়া ক্যাম্প—৩৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৬) কমলপুর ক্যাম্প—৭, মেডিকেল সেন্টার-১।

(৭) উলুছড়ি ক্যাম্প—২৫, সেন্টার ফর কনফ্রনটেশন।

(৮) যিরানি ক্যাম্প—২০, সাপ্লাই আউটপোস্ট টু HQ (হেডকোয়ার্টার)।

(৯) পদাছড়া ক্যাম্প—১০, এক্সটেনশন ক্যাম্প অফ HQ।

(১০) গাড়িথানা M'La— ৩০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১১) নক্সাতলি ক্যাম্প—১২, ওয়ার্কশপ ফর রিপেয়ার ওয়ার্ক।

(১২) তাকুমবাড়ি ক্যাম্প—৪০, ফাইটিং ক্যাম্প এবং মেডিকেল সেন্টার।

(১৩) ইযিরা ক্যাম্প—৪০, ক্যাম্প অফ স্পেশাল কোম্পানী।

(১৪) বাঁশরী ক্যাম্প—২০, ট্রানজিট ক্যাম্প।

(১৫) শ্রীপুর ক্যাম্প— ৮, মেডিকেল সেন্টার-২

(১৬) কারবুক ক্যাম্প—৬০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১৭) জইতনবাড়ী ক্যাম্প—৫০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১৮) আইলমারা ক্যাম্প—৩৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(১৯) বাগানটিলা ক্যাম্প—২৫, টেম্পোরারী শান্তিবাহিনী (SB) ক্যাম্প।

(২০) শিলাছড়ি ক্যাম্প—১৫, টেম্পোরারী ট্রেনিং সেন্টার।

(২১) উদল বাগান ক্যাম্প—৩৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(২২) ইস্ট সাবরুম—৯০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(২৩) লুধুয়া ক্যাম্প—২০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(২৪) মনুঘাট পোস্ট—১৫, আউটপোস্ট অফ হারবাটিলা ক্যাম্প।

(২৫) হারবাটিলা ক্যাম্প—৩০ ফাইটিং ক্যাম্প।

(শেষের দু'একটি রাঙামাটিরও কাছাকাছি)

পার্বত্য রাঙামাটিঃ উত্তরে-পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতে মিজোরাম রাজ্য

(২৬) তবলাবাগ ক্যাম্প—১৫০, ট্রেনিং সেন্টার।

(২৭) তালপুর ক্যাম্প—৪০০, ট্রেনিং সেন্টার।

(২৮) ভালুকাছড়ি ক্যাম্প—২০০, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী HQ।

(২৯) স্বর্ণাছড়ি ক্যাম্প—৮০, মেডিকেল সেন্টার এ্যান্ড ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স।

(৩০) ছোট পানছড়ি—ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স অফ ইনসার্জেন্টস।

(৩১) জামছড়ি ক্যাম্প—২০, হেডকোয়ার্টার অফ ক্যাম্প 'বি'।

(৩২) তুঙ্গাছড়ি ক্যাম্প—৩০০, হেডকোয়ার্টার অফ রংপুর জোন।

(৩৩) জিরাকুলুকছড়া—৭০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৩৪) আদি বাজার ক্যাম্প—২০০, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৩৫) কালাদিবাপছড়া ক্যাম্প—৩০, HQ অফ কুমিল্লা জোন।

পার্বত্য বান্দরবান ঃ পূর্বে ও দক্ষিণে মায়ানমার।

ভারতের মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে রাঙামাটির কোল ঘেঁষে আসা যায়

(৩৬) মাটিবাজার ক্যাম্প—২৫, ফাইটিং ক্যাম্প।

(৩৭) কান্তলুই ক্যাম্প—৩০, ক্যাম্প অফ স্পেশাল কোম্পানী।

(৩৮) পারভালুই ক্যাম্প—৩০, HQ অফ ঢাকা জোন।

(৩৯) পাইখং সোনাই ক্যাম্প

(৪০) মধু ক্যাম্প

(৪১) মধুফ্রো ক্যাম্প

(৪২) সোনালী ক্যাম্প

(৪৩) ও সোনালী ক্যাম্প।

এছাড়া ত্রিপুরার মনতলা, গন্ডাছড়া, তৈচাকমা, শান্তিপুর, উদয়পুর, জ্যোতিষপুর, রতন নগর, পঞ্চরতন, শ্রীপুর, বৈরাগীর দোকান, পুকুরঘাট, ফুলছড়ি, পাতাছড়া, তুইয়োছড়া, কৃষ্ণনগর, চোঁরতল, রাঙাছড়া, লধুয়া প্রভৃতি স্থানে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প, কোয়ার্টার, উৎপাদন খামার, মেডিকেল সেন্টার আছে।

জনসংহতির সাংগঠনিক কাঠামো

PCJSS—পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

GRAP—গ্রাম পঞ্চায়েত

JUS—যুব সমিতি

MS—মহিলা সমিতি

PCKS—পার্বত্য চট্টগ্রাম কীত্তনীয়া সমিতি

GHQ— জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স

এই পুরো কাঠামোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যরা ভারতের ত্রিপুরায় ও মিজোরামে থেকেই কর্মকাণ্ড চালিয়েছে ও চালাচ্ছে।

জনসংহতির শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র কাঠামো

উপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নামে জোনগুলির প্রদত্ত নাম আসলে কোড নেইম বা সাংকেতিক নাম। শান্তিবাহিনী নিজেদের সুবিধার্থে এ কাজ করেছে। সিলেট জোন বলতে দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, এলাকাকে বুঝানো হয়। যশোর জোন বলতে মাটিরাঙা, কাউখালি, রাঙামাটি অঞ্চলকে বুঝানো হয়। বগুড়া জোন হচ্ছে লংগদু থানা। কুমিল্লা জোন হচ্ছে জুরাছড়ি, বরকল, কাপ্তাই অঞ্চল। রংপুর জোন হচ্ছে নাইক্ষ্যংচড়ি, বিলাইছড়ি, মানিকছড়ি অঞ্চল। ঢাকা জোন হচ্ছে রুমা, রুহানছড়ি, আলিকদম অঞ্চল। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান— এই তিন পার্বত্য জেলায় শান্তিবাহিনীর অপারেশনাল জোনসমূহ অনুযায়ী সন্ত্রাসী ও অপতৎপরতা চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এসব জোনের সবগুলির হেডকোয়ার্টার হয় ত্রিপুরা এবং নয়তো মিজোরামে। রংপুর, কুমিল্লা, ঢাকা জোনের সদর দফতর মিজোরামে। সিলেট জোনের সদর দফতর ত্রিপুরার বোয়ালখালির জারলছড়ি সংলগ্ন স্থানে। আবার বিজয়পুর, বাদলছড়ি, জিরানিতে তিনটি কেন্দ্রীয় অধিদপ্তর আছে। আগরতলার কুঞ্জবনে দৌলতপুর নামক এলাকায় একটি বিদেশী দূতাবাস খোলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামরিক হেডকোয়ার্টারগুলি ভারতে বিদ্যমান থেকেই সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতার ভারতকেন্দ্রিক পরিচয় তুলে ধরছে। আরো লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ডে শান্তিবাহিনীর এক সূতা পরিমাণ জায়গাও নেই। অথচ আজ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার এদেরকে মাথায় তুলে রেখেছে।

ভারতীয় সংযোগ ঃ শেষের তথ্যাদি ও বিশ্লেষণ

ভারতের 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় নভেম্বর ১৯৯৬-এ শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সংযোগের চিত্র প্রকাশিত হয়। কলকাতার 'আলোকপাত' পত্রিকার নভেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় উত্তম উপাধ্যায় নামে একজন রিপোর্টার খুবই পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, "এখন ১০ হাজার চাকমার মিলিশিয়া বাহিনী যে ভারতীয় সাহায্যেই পুষ্ট এটা ত্রিপুরার ছোট ছোট বাচ্চারাও জানে"।

বিশিষ্ট ভারতীয় গবেষক-বিশ্লেষক অশোক এ বিশ্বাস তার "RAW's Role in Furthering India's Foreign Policy" শীর্ষক পুস্তিকায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সংযোগের কথা খোলাখুলি বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "RAW is now involved in training rebels of chakma tribes and Shanti Bahini who carry out subversive activities in Bangladesh". এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'র' বর্তমানে চাকমা উপজাতি ও শান্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণদানে সরাসরি জড়িত যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানারকম নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়।

কিছুকাল পূর্বে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন হাইকমিশনার ফারুক সোবহান (পরে পররাষ্ট্র সচিব) "এশিয়া এজ"-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ "The Bangladesh Government felt that the main support for the 'Shanti Bahini' was being provided by the Research and Analysis Wing in India".

এর অর্থ হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে, মূল সমর্থন আসছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এ্যান্ড এনালিসিস উইং-এর কাছ থেকে।

এ কথাও আজ জানা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন ভারতের মিজোরাম রাজ্যের ডাইরেন্ডীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলেও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এই সামরিক স্কুলের কমানডেন্ট ব্রিগেডিয়ার ত্রিগুলেশ মুখার্জী। এই স্কুলে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে শান্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় চীফ অব আর্মী স্টাফ জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরী পুরো বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। এখানকার পরিস্থিতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মিলিটারী ফরমেশনগুলি সফর করার সময় ডাইরেন্ডীতে আসেন। এখানে জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলে সামরিক প্রশিক্ষণরত বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনারেল শংকর রায় আশা ব্যক্ত করেন যে, শীঘ্রই শান্তিবাহিনী সম্মানের সাথে স্বদেশভূমি জুম্মল্যান্ড-এ ফিরে যেতে পারবে।

লক্ষণীয় যে, শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় অবৈধ সংযোগ কত গভীরে রয়েছে জেনারেল শংকরের বক্তব্য থেকে তা বেরিয়ে আসছে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার থেকেই শান্তিবাহিনীকে জামাই আদর করে তাদের হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে দিচ্ছে এবং শেষাবধি তা যাচ্ছে ভারতের খপ্পরে। জেনারেল শংকর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী প্রশ্নে ভারতের পরিকল্পনা এবং নিকট ভবিষ্যতের করণীয় জানতেন বলেই এত নিশ্চিতভাবে শান্তিবাহিনীর স্বদেশভূমি জুম্মল্যান্ডে অচিরেই ফিরে যাবার আশ্বাস দিয়েছেন। ভারত, ভারতীয় RAW এখন এই কাজই করাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে। সন্তু লারমার সঙ্গে চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ অখণ্ড বাংলাদেশ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে উপজাতিদের মধ্যে যারা গবেষণা করেছেন তারা হচ্ছেন সতীশ কুমার, বিরাজ মোহন দেওয়ান, সি. আর. চাকমা, সুগত চাকমা প্রমুখ। ভারতে গবেষণা করেছেন দেবযানী দত্ত এবং অনুসূয়া রায় চৌধুরী। চাকমা গবেষকরা সরাসরি স্বীকার করেছেন চাকমা জাতির আসলে কোনো ইতিহাস নেই। চাকমাদের যে চম্পকনগরের অধিবাসী বলা হয়, সেটি একটি কাল্পনিক নাম। অন্তত পাঁচটি চম্পকনগর আছে যা ভারতে বা ভারতের বাইরে বিভিন্ন স্থানে আছে। কোনোরকম ভাবে বোঝা যায় নি, এরা কোত্থেকে এসেছে। কেউ বলে আরাকান থেকে, কেউ বলে ভারত থেকে। এ ধরনের নানা রকম কথা শোনা যায়। চাকমারাসহ এখানকার যে তেরোটি উপজাতি আছে তারা কেউ বাংলাদেশের ভূমিপুত্র নয়। তারা এখন থেকে দেড়শ', দুইশ বা আড়াইশ বছর আগে সর্বোচ্চ তিনশ' বা চারশ' বছর আগে এসেছে। এদেশের ভূমিপুত্র হচ্ছে যাদেরকে বাঙালী সেট্লার বলে চালানো হয়েছে (সমস্যাটা যেখান থেকে শুরু) তারা। আমি '৭৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেখেছি, আমি '৮৩ সালে সেখানে গিয়েছিলাম,'৯৩ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। '৯৫ সালে এমন কি এই '৯৭ সালে তিন সপ্তাহ আগে রাত দু'টার সময় সেখানে নামাজ পড়েছি। অবশ্য সেটি ছিলো ক্বাজা নামাজ এবং বিরামহীনভাবে ঘুরেছি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন ভয়ংকর জঙ্গলে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছি। সেখানে এমন সব জায়গা আছে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিপদে সেখানে এমবুশের সম্ভাবনা, বিপদের সম্ভাবনা। কর্নেল মোস্তফা আমাকে রাত সাড়ে এগারোটার সময় বলেছেন, তার বাবা মারা গেছেন কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। নেত্রকোণার দু'জন সিপাহী, বরিশালের একজন সিপাহী বলেছেন কারো মা মারা গেছেন, কারো ভাই মারা গেছেন। তারা আসতে পারেনি। মশারী পরে বসে আছেন কারণ সেলিব্রাল ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আলিক্ষিয়ং ক্যাম্প — ওখানে শুয়ে আছে একজন সিপাহী যে-কোনো সময় মারা যাবে। এর আগে ক্যাপ্টেন আরিফ মারা গেছেন রথিচন্দ্র পাড়া ক্যাম্পের অফিসার। যিনি তিনদিন ধরে অজ্ঞান ছিলেন। তাকে চিটাগাং সি এম এইচ এ আনা হলো, তৃতীয় দিনে অন্য অফিসারদের চোখে অশ্রু, সিপাহীদের চোখে অশ্রু। কারণ He is already dead. পার্বত্য চট্টগ্রামে চলেছে ভয়াবহ অবস্থা। আমি বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামে গিয়েছি। সেখানে দীঘিনালা থেকে সাড়ে পাঁচশ' বাঙালী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ওখানে

মুসলমান মারা গেছে। মৌলবী সাহেব গিয়েছেন জানাজা নিয়ে। তারা বলে এখানে কবর দিতে দেবো না। বলা হলো, কেন ভাই এটা তো আমাদের কবরস্তান। চাকমারা বললো, এটা তোমাদের বাবার জায়গা না, এটা আমাদের জায়গা। তোমরা চলে যাও। মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, বলে এ জায়গা তো আমরা কিনেছি। আবুল কাসেম নামে এক সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন যিনি এখন সর্বশান্ত ও উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গেছেন। আবুল কাসেমের তিনটি ছেলেকে চাকমা শান্তিবাহিনী জবাই করেছে। আমাদের দেখতে পেয়ে ডুকরে আর্তনাদ করে বলছেন, চোখ দিয়ে তাদের অশ্রু ঝরছে, বলছেন 'আমাদেরকে বাঁচান, আমাদেরকে বাঁচান.....' 'আবুল কাসেম তিন ছেলের হত্যার বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করতে গিয়েছেন। দারোগা মামলা নেয়নি। এর দুটি কারণ হতে পারে। হয় দারোগা ঘুষ খেয়েছে অথবা দারোগার লাশ পড়ে থাকতে পারে-এই ভয়। কিছু করার নেই। আমরা যখন চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির সঙ্গে অনেক রাত্রে আলাপ করছি সেদিন, আমরা জানি না বাঙালীদের উপর কি ঘটেছে রোয়াংছড়িতে। দু'জন ব্যবসায়ী বাজার থেকে ফেরার পথে তাদের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা লুট করা হয়েছে। তাদেরকে অজ্ঞান করে ফেলে রাখা হয়েছে। ভোরে জিওসি বললেন, আমরা যখন কথা বলছিলাম, হয়তো এ সময় এ ঘটনাটি ঘটেছে। আমি বললাম, এই যদি হয় অবস্থা তো আপনারা কি করবেন? উনি বললেন 'কিছু করার নাই। আমাদের হাত বাধা'। আমি বললাম, এদের ধরুন। তারা বলেন 'সম্ভব নয়'। সম্ভবত সরকারের কোন আদেশ নেই। তবে তিনি বললেন, একটি কাজ অবশ্য করবো, দেখবো 'আর যেনো না মারে'। অর্থাৎ ভাই আর মারিস না। মাফ করে দে। যা মেরেছিস আর মারিস না এটুকু হচ্ছে তাদের দায়িত্ব। তারা কিছু করতে পারছে না। একদম গুমরে মরার অবস্থা। এখানে যদিও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেন, 'একটি ক্যাম্পও তুলে নেওয়া হবে না'— এর চেয়ে নির্জলা মিথ্যা কথা আর কিছু নেই। আমি চ্যালেঞ্জ করছি প্রধানমন্ত্রী যদি সৎ মানুষ হন তাহলে বলুন যে, বরকল থেকে তিনি ক্যাম্প তুলে আনেননি, তিনি বলুন পানছড়ি, দীঘিনালা থেকে তিনি ক্যাম্প তুলে আনেননি। প্রধানমন্ত্রী বলুন লোগাং থেকে তিনি ক্যাম্প তুলে আনেননি।

লোগাং–এর বাঙালী অথরিটি জানিয়েছেন, আপনারা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যান। শান্তিবাহিনী ওঁৎ পেতে বসে আছে। নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না, সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে হবে। এখানে কয়েকশ' বাঙালী পরিবার অসহায় অবস্থায় বসে আছে। দীঘিনালার অনেক জায়গা থেকে ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি ঘাঘরায় গিয়েছি, আলিক্ষ্যিয়ং গিয়েছি। এমন সব জায়গায় গিয়েছি যেখানে হেলিকপ্টার নেমেছে– কো-পাইলট শুধু নির্দেশনা দিচ্ছে, আর দশ ফুট গেলে তিনশ' ফুট গভীরে বা চারশ' ফুট গভীরে পড়ে যাবে হেলিকপ্টার। এরকম জায়গায় নেমেছি, নেমে আমরা কেডস পরে ধীর পায়ে নেমেছি। ওখানে মেশিনগান লাগানো সৈন্যবাহিনী সব ঘেরাও করা। খুব গভীর পাহাড় দিয়ে উপর থেকে নিচে নামতে হয়েছে। একেকজন আমাদের হাত ধরে রেখেছে। এরকম অবস্থা। একটি জায়গা নেই, একটি রাস্তা নেই। ওখানকার পাংখো নেতা আমাদেরকে দুই তিনশ' লোকের সামনে বললেন, 'আমাদের মধ্যে একজন ডাক্তার নেই, একজন এম এ পাস নেই'। অথচ চাকমাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, 'কুকী

পাহাড়' বা কালাপাহাড়ের নিচে। সেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এসেছিলো। তারা কথা বলেছে সামরিক বাহিনীর সামনেই। দীঘিনালায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছেতাই অভিযোগ করছে, মেজাজ দেখাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার আশফাকের কিছু করার নেই। চাকমাদেরকে সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হয়েছে বাঙালীদের চেয়েও বেশী। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে কথা বলা হয়েছে। ওদের বেশিরভাগই গ্রাজুয়েট। রাঙামাটিতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সাথে ব্রিগেডিয়ার জহির ছিলেন, একজন ব্যারিস্টারও ছিলেন। ব্যারিস্টার বললেন, ঢাকার ধানমণ্ডি মধুবাজারে তার বাসা। তিনি বললেন, 'ওখানে যদি দশজন বাঙালীকে এভাবে প্রশ্ন করা হয়, দেখা যাবে পাঁচটা লেখাপড়াই জানে না। আর বাকি পাঁচটা কোনো রকম জানতেও পারে, এই অবস্থা'। পাংখো নেতা আমাদেরকে বললেন, একটা হেরিংবন্ড রাস্তা তারা চান। সেটিও তাদের নেই। উল্লেখ্য যে, পাংখোরা উপজাতীয় হলেও তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে। পাংখো নেতা এ্যাংলিয়ানার মামাকে মেরে ফেলেছে শান্তিবাহিনী। এ্যাংলিয়ানারা তাদের একটি দল নিয়ে থাকতেন বান্দরবান এলাকায়। তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদেরকে চাকমারা বলেছে, শান্তিবাহিনীর পক্ষে থাকতে। তিনি বলেছেন, আমরা বাংলাদেশীদের সাথে থাকতে চাই। 'আমাদের শুধু বাংলাদেশীরা যে সুবিধা পান শুধু সেটুকু পেলেই হবে'।

আমরা জানি যে, চাকমারা মাখন খেয়ে ফেলছে। ৭২% শিক্ষিত হচ্ছে চাকমা। সংবিধানের দোহাই দেওয়া হয়েছে 'অনগ্রসর অংশের জন্যে যদি সরকার কিছু করে তবে ২৮-১/২/৩ অনুযায়ী সরকারকে বাধা দিতে পারবে না। একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, সৎ হলে সরকার স্বীকার করুন 'অনগ্রসর অংশ' কারা? ক্ষেত্রবিশেষে বাঙালীদের শিক্ষার হার ১০%। মোট টেনেটুনে ২০%। চাকমাদের শিক্ষার হার হচ্ছে ৭২%। কাদের এডভান্সমেন্ট আপনি চান? চাকমারা সংখ্যালঘু। বাংলাদেশের মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ০.৪৫% এমন কি তা ১%-এর অর্ধেকেরও কম। এর মধ্যে বারোটি উপজাতি চাকমাদের সঙ্গে নেই। একটি উপজাতি একা সন্ত্রাস করে যাচ্ছে, অন্য দু'একজন ত্রিপুরা বা অন্যরা আছে। এই চাকমারা বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ০.২২%। ১%-এর অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম। তাদের কথায় আমরা উঠি, তাদের কথায় আমরা বসি। তাদেরকে নিয়ে আমরা যে-কোনো রকম চুক্তি করছি। আমাদের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। মাত্র ১%-এর অর্ধেকের অর্ধেক মানুষের জন্যে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি যারা এই এলাকায় এসে ঢুকেছে — অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। তাদের নাগরিকত্ব স্ট্যাটাস এখনো ঠিক হয়নি। তা ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী চলেছে। '৮৯ সনে তাদের অনেক বেশী সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার তাদেরকে দেশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা বিদ্রোহী। তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে অথচ তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে মুরগীর ঠ্যাং, গলদা চিংড়ি খাইয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এবং বলা হচ্ছে উপজাতিদের এডভান্সমেন্ট করা হচ্ছে। উপজাতীয় নেতা এই সন্তু লারমা সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকা থেকে চলে যান দুদুকছড়িতে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে। এখানে খুব সামান্য সময়েই তিনি ভারতে ত্রিপুরায় হেঁটে যাতায়াত করেন। ত্রিপুরায় তার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করে। ত্রিপুরার একটি আধুনিক ফ্ল্যাটে থাকেন। ত্রিপুরায় বসে চুক্তি

হচ্ছে। ত্রিপুরায় বসে সিদ্ধান্ত হচ্ছে। আগরতলায় বসে সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এবং নয়াদিল্লি যেটি সমর্থন করছে সেটিকে এখানে পাস করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা যার সকল ছেলেমেয়ে চাকরি করে বাংলাদেশে। তার রাইস মিল আছে, তার স' মিল আছে, থাকেন আগরতলায়। রোজ শাসান। 'এইটা না হলে শরণার্থী পাঠাবো না। ঐটা না হলে এটা মানবো না'। এদেশে মাঝে মাঝে হেলিকপ্টারে করে আসেন। রাইস মিল, স' মিল, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয় স্বজন সব কিছু দেখে যান। এখানে সকল স্বার্থ রেখে ঐখানে বসে শাসাচ্ছেন। এবং কথায় কথায় কোনোরকম এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফোন করেন। প্রধানমন্ত্রী তক্ষুণি তার সাথে দেখা করেন এবং একটি লোককেও থাকতে দেন না, এমন কি আবুল হাসনাত আবদুল্লারও থাকার সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী থাকেন ও তিনি আলাপ করেন। যা শাসিয়ে যায় সেভাবেই তিনি কাজ করেন।

যত চাকমা গবেষকের লিখিত গবেষণা আমি দেখেছি তারা কোনো জায়গায় একথা বলেননি যে, তারা এদেশের সন্তান। তারা যা বলেছেন এবং ইতিহাসও সেটা প্রমাণ করে তারা কেউ আরাকান থেকে, কেউ ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছেন। চাকমা রাজা মার খেয়ে পলায়ন করে আরাকান থেকে চলে এসেছেন। চাকমা রাজ দরবারে যে সীল আছে সেই সীলে লেখা আছে। দশজন মুসলমান চাকমা রাজার নাম জানা যায় যারা মুসলিম নাম ধারণ করেছিলেন। তাদের স্ত্রীদেরকে বলা হতো বিবি। চাকমারা এখনো সময়কে বলে ওয়াক্ত। কুটুম, তালাক এই শব্দগুলি চাকমারা এখনো ব্যবহার করে। চাকমা রাজা শের মস্ত খাঁ, জান বক্স — এগুলো সব মুসলমান নাম। এরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। শের মস্ত খাঁর একটা সীল পাওয়া গেছে। সেই সীল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সেই সীলে লেখা আছে 'আল্লাহু রাব্বী, আরাকান-রোসাং, শের মস্ত খাঁ। ১১১১ মগী'।

এটি চাকমা গবেষকরা স্বীকার করেছেন। বিদেশী গবেষক টি এইচ লিউইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণা থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ধারণা পাই। আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কিছু ছিলো না, পুরোটাই ছিলো চট্টগ্রাম। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করা হয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে আদৌ কোনো জেলা ছিলো না। তারপর তিনটি জেলা হয়েছে এরশাদ সাহেবের আমলে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি নামে। তার আগে ১৮৬০ সালেই শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হয়েছে। একহাজার বছর আগেও যদি খোঁজ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কিছু ছিলো না আদৌ। সেই চট্টগ্রামটা 'হরিকল' জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সেটি বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। চাকমা গবেষকরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, এমন কি সতীশ কুমারের মতো মিথ্যুক গবেষক পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন স্বীকার করতে। কারণ তার শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান পুরো বইতে লিখেছেন যে, চাকমাদের ইতিহাস মিথ্যা। বিরাজ মোহন দেওয়ান লিখেছেন — সতীশ কুমার, তার গুরু, যেটি লিখেছেন সেটি মিথ্যাচার। আমরা এখানকার লোক না, বাইরে থেকে এসেছি। ১৮৬০ সালে লিউইন এখানে আসেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা করার পর। তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই লিউইনের গবেষণাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গবেষণার ক্ষেত্রে সূত্র হিসেবে ধরা হয়। লিউইন তাঁর বইতে বলেছেন, চাকমারা এবং অন্য উপজাতিরা সব এখানে বাইরে থেকে এসেছে। পার্নি বলে আরেকজন গবেষকের গবেষণা রয়েছে। তাতেও দেখা যাবে তারা বাইরে থেকে এসেছেন। আমাদের দেশের দু'জন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গবেষক প্রফেসর আবদুল করিম ও প্রফেসর মুহাম্মদ আলমগীর সিরাজ উদ্দীন— তাদের গবেষণাতেও রয়েছে চাকমারা বাইরে থেকে এসেছে। তাহলে চাকমা গবেষকরা নিজেরা বলছেন, আমরা বাইরে থেকে এসেছি। ইংরেজ গবেষকরা বলছেন, 'এরা বাইরে থেকে এসেছে', মুসলমান বাঙালী গবেষকরাও বলছেন 'এরা বাইরে থেকে এসেছে'। শুধু আমাদের সরকার বাহাদুর জানেন চাকমারা ভেতর থেকে এসেছে।

তাহলে যারা এ অঞ্চলের ভূমিপুত্র নয়, তারা কোন্ অধিকারে মাত্র ০.২২ ভাগ হয়ে বারো কোটি মানুষকে বলে, আপনারা এখানে ঢুকতে পারবেন না। চাকমা জনসংহতি সমিতির যে পাঁচ দফা, এর অন্যতম দাবি হচ্ছে যেটি সরকার মেনে নেবে–বাঙালীরা আর পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে পারবেন না। বেড়াতে যেতে পারবে না, কাঠ কিনতে যেতে পারবে না। কোনো প্রয়োজনে যেতে পারবে না। বসতি স্থাপন করতে যেতে পারবে না। কোনভাবে যেতে পারবে না। যদি যেতে হয় রিজিওনাল কাউন্সিলের পারমিশন লাগবে। অর্থাৎ নিজের দেশের মধ্যে সে দেশের জনগণকে ভিসার মাধ্যমে যেতে হবে। চমৎকার দাবি! অথচ আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারে বলা হচ্ছে, প্রজাতন্ত্রের নাগরিক যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় তার প্রয়োজনে দেশের যে কোনো প্রান্তে যেতে পারবে যদি আইনত কোনো অপরাধী বা দেশদ্রোহী না হয়।

চাকমারা শান্তিবাহিনী গঠন করেছে। জুম্মল্যান্ড কথাটা এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন তারা বলছে চাকমাল্যান্ড। দু'একজন ব্যতিক্রম আছেন। তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। অন্য উপজাতিদের সাথে দেখা করেছি। ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে আমরা বেরিয়েছি রাত পর্যন্ত। সবাই বলেছে, ভাই, আমরা ওদের সঙ্গে নেই। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই। এবং এরা কেউ শান্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত নয়। দু'একজন মারমা বা ত্রিপুরা ছাড়া। ওদের নেতাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, চাকমা মেজরদের সাথে। তারা প্রত্যেকে বলেছে 'মুসলমানকে থাকতে দেবো না'।

মুসলমানরা না-কি তাদের জোর করে মুসলমান করে ফেলেছে। ত্রিশ বছরের ইতিহাসে মাত্র ১৭ জন মুসলমান হয়েছে। তাও বিবাহের মাধ্যমে। চাকমা মেয়েকে কোনো ছেলে বিয়ে করেছে তখন সে মুসলমান হয়েছে, চাকমা ছেলে কোনো মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছে তখন সেই ছেলে মুসলমান হয়েছে। এভাবে ১৭ জন। আমি বাঙালী পল্লী গুচ্ছগ্রাম 'কনসেন্ট্রেশন' ক্যাম্পে গিয়েছি। মাওলানা সাহেবকে বলেছি 'কি হুজুর আপনারা না-কি জোর করে মুসলমান বানিয়ে ফেলেন'। তিনি একটি করুণ হাসি দিলেন। বললেন, 'ইসলামে তো জোর করে মুসলমান বানানোর কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং সেটা কি করে সম্ভব'। আমরা দেখলাম খৃস্টান মিশনারীরা ব্যাপক হারে খৃস্টান বানাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। অভিযোগ হচ্ছে ১৭ জন মুসলমান হয়েছে ত্রিশ বছরের মধ্যে, যদিও বিয়ের মাধ্যমে। এসব অভিযোগ করে যারা এখানকার

ভূমিপুত্র নয়। সংবিধানের থার্ড পার্টের ৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক যে কোনো সময় যে কোন জায়গায় যেতে পারবে। ব্যবসা–বাণিজ্য করতে পারবে। বাসস্থান, জায়গা জমি কিনতে পারবে। ৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে এটিকে আরো শক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

চাকমাদের জন্যে সরকার একজন বাঙালীর চেয়ে একুশ গুণ বেশী সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ ২১ জন বাঙালী যা পাবে একজন চাকমা তা পাবে। শুধু তা-ই নয়, দু'কোটি টাকা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি ঠিকাদারির কোনো কাজ শুরু হয় তাহলে তা চাকমারা পাবে। এর বেশী হলে বাঙালী, চাকমাদের সঙ্গে মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার। এখন ২০ কোটি টাকার কাজ যদি শুরু হয় পরিষদ সঙ্গে সঙ্গে দশ ভাগে ভাগ করে ফেলে। এটাকে দু'কোটির পর্যায়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ফলে বাঙালীদের পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই হলো অবস্থা। আবার উপজাতীয়রা ৫% হারে ব্যাংক ঋণ পায়, বাঙালীরা ১৮% হারে। বাঙালীদের ট্যাক্স দিতে হয়, উপজাতীয়দের দিতে হয় না। উপজাতীয়দের কোটা আছে, বাঙালদির নেই। এমন বৈষম্য চলছে।

অনেকেই জানেন না, নদী শিকস্তি, নদী তীরের মানুষেরা গিয়েছে। সেখানে অনুর্বর জমিকে উর্বর করেছে। মাছের চাষ করেছে, বাগ বাগিচা করেছে। বিভিন্ন রকম ফার্ম করেছে। সবাইকে সেখানে একদিনের নোটিশে ওখান থেকে চলে আসতে হয়েছে। আমরা স্পীডবোটে করে একটি গুচ্ছগ্রাম ইসলামপুরে গিয়েছি। সেখানে জেনেছি চাকমারা কুকুর–বিড়ালের মতো মানুষকে মেরেছে। সবার উদ্‌ভ্রান্তের মতো কান্না। আমার একটা ডায়েরী ছিলো, সেই নোটবুকে আমি লিখছিলাম। অনেক সাধারণ মানুষ ভাবলো, বোধ হয় তিনি সাংবাদিক। বলে 'স্যার আমাদের কথা লেইখেন। স্যার আমাদেরকে ভুলে যাইয়েন না'। স্পীডবোট ধরে রাখছে। বলছে, 'আমাদেরকে ছেড়ে যাইয়েন না'। চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। এরকম আমরা সকল জায়গায় দেখেছি। কোথাও আমি বাঙালীদের মধ্যে কোনো হাসি দেখলাম না। চাকমা নেতারা আমাদেরকে অসংকোচে বলেছে, 'বাঙালীদের আমরা থাকতে দেবো না'। একেবারে সরাসরি। ব্রিগেডিয়ার আশফাকের সামনে। আরো চার পাঁচজন কর্নেল-মেজর উপস্থিত। অনেক অফিসার-সিপাহী উপস্থিত। এয়ার ফোর্সের দুই পাইলট উপস্থিত। আমাদের মিলিটারীদের সঙ্গে মেশিনগান আছে, তথাপি কিছু করার নাই। 'এখানে আপনাদেরকে থাকতে দেবো না। এখানে মুসলমানদেরকে থাকতে দেওয়া হবে না'। বলছে, 'এটা আমাদের জায়গা'। আমি যে চাকমা ছেলেটিকে চার বছর পড়িয়েছি সে এখন রাঙ্গামাটির চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা। আমি তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়িয়েছি। সেকেন্ড ইয়ারে পড়িয়েছি, থার্ড ইয়ারে পড়িয়ছি, এম এতে পড়িয়েছি। তার সঙ্গে আর দেখা করার তেমন কোনো সুযোগ নেই। সে হয়তো এখন আমাকে বুঝতে পারবে না। সে যদিও মনোনীত চেয়ারম্যান, তবুও মনের অবস্থা হয়তো আগের মতো নেই। দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবের সাথে কথা বলেছি — যিনি আওয়ামী লীগের খাগড়াছড়ির দীর্ঘদিনের সভাপতি ছিলেন। তিনি একেবারে পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। তার আওয়ামী লীগ তাকে রক্ষা করছে না। তার একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবের চাপদাড়ি মেহেদীরাঙা। দশাসই চেহারা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আওয়ামী লীগের

প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। জীবনের তরুণ বয়স থেকে। এখন বৃদ্ধ পৌঢ়। তিনি হতাশাগ্রস্ত, চুক্তি সই হওয়ার পর তার শরীর ঠিক থাকবে কি-না তিনি জানেন না, না-কি তিনি লাশ হয়ে যাবেন। সবার সামনে তিনি এটা ব্যক্ত করেছেন। কিছু করার নেই। আমরা শুধুমাত্র পুতুল হয়ে বসে আছি। অথচ তাঁর সরকার, তাঁর দলীয় সরকার ক্ষমতায় আছেন। সংবিধান মানে না যে সরকার, যারা দেশের ভূমিপুত্র নয় তাদেরকে ভূখণ্ড দিয়ে দিতে চায়।

বাংলাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, এ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। এখানে হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট আরো অনেকগুলো বাড়ানো যেতে পারে। যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে যায় তবে চট্টগ্রাম খুবই শীর্ণ হয়ে যাবে। রণকৌশলগত ও ভূকৌশলগত দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইন্ডিয়া নিয়ে নিতে চেয়েছিল। নেহেরুদের প্রবল বাধার পরেও আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম পেয়েছিলাম রেডক্লিফ এওয়ার্ডের মাধ্যমে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে চট্টগ্রামের অবিচ্ছিন্ন উপাদান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বেদখল হয়ে গেলে ভারত মিজোরাম থেকে, ত্রিপুরা থেকে দ্রুত এসে অতি সহজেই চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে নিতে পারবে এবং সাগরে যেতে পারবে। তখন বাংলাদেশের জলসীমা সম্পূর্ণরূপে তাদের দখলে চলে যাবে। তখন আপনারা সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে যাবেন। বার্মার দিকে বেরুতে পারবেন না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। স্থলপথে মায়ানমার হয়ে আপনি যে এশিয়ান হাইওয়ে চেয়েছিলেন সেটিও আপনি পাবেন না। তখন সেটি হয়ে যাবে ভারতীয় সীমান্ত। আপনার কিছুই করার থাকবে না। যদি কাপ্তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রের সুইচ অফ করে দেয় তাহলে সারা দেশের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার কিছু করার নেই। চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, স্টীল মিলসহ শিল্প–কারখানা যা রয়েছে সবগুলির নিয়ন্ত্রণ তাদের নিকট থাকবে, আপনার কিছুই করার নেই। চুক্তির মধ্যে একটি অংশ আছে — সেটি হচ্ছে পুলিশের সাব ইনসপেক্টর এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে এই শান্তিবাহিনী। শুধু উপজাতীয়রা চাকরি পাবে। চেয়ারম্যান থাকবে তাদের। ভাইস–চেয়ারম্যান হলেও থাকবে তাদের। ৫০% বাঙালীরা সেখানে প্রতিনিধিত্ব পাবে না। সকল সিদ্ধান্ত থাকবে তাদের, কিছু করার থাকবে না। পার্বত্য এলাকায় কিছু হেলিপ্যাড (৭৩টি) আছে। সেখানকার হেলিপ্যাডগুলি যদি নষ্ট করে দেয় তাহলে সেখানে অবতরণ করা যাবে না। অনেক সামরিক বাহিনীর সদস্য, সিপাহী থেকে শুরু করে লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল পর্যন্ত আমাকে বলেছেন, তারা ছুটি পেয়েছেন কিন্তু ভোগ করতে পারেননি। ক্যাপটেন মোস্তাক যিনি ঘাঘরা ক্যাম্প-এ আছেন, শান্তিবাহিনীর থেকে দু'শ গজ দূরে, কুকীপাহাড় বা কালো পাহাড়ের পাশে। তিনি ছুটি চাচ্ছেন কিন্তু কালাপাহাড় ক্যাম্প থেকে বেরোতে পারছেন না। কমান্ডিং অফিসারও ছাড়েন না। ক্যাম্প চলবে কি করে। সেনা সদস্যরা মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমায়। কিছু করার নেই। চাকমারা মিথ্যাচার করছে, বলছে চাকমা মেয়েদের সম্ভ্রম নেওয়া হচ্ছে। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে উল্টো। একজন সিপাহী কোথাও যেতে পারে না। দশজন সিপাহী যাবে বাজারে, সঙ্গে যাবে একজন এনসিও বা জেসিও। কিংবা একজন মেজর বা ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের একজন তার সাথে যেতে হবে। কোনো জেসিও, এনসিও বা অফিসার

না গেলে কোনো সিপাহী যাবে না। একটি কেইসে একটি চাকমা মেয়ে শুধু বলেছিল তার হাত ধরেছে এক সিপাহী। কিন্তু কেউ দেখেনি। অন্য চাকমারা তাকে শিখিয়ে–পড়িয়ে এনেছে। এই সিপাহী অস্বীকার করলেও কোনো কিছু আসে যায় না। ব্রিগেডিয়ার আশফাক সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোর্ট মার্শালে পাঠিয়ে দিলেন। তিন মাসের জেল হলো এবং একজনের চাকরি চলে গেলো। ব্রিগেডিয়ারের ভাষায়, 'প্যাক হীম আপ এ্যান্ড কোর্ট মার্শাল'। আমি যেখানে গিয়েছি, ক্যাম্পে বা সেনা অবস্থানে জায়নামাজ পেতে রাখা হয়েছে। সিপাহীরা নামাজ পড়ছে। এভাবে সিপাহীদেরকে ভাল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে এরা অনাচার করছে। এই সিপাহীদের বিরুদ্ধে যখন শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এমবুশ করে সেনাবাহিনীকেই মারতে গিয়ে আহত হয়, তখন তাদেরকে জাতীয় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করেই সিএমএইচ-এ এনে চিকিৎসা করা হয়। মশার কামড়ে যখন ম্যালেরিয়া হয়ে চাকমারা মরতে বসে তখন ওদের শত্রুরূপী বাঙ্গালী সেনাবাহিনীই ওদের সেবা–শুশ্রূষা করে। অথচ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তারা অনাচার করছে। সেনাবাহিনী এখানে জেনারেটর দিয়েছে। সংগীতের জন্যে গীটার দিয়েছে। শিল্পকর্ম করার জন্যে, কাপড় বোনার জন্যে এরা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই সামরিক বাহিনী জঙ্গলকে সাফ করে মানুষ করছে। শুধুমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধে তারা চলে যাবে। কখনো কখনো কোনো সামরিক অফিসার বলছেন, ইচ্ছে করে চাকমা হয়ে যাই। কারণ চাকমা হলে পাবো একুশগুণ সুবিধা। আমি আর বাঙালী থেকে কি লাভ। এই এক-দশমাংশ অরণ্য, নদী ,পাহাড়, উপত্যকা দিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই অঞ্চলের উপর খবরদারী হারাতে হবে। এই অঞ্চলের সকল সম্পদরাজি হারাতে হবে। চট্টগ্রাম পোর্ট হারিয়ে যাবে। আর স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন যদি সফল হয় তবে ড. আবদুর রবের চৌকোণ আকার বাংলাদেশও থাকবে না। তখন পোকায় খাওয়া ম্যাপ তৈরী হবে। তখন চালনা পোর্টও বেদখল হয়ে যাবে। আপনি কিছু করতে পারবেন না। নেপালের দিকে তাকান। নেপাল অনেক কেঁদে–কেটে ট্রানজিট পেলো। নেপাল যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো তখন দেওয়া হয়নি। তখনি দেওয়া হলো যখন ইন্ডিয়া আমাদের কাছে করিডোর চায়। নেপালে যেদিন থেকে ট্রানজিট স্ট্রার্ট হবে, সেদিন পনের মিনিট মাত্র। নেপালের একটি ট্রাক স্ট্রার্ট করেছে। এটি ঢুকতে গেছে। সাথে সাথে আবার ইন্ডিয়া বলছে, আমরা ঢুকতে দেবো না। নেপালের ট্রানজিট শেষ হয়ে গেলো। বাংলাদেশ সরকারের কোনো সাধ্য নেই ইন্ডিয়াকে প্রতিরোধ করার, মুখে অন্তত বলার যে, ভাই ওদের সাথে তো চুক্তি করেছি, সেটি রাখতে দাও। তোমাদেরকে সবই দিয়ে দিবো, তবু এটি সৌজন্য করো। তাও বলার সাধ্য নেই। আজকে আমি দেখেছি পত্র–পত্রিকায় বেরিয়েছে ভারতীয়রা অভিযোগ করেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী না-কি বাংলাদেশের সরকারের অগোচরে উলফা গেরিলা এবং মিজোরামের গেরিলাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে। বিষয়টি কিন্তু উল্টো। আমাদের বর্ডারের বাইরে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবানের বাইরে অন্তত পঁয়তাল্লিশটা ক্যাম্প আছে, যার প্রত্যেকটির ম্যাপ আমার কাছে আছে। এবং সেসব ক্যাম্পে কতজন ডাক্তার আছে, কতজন ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের আছে, কত অফিসার আছে, কত সিপাহী আছে, কি কি অস্ত্র আছে, কি কি গোলাবারুদ আছে, তা আমাদের সামরিক বাহিনী জানে। কোন্ জায়গায় 'এক্সপ্লোসিভ' তৈরী হয়,

কোন্ জায়গায় কার্বাইন, কোন্ জায়গায় সাব মেশিনগান কতটা আছে, কতটা একাত্তর সালে পাওয়া চীনা রাইফেল আছে, কোন্ জায়গায় ভারতীয় তৈরী অস্ত্র কতটা আছে সব কিছুর তালিকা আছে। অথচ সরকার সেগুলি জেনেও জানেন না। আমাদের সামরিক বাহিনী সেটি জানে। সামরিক বাহিনী বোঝে যদি তারা একবার এখান থেকে চলে আসে, তাহলে এতো প্রচণ্ড সংঘাত হবে, সামরিক বাহিনী আর ঢুকতে পারবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় পাঁচশ' সাতচল্লিশটি ক্যাম্প আছে। ৮টি বড় এসটাবলিশমেন্ট আছে। তিনটি গ্যারিসন বা ক্যান্টনমেন্ট আছে। তিনটি ক্যান্টনমেন্ট রেখে বাকি সবগুলি তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ৫৪৭টি ক্যাম্পের মধ্যে ৭৩টি ক্যাম্প এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, সেসব ছেড়ে দিলে বাংলাদেশ চলে যাবে। সেখানকার সুউচ্চ পাহাড়ে ল্যান্ড করার হেলিপ্যাডগুলো চলে গেলে সেখানে চাকমা সৈন্যরা ঘাঁটি করে বসবে। ফলে এখানে থেকে আমরা কখনো যেতে পারবো না সেখানে। ল্যান্ড করার সুযোগ পাবো না।

সেখানে এমবুশ করে থাকলে কি হবে তার একটি নমুনা শুনুন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, দুর্গমপথে আমরা যাচ্ছি প্রায় বিশাল বহর কনভয়টিতে এগিয়ে। বেশ রাত। আমাদের সঙ্গেই গাড়ীতে আলোচনা হচ্ছে। এসব জায়গায় এমবুশ হয়। কিছুদিন আগে নয়জন সৈন্য মারা গেছে চাকমাদের এমবুশে। আমি যে গাড়িতে ছিলাম সেটি চালাচ্ছিলেন মেজর শাহনূর জিলানী। রাঙ্গামাটির দিকে যাচ্ছিলাম। একটা জীপ আগে চলে গিয়েছিল। আমার গাড়িতে বসা। একটা ক্যাম্পের সামনে এসে আগের এসকর্ট গাড়ী থেমে যাওয়ার পর আমাদের গাড়ীতে বসা এক সিপাহী চিৎকার করে বলছে, 'এই যে ভাই, আপনারা আগে যান গিয়া ক্যান। আমাগো মাইরা ফালাইবো না'। অর্থাৎ প্রতি মহূর্তেই এমবুশের সম্ভাবনা আছে। কিছুদিন আগে এখান দিয়ে একটা কনভয় যাচ্ছিলো। রাস্তায় মাইন পোঁতা ছিলো। প্রথম গাড়িটি আসার সাথে সাথে সেই গাড়িটি উড়ে গেলো। মানুষসহ গাড়ী একেবারে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো। একজন সিপাহী শুধু সারা জনমের জন্যে পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছে। খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, শান্তিবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েই গিয়েছিলো। একদিকে আলোচনা চলছে অন্যদিকে চাপও সৃষ্টি করা হচ্ছিলো। এর ফলে শান্তিবাহিনীর আর উপায় ছিলো না। শান্তিবাহিনী কিন্তু এক সময় বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতি করতে রাজী হয়ে গিয়েছিলো। শান্তিবাহিনী কিন্তু সে কথা রক্ষা করেনি বরং পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি চাঁদা যে নিতো সেটার হার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। যদি গাছ লাগান তবে আপনাকে দশ টাকা দিতে হবে। আপনি যদি মোটর সাইকেল চালান তবে আপনাকে দুশ' বা তিনশ' টাকা দিতে হবে। আপনি যদি ট্রাক চালান তাহলে চাঁদা দিতে হবে। মাছের চাষ করলে টাকা দিতে হবে, চাকরি করলে বেতন পেয়ে প্রথম দিন ৩% আপনাকে দিতে হবে। না হলে সন্ধ্যার সময় আপনার লাশ পাওয়া যাবে। আপনি যদি ঠিকাদার হন তাহলে ১০% থেকে ১৫% আপনাকে দিতে হবে, না হলে আপনার লাশ পাওয়া যাবে। আপনি যদি বাজারে মুদি দোকান চালান প্রতিদিনই আপনাকে চাঁদা দিতে হবে। অর্থাৎ একটা ট্যাক্স কালেকশন সিস্টেম তাদের আছে। প্যারালাল গভর্নমেন্ট তারা চালাচ্ছে। এই ফাঁকে তারা একটা ব্রীদিং স্পেস পেয়েছে। তারা ১০৯২ বার এমবুশ করে আক্রমণ করেছে। বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে, ধরে নিয়ে গেছে, অর্থাৎ শান্তিবাহিনী নিজের দেওয়া

সীজফায়ারের ব্যাপারটি তারা ভেঙে ফেলেছে। শান্তিবাহিনী যদি একবার এখানে বসে যায়, তাহলে শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হবে। আমাদের এখানে জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী এসেছিলেন, যিনি ভারতীয় সেনানায়ক। তিনি বর্ডারের ওপাশে ডাইরেন্ডিতে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলে, যেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দেয়া হয় সেখানে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমি মনে করি অচিরেই চাকমারা অবশ্যই দেশে ফিরে যাবে। তবে বাংলাদেশে নয় স্বাধীন জুম্মল্যান্ডে ফেরত যাবে। এটি তিনি ঘোষণা করেছেন, যা কলকাতার আলোকপাত ও ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এসেছে। ভারতীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা সব সময় বলেছেন, এটি জুম্মল্যান্ড, ভারতীয় সরকার আজকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে তাদের ওখানে নাকি কোনো শান্তিবাহিনী নাই। অথচ শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যে চুক্তি হচ্ছে এটিই এখানে গত এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা হচ্ছে। আলোকপাত পত্রিকার এক সাংবাদিক নিজে লিখেছেন আগরতলা এবং ত্রিপুরার ছোট ছোট দশ বারো বছরের বাচ্চারাও জানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ভারতের ত্রিপুরাতে। তারাও যখন স্বীকার করছেন, আমাদের সরকার করছেন না। পানি সম্পদ মন্ত্রীর মতো অবস্থা। ওখানে ভারতীয় সেচমন্ত্রী বলছেন, 'আমি পানি দেই নাই, বাংলাদেশকে পানি দেই নাই, অথচ আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রী বলছেন, আমি পানি পেয়েছি'।

আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই, Time is running out. সকল দল যারা বাঙালীর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ভাবতে অবাক লাগে, যারা বাঙালীর কথা বেশী বেশী বলেন সেই বাঙ্গালী ওখানে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্যে এদের দুঃখ নাই। মাথায় পট্টি বাঁধেন, হাতে তসবীহ নেন। অথচ এখানে তসবীহওয়ালীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন। অথচ এরা কিছুই করছেন না। চাকমা শান্তিবাহিনী বাংলাদেশের শত্রু। এ শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এক নম্বর ইস্যু হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলাম রক্ষা করা এবং সেটি রক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করা, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে রক্ষা করা, আমাদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করা। সেসব রক্ষা করতে হলে একটি কাজ করতে হবে। সেটি শুরু করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর ব্যাপারে আমরা যদি চুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে সব ভেস্তে যাবে। আজকে লিখে রাখুন। সরকার হয়তো চুক্তি করে ফেলেছে। শুধু আপনাদেরকে দেখানো হবে। সরকার এ জিনিসটি প্রকাশ্যে এনে ফেলার আগেই আপনাদের যা করার করেন। যদি দেরি করেন তাহলে সময় পেরিয়ে যাবে। তারপর কিছুই করার থাকবে না। দু'টি উদাহরণ দেখাই। একটি হচ্ছে বেরুবাড়ী। দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, অথচ পঁচিশ বছরের মধ্যে তিন বিঘা ফেরত পাননি। ওখানে সার্বভৌমত্ব ওদের। আপনাকে ঢুকতে দেয় না, নড়তে দেয় না, চড়তে দেয় না, চার ঘণ্টার জন্যে ঢুকতে দেয়। প্রতিশ্রুতি ছিলো বেরুবাড়ী দেবেন, তিন বিঘা পাবেন। একটা গলি মাত্র। পেলেন না। দু'নম্বর হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান ফারাক্কা বাঁধ চালু করতে দিয়েছিলেন, চালু করার ফল দেখতে পেয়েছেন। রাজশাহী শুকিয়ে শেষ। পদ্মা কোথাও এক ইঞ্চি, কোথাও তিন ইঞ্চি, পদ্মা দুই হাত, দশ হাত, পদ্মা একশ' গজ। প্রমত্তা পদ্মার এই অবস্থা। ফারাক্কা এই কাজ করে ছেড়েছে। দু'টি কাজ করেছিলেন পিতা। তৃতীয় কাজ কন্যা পূরণ করছেন।

সেটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে চট্টগ্রামকেই দিচ্ছেন। আর সার্বভৌমত্ব শেষ করে দিচ্ছেন। যদি আপনারা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হন, যদি ইসলাম আপনাদের ধর্ম হয়, যদি বাংলাদেশকে আপনারা ভালোবাসেন তবে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেন শুধু শফিউল আলম প্রধান সাহেব জেলে যাবেন, অন্যরা কি করবেন? শুধু মুহিউদ্দীন খান সাহেব বলবেন, শুধু খালেদা জিয়া বলবেন, শুধু জামাত বলবে, শুধু ইসলামী ঐক্যজোট বলবে। বাকিরা বসে থাকবে। এটি কি করে হতে পারে? প্রতিটি মানুষকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি না করেন, তবে প্রস্তুত হন আপনারা ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে। যদি না করেন, তবে প্রস্তুত হন আপনার ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। যদি না করেন, তবে প্রস্তত হন আপনার স্বাধীনতা ত্যাগ করার জন্য। যদি না করেন, তবে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি একটি নোংরা ময়লা শব্দে পরিণত হবে। আপনি কখনো তা উচ্চারণ করতে পারবেন না, কারণ আপনি লজ্জিত হবেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধের ফসল যে চট্টগ্রাম সেই চট্টগ্রামকে আপনি হারাচ্ছেন। এই চট্টগ্রাম থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলো। অথচ এই চট্টগ্রাম আজকে শত্রুকবলিত। আপনি কি চট্টগ্রামকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসবেন? এই এ্যাপীল আপনাদের কাছে। এবং যে যেখানে আছেন এই বক্তব্য প্রচার করবেন। যে যেখানে আছেন সেখানে প্রতিবাদ করবেন। আল্লাহ্ আমাদের তওফিক দিন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওযা বারাকাতুহু।

অতন্ত্র জনতা, বাংলাদেশ-এর সেমিনারের প্রদত্ত বক্তৃতা। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তন। ২৯ অক্টোম্বর, ১৯৯৭। আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম !! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ, অতন্ত্র জনতা বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ শেষ মুহূর্তের সাবধান বাণী

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

বর্তমান সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর যে চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে, তাতে লুকোছাপার বিষয়টি সর্বাধিক সন্দেহজনক। মনে হয়, সরকার ও শান্তিবাহিনী — উভয় পক্ষের নিয়তে গলদ আছে। এই চুক্তি কেবল আওয়ামী সরকার ও ভারতীয় মদদপুষ্ট চাকমা সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে হতে যাচ্ছে। জনমত, সংসদ, সংবিধান, নির্বাচনী ম্যান্ডেট, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, গণতন্ত্র — কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনি আওয়ামী সরকার। অন্য কোনো সংসদীয় দলের প্রতিনিধিত্বও বাস্তবে এতে নেই।

এই চুক্তি বাংলাদেশ সংবিধানের বিরোধী ও অবৈধ। এটি ইউনিটারী বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কনসেপ্টের বিরোধী। সংবিধানে স্পেশাল স্টেটাস, স্বায়ত্তশাসন, রিজিওনাল কাউন্সিল, আলাদা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ইত্যাদির সুযোগ নেই। আলাদা পুলিশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতে অনুমতি, বাঙালী বহিষ্কার ক্ষমতা, জমির মালিকানা ও কর্তৃত্ব, ট্যাক্স আদায়ের সুযোগ ইত্যাদি কিছুই ভারতীয় ভূখণ্ডে লালিত শান্তিবাহিনীকে দেওয়া যায় না। এটি অর্থাৎ এই চুক্তি দেশ, জাতি, জনগণ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র এবং ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। ১২ কোটি মানুষের সমাজে কেবল ০.২২% বহিরাগত চাকমাদের নামে শান্তিবাহিনীর হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দিলে, দেশের সর্বাধিক সমৃদ্ধ এক-দশমাংশ এবং ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড ছেড়ে দিলে, তা আমাদের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করবে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চল, চট্টগ্রাম বন্দর, বঙ্গোপসাগরে আমাদের জলসীমা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের গেইটওয়ে, চট্টগ্রামের পুরুত্ব (thickness)--সব কিছু হাতছাড়া হবে আমাদের। পার্বত্য চট্টগ্রামের রিসোর্স পোটেনশিয়ালও হাতছাড়া হবে। দেশের অর্থনীতিতে ধস্ নামবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক-সামরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে ভারত আপারহ্যান্ড পাবে এ অঞ্চলে।

এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে এতদঞ্চলে শান্তি ও স্থিতি বিনষ্ট হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আরো অশান্তি তৈরি হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা মর্যাদা, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর শান্তিবাহিনী তথায় জেঁকে বসবে। তারা বাঙালী মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করবে। এর আগে ধর্ষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, চাঁদাবাজি, লুটপাট, অগ্নিকাণ্ডে ঘর জ্বালানো, হত্যা

ইত্যাদির শিকার হবে বাঙালী মুসলমানরা। যেমনটি এযাবৎ ঘটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, তা বহুগুণে দ্রুততম সময়ে ঘটে যাবার বাস্তব ও সমূহ আশংকা আছে। এদিকে চাকমা শান্তিবাহিনী তখন "জুম্মল্যান্ড ন্যাশনাল আর্মী" ও "জুম্মল্যান্ড ন্যাশনাল ফ্রন্ট" নিয়ে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগোবে। ইতোমধ্যে সে সংবাদ বেরিয়ে গেছে। তারা আসলে "জুম্মল্যান্ড"–ও নয়, বরং "চাকমাল্যান্ড" বানাতে চায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে। এরপর তারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এতদঞ্চলকে বাংলাদেশ থেকে, ভারতীয় সামরিক সহায়তা নিয়ে। ভারত এতদঞ্চলে তাদের ভূ-কৌশলগত, সামরিক, আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্যে শান্তিবাহিনীকে দিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য উদ্ধার করছে। চট্টগ্রাম বন্দর ও বঙ্গোপসাগরের বহির্দ্বার দখল, কলকাতা বন্দরের সমস্যা কাটানো, সাতবোন রাজ্যের ল্যান্ড-ব্লক্‌ড অবস্থা থেকে মুক্তি, সাতরাজ্যের সম্পদরাজির এক্সপ্লয়টেশন, চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতে কৌশলগত প্রতিরক্ষা-পশ্চাৎভূমি লাভ ও সাগরের যোগাযোগ রক্ষা, বাংলাদেশকে কব্জায় রাখা, স্বীয় দেশীয় গেরিলাদের দমানো ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ এক্ষেত্রে ভারতের রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণের পিছনে। আর আমাদের সরকার নতজানু নীতি, জিদ, অজ্ঞতা ও সংকীর্ণ ক্ষমতার স্বার্থে এই ফাঁদে পা দিয়েছে।

মোটকথা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের চুক্তি অন্যান্য ক্ষুদে উপজাতি সহ তথাকার বাঙালী মুসলমান এবং এই প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেশবাসীর জীবনে সমস্যা ও সংঘাতের সৃষ্টি করবে। এটি খুব বিচিত্র হবে না, যদি নিকট বা কমপক্ষে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ও ভারতকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি মারাত্মক জট পাকিয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এমতাবস্থায় কোনোভাবেই সেনাবাহিনীকে সরানো যাবে না, কোনো ক্যাম্প বাতিল করা যাবে না। নচেৎ ভারত ও শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হয়ে যাবে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, দলসমূহ এবং জনগণকে শেষ সময় পেরিয়ে যাবার আগে শেষ বারের মতো সাবধান হতে, সচেতন হতে অনুরোধ করছি। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের চুক্তি নেতিবাচক ও মারাত্মক ক্ষতিকর ফল দেবে।

এটি ছাপা হয়েছে ১১/১১/৯৭ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম-এর মন্তব্য প্রতিবেদনে।

সাপ্তাহিক বিক্রম-এর ২৫ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায়।

এটি প্রচারপত্র আকারেও ছাপা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্যচুক্তি বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা শান্তি-বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে তার ফলে শুধু যে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঁচ লক্ষ বাঙালী জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা-ই নয়, বরং এ চুক্তির ফলে দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামসহ সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আগামী মাসের যে কোনো দিন ঐ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য-চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় বসবাসরত অর্ধেক জনসংখ্যা তথা বাংলাভাষী অধিবাসীগণ মুহূর্তেই সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধ ১৩,২৫০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ–ভাগের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের সরকার, রাষ্ট্র এবং জনগণের কাছ থেকে চিরতরে বহিঃশক্তির ক্রীড়নকদের হাতে চলে যাবে।

উপরোক্ত অভিমতটি প্রকাশিত হয়েছে আমাদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত দু'টি সাম্প্রতিক গবেষণার আলোচ্য বিষয়বস্তুতে। এতদ্ব্যতীত, আমরা "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব" শীর্ষক গবেষণাভিত্তিক সেমিনার উপস্থাপনায় উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছি।

গবেষণাপত্র দু'টিতে তত্ত্ব, তথ্য ও প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত সহযোগে আমরা দেখিয়েছি যে, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক-দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির মালিকানা, প্রশাসনিক কাঠামো, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের নীতি-নির্ধারণের বিষয়যুক্ত ঐ প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পাদনে একদিকে সরকার যেমন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিসম্বলিত জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে গেছে, অন্যদিকে সরকার ঐ চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেক জনসংখ্যা (প্রায় ৫০%) বাংলাভাষাভাষীদের মতামতকেও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। তাছাড়া প্রস্তাবিত ঐ

চুক্তির ধারাসমূহের বাস্তবায়ন পার্বত্য বাংলাভাষী বাঙালী জনগণের মৌলিক অধিকার যা বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করবে। আমাদের মতে, দেশের সরকার বা কোনো গোষ্ঠী আইনসঙ্গত উপায়ে দেশের সংবিধান সংশোধন না করে কোনোমতেই এরকম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

আমাদের কর্তৃক সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত গবেষণা পত্রদ্বয়ের বিষয়বস্তু থেকে **নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হয় ঃ**

প্রথমতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদেশী মদদপুষ্ট সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রধানতঃ চাকমা-নিয়ন্ত্রিত অবৈধ ও দেশদ্রোহী তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে ইতোমধ্যে খসড়াকৃত এবং অচিরেই সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন ধারার বরখেলাফ। এ চুক্তি সম্পর্কে জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এখানে জনমত পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে; নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনকালীন কোনো ঘোষণায় এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিল না। এটি সরকারী দলের ম্যানিফ্যাস্টো ও কর্মসূচীতে নেই। জনগণ তাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো ম্যান্ডেট দেয়নি। সংবিধান, সমগ্র জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং পুরো বাংলাদেশের ভবিষ্যতের এবং এতদঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথ অনুধাবনকরতঃ বিবেচনা করলে সরকার এ ব্যাপারে অন্তত জনগণকে অবহিত করতো এবং জাতীয় সংসদেও আলোচনা করতো। সরকার ১২ কোটি মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কেবল মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী শান্তিবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে চুক্তি করে বস্তুত রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও জনগণকে অস্বীকার করেছে। আর সেজন্যই এই খসড়া ও সম্ভাব্য চূড়ান্ত চুক্তি অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানে দেশের কোনো অঞ্চলকে বিশেষ মর্যাদা বা স্বায়ত্তশাসন দান এবং এর মাধ্যমে বস্তুত "জুম্মল্যান্ড" প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়ার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ এই খসড়াকৃত সম্ভাব্য চূড়ান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান, ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্মপরিসর, কার্যধারা ও দেশ রক্ষার্থে গৃহীত তাদের যাবতীয় তৎপরতাকে খর্বিত, সীমিত ও বিপর্যস্ত করে তুলবে। বস্তুতঃ এই চুক্তির মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে কেবল সেনানিবাসে সীমাবদ্ধ করে রাখা হবে দায়িত্বহীন অবস্থায় এবং এই প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুততার সঙ্গে উঠিয়ে নেওয়া হবে দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের গভীর অরণ্য, পর্বত ও দুর্গম এলাকাগুলিতে ছড়ানো প্রায় সাড়ে পাঁচশত সেনাক্যাম্প। প্রকৃত সত্য এই যে, এই সেনা ক্যাম্পগুলিই প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করছে এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করছে।

তৃতীয়তঃ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় ঐ এলাকার সাড়ে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্প থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হলে দীর্ঘ পরিশ্রম, বিপুল অর্থ ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলা সেখানকার

অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়বে বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ঐ অঞ্চলে সৈন্য ও রসদ সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম হেলিকপ্টার যোগাযোগের জন্য সর্বাধিক জরুরী "হেলিপ্যাড"-সমূহ শান্তিবাহিনীর হাতে চলে যাবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় এগুলি পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থতঃ চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রধানমত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র "কাপ্তাই হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট" সহ অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অবকাঠামোসমূহের বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে চলে যাবে শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত চাকমা-প্রভাবিত শক্তি বলয়ের মুঠোয়। এর ফলে বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ সারাদেশের উপর অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে "স্যাবোটেজ"–এর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে।

পঞ্চমতঃ চুক্তির বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর বৃহত্তর আগ্রাসী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাভের দীর্ঘদিনের বাসনা পূর্ণ হবে। অপরপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বহিঃযোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র হাতছাড়া হবে। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে চট্টগ্রাম বন্দর কব্জা করবে এবং বঙ্গোপসাগরের উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নেপাল-ভূটানের পর্যায়ে চলে যেতে দেরী হবে না।

ষষ্ঠতঃ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু ও হালদা ভ্যালীতে যে বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে, তা সহ ঐ বিশাল অঞ্চলের যাবতীয় বনজ, খনিজ, জলজ ও ভূমিজ সম্পদরাজির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতছাড়া হবে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়। অপরপক্ষে, শান্তিবাহিনী নামধারী চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতায় ঐ সম্পদরাজির নিয়ন্ত্রণ সহজেই ভারতের হাতে চলে যাবে।

সপ্তমতঃ চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ হারালে ক্ষীণকায় মূল চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলদ্বয় ভূ-কৌশলগত এবং সামরিক-রাজনৈতিক দিক দিয়ে সহজভেদ্য ও হুমকিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

অষ্টমতঃ এই চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং দূর-প্রাচ্যের সংযোগস্থল ও প্রবেশ দ্বার (GATEWAY) হিসেবে বাংলাদেশের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব বিনষ্ট হবে। উপরন্তু এর ফলে প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের পক্ষে ভারতকে তোয়াক্কা না করে মায়ানমার দিয়ে সড়কযোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (ASEAN Countries) সংগে যোগাযোগের যে স্বাধীন সম্ভাবনা রয়েছে, তা নস্যাৎ হবে। এশিয়ান হাইওয়ের যে লাভজনক পথ বাংলাদেশের জন্য রয়েছে, চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে সে সম্ভাবনাও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নবমতঃ চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে নিজ দেশে বসবাসরত প্রায় পাঁচ লক্ষ বাংলাভাষী মুসলমান অধিবাসী বিগত আড়াই দশকের চেয়ে হাজার গুণ ভয়াবহ মাত্রায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, উচ্ছেদ ও বহিষ্কারের শিকার হবে। নব্বই ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মুসলমানরাই হবে "পুশব্যাক"-এর টার্গেট। শান্তিবাহিনীর সাথে চুক্তি সম্পাদনের ফলে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরসহ অন্যান্য সদস্য নিয়োগের যে

কর্তৃত্ব শান্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রণাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের রিজিওনাল কাউন্সিল পাবে সেটি নজিরবিহীন ও বৈষম্যমূলক বিধান। এর ফলে সেখানকার বাঙালী জনগোষ্ঠীর উপর হামলা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালু হবে। কার্যতঃ বাঙালীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পথ পাবে না। এছাড়া, আঞ্চলিক পরিষদে আনুপাতিক হারে বাঙ্গালীর প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং চেয়ারম্যানের পদ কেবল উপজাতীয়দের তথা চাকমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখায় ইতোমধ্যে নানাক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রকট বৈষম্য প্রকটতর হবে।

দশমতঃ চুক্তিটির বাস্তবায়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি স্থায়ী সংঘাতের জন্ম দেবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে বাঙালীদের উপর ব্যাপক গণহত্যা চালাবে না — এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা স্থায়ী সংকটে নিপতিত হবে। এতে দেশে গৃহযুদ্ধের আশংকাও রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট তথাকথিত "স্বাধীন বঙ্গভূমি" আন্দোলন এবং শিলচর-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত "সিলেট বিচ্ছিন্নতা"র আন্দোলনও মাথাছাড়া দিতে পারে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সংগে অসাংবিধানিক ও দেশের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী যে চুক্তি করা হচ্ছে, তার স্বাক্ষর গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বেই দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ১২ কোটি বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে একবার বিষয়টি 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এর সীমায় চলে গেলে আর কারো কিছুই করার থাকবে না।

এটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রাম, নিউ নেশন পত্রিকায়। আরো প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক বিক্রম পত্রিকায়। এটি আরো প্রকাশিত হয়েছে অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক সংকলন গ্রন্থে। এটি পঠিত হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাব-এ অতন্দ্র জনতার সেমিনারে ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭ এ। রেফারেন্স সহযোগে এর সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরে উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল,দৈনিক সংগ্রাম-এ। এটি প্রচারপত্র আকারেও বিলি করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এটির রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে আরো কিছু প্রকাশনায়। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৭। এটি আরো প্রকাশিত হয়েছে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন-এর "বিশেষ বুলেটিন" ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায়। এটি প্রচারপত্র আকারেও ছাপা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ অখণ্ড বাংলাদেশ

ড. মুহাম্মদ আবদুর রব

চক্রান্তকারী আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি শুধু হিলট্রাক্টস্‌কেই বিচ্ছিন্ন করবে না। সিলেটকেও তারা বিচ্ছিন্ন করতে চায়, যে সিলেট রক্ষা হওয়ার মাধ্যমে গণভোটের মাধ্যমে আমাদের ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। শুভপুর ব্রীজ থেকে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম তারা বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করছে। মানচিত্র হলে এখন দেখিয়ে দিতাম কি চক্রান্ত। সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারকে কেটে দেবে। বঙ্গভূমির বঙ্গসেনারা রংপুর–দিনাজপুর কেটে দিতে চায়। যা থাকবে সেটা হবে চৌকোস একটা সাইড অব বাংলাদেশ এবং এটারই ম্যাপ বা মানচিত্র তারা ছাপিয়েছে। গোটা জাতি ঘুমিয়ে আছে। বুদ্ধিজীবীরা বলছে তালপট্টি নিয়ে গেলে এটা তো মাত্র আটবর্গ কিলোমিটার। এ তালপট্টি সম্পর্কে বলতে চাই–এই আট বর্গকিলোমিটার তালপট্টি ভাটার সময় বেড়ে হয় বিশ কিলোমিটার। এ সম্পর্কে আমার একটি প্রকল্প প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমি প্রমাণ করেছি, কেউ এর বিপরীতে মত প্রকাশ করতে পারেনি। তালপট্টি একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক এলাকা। এটি শুধু ক্ষুদ্রই নয়, ক্ষুদ্রের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের শরীর।

বলা হয় ক্ষুদ্র মাথাটা তো 'এতোটুকু,' একে কেটে ফেললে কি হয়! কিন্তু মাথার সাথে সাথে যে আস্ত শরীরটাই জড়িত। আমাদের দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের সাথে বাংলাদেশের একর তৃতয়াংশ ভূখণ্ড পঁচিশ ত্রিশ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা টেরিটরিয়াল ইকোনোমিক জোনের সাথে জড়িত। আধিপত্যরা যদি মাথাসদৃশ রংপুর, দিনাজপুর কেটে দেয়, বাংলাদেশের সিলেটরূপী স্বীকৃত কেটে দিলে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পা কেটে দিলে আপনাদের জন্য একটা চৌকোণা বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে। বুকের রক্ত দিয়ে সেই চক্রান্ত রুখে দেয়ার জন্যে জনগণ নির্বিশিষে ধর্ম বা নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক ঐক্যবদ্ধ হতে হবে–এটাই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আসল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা দেখি বেশীর ভাগ পত্রিকায় খবরই দেন না। আপনারা হোন জনকণ্ঠের বা ভোরের কাগজের বা আজকের কাগজের কিন্তু আপনারা বুদ্ধিজীবী। এই ভয়াবহ জিনিস আপনারা দিব্যি চোখে দেখছেন আপনাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি তারপরও আপনারা মনে করছেন এটা তো বি,এন,পির, এটা তো জামাতের কথা, এখন তো জাগপা'র কথা। মনে রাখবেন এটা বি,এন,পি, জামাতের

দায়-দায়িত্ব নয়। এটার দায়-দায়িত্ব বর্তায় বাংলার বার কোটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং সব ধর্মের মানুষের। এটা বি,এনপি, জামাতের নয় আওয়ামী লীগসহ সকল দলের রয়েছে এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব।

সুধীমণ্ডলী, আমাদের বিদ্রোহী বিপথগামী মাত্র পাঁচ ছয় হাজার শান্তিবাহিনী, সেখানের মধ্যে ত্রিপুরা, মারমা, তনচংয়া, গম, খুনী এরা কিন্তু ঐসব চক্রান্তের সাথে জড়িত নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তারা সমর্থন করে না। চাকমারা মাত্র ২২, ২৪%। ত্রিপুরা হিন্দু, ডোমরা সব খৃষ্টান হয়ে গেছে, খুনীরাও কনভার্টেড হয়ে গেছে, চাকমারা হলো বৌদ্ধ। এরপর সাংস্কৃতিকভাবে, নৃতাত্ত্বিকভাবে আচার-আচরণেও তাদের সাথে মিল নেই। যে জুমল্যান্ডের কথা শোনা যাচ্ছে তা আসলে জুমল্যান্ড মাত্র হবে না, তা হবে বিদেশী প্রভুদের নিয়ন্ত্রিত একটা চাকমাল্যান্ড। আর জুম প্রাকটিস করে শতকরা পাঁচ ভাগেরও কম। কাজেই জুমল্যান্ডের যুক্তিও ধোপে টিকে না। কাজেই শংকার কথা ওটা নয়। শংকার কথা হচ্ছে ভারতের সুদূর অরুণাচলে একলক্ষ চাকমা বসবাস করে। ত্রিপুরায় পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় চাকমা রয়েছে। মিজোরামে চার–পাঁচ লক্ষ চাকমা রয়েছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, সুদূর সাংরাজ্য অর্থাৎ বার্মার উচ্চভূমিতে এমন কি আরাকান এলাকায় বিপুল সংখ্যক চাকমা রয়েছে। বাংলাদেশে যে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আছে, সেখানে এর চার-পাঁচ গুণ চাকমা আছে এবং যারা এই বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদ দিচ্ছে তারা ঐ চাকমাদেরকে নিয়ে শান্তিবাহিনীর দশজন বেশী পঞ্চাশ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসবে, তাদেরকে আপনি কিভাবে রুখবেন সেনাবাহিনী সেখান থেকে তুলে আনলে। এসব চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে বলা যায়, "বাংলাদেশকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"–সেই তারা হচ্ছে ভারতীয় চাকমা। যদি আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয় তারা এসে আমাদের নিরীহ ভুখানাঙ্গা, গরীব–দরিদ্র বাংলাদেশের মানুষ, পাহাড় কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে সে ভূমি আবাদ করেছে। আমাদের সাংবিধানিক অধিকারে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগযুগ ধরে বসবাস করছে এবং যারা পাহাড়ী শ্বাপদ–সংকুল অরণ্যকে বাসযোগ্য করেছে বংশপরম্পরার তাদেরকে বিদায় করার চক্রান্তকারী ঐ চাকমারা এদেশের চাকমা নয়। এদেশের চাকমারা আমাদের ভাই। এরা এদেশে আসবে, তাদের অধিকার আছে। সম্মানের সাথে সমতার অধিকারে তারা থাকবে। সব জাতি থাকবে সেখানে, বাঙালীরা থাকবে, চাকমারা থাকবে, মারমারা থাকবে সবাই থাকবে। কিন্তু ভারত থেকে চাকমাদের আসার এ তথ্য বোধ হয় আমিই এখানে বললাম। সুতরাং এ তথ্যটা প্রণিধানযোগ্য। আমাদের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গপোসাগর। একদিকে বিশ্বের সাথে আমাদের সংযোগ। সেটি হলো বার্মার সাথে। 'হিলট্রাক্ট' যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আমরা চারদিকে ভারত দ্বারা Land Blocked হয়ে যাবো। সুতরাং এটাও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অতন্দ্র জনতা, বাংলাদেশ-এর সেমিনারের প্রদত্ত বক্তৃতা। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তন। ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৭। আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ, অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।

অষ্টম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব

ভূমিকা

সম্পদ-সম্ভাবনা আর সমূহ সমস্যায় সমাকীর্ণ পার্বত্য-চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগলিক এলাকা বিস্তৃত পার্বত্য-চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে হালকা জনসংখ্যা অধ্যুসিত অথচ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। দেশের তিনটি পার্বত্য প্রশাসনিক জিলার সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চলটির বেশীর ভাগ ভূমিই বনভূমির অন্তভূক্ত এবং এই অঞ্চলটির জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠই নানা মঙ্গোলীয় অভিবাসী বসতিস্থাপনকারীদের অন্তুর্গত। উচুঁ-নিচু পাহাড়-পর্বত, পার্বত্য নদ-নদী, উর্বর উপত্যকা আর দূর্গম ঘন চির-হরিৎ বনভূমি অঞ্চলটিকে দান করেছে এক অনন্য নিসর্গ আর বৈচিত্রময় ভূগোল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ-এশিয়ার পূর্বাংশে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রায় ২১০২৫ থেকে ২৩°৪০' উত্তর-অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৫' থেকে ৯২°৪৫' পূর্ব-দ্রাঘিমাংশ ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পর্বতশংকুল জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা "Chittagong Hill Tracts" এর অবস্থান। বাংলাদেশের প্রশাসনিক তিনটি জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন এর মোট ১৩, ১৪৮ বর্গ কি. মি বা ৫°৮৯ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্রগামের অন্তর্ভূক্ত (B.B.S 1991) [১নং মানচিত্র]

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিতি, বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার অসমসত্ব উপস্থিতি আর বর্তমান বিশ্বের দুই উদীয়মান পরাশক্তি চীন ও ভারতের এলাকাটির বিশেষ কাছাকাছি অবস্থান এবং অঞ্চলটি থেকে অনায়াসে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের উন্মুক্ত নীল জলভাগে প্রবেশের সুবিধার সম্ভাব্যতা পার্বত্য-চট্টগ্রামকে বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে করে তুলেছে বিশেষ গুরুত্ববহ। অন্যদিকে, অঞ্চলটির বিপুল ভূমি সম্পদ অপরিমেয় আর প্রায় অব্যবহৃত পানিসম্পদ, মুল্যবান বনজসম্পদ এবং সম্ভাবনাময় অনাবিস্কৃত কিংবা অনাহরিত খনিজ সম্পদ জন ভারাক্রান্ত আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য-চট্টগ্রামকে এক অপরিহার্য

মহামূল্যবান অঙ্গে পরিণত করেছে। একজন সুস্থ্যসবল মানুষের দেহে যেমন তার একটি হাত বা একটি পা অত্যন্ত মূল্যবান অপরিহার্য অংশ তেমনি একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য পার্বত্য-চট্টগ্রামের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থ জড়িত। পার্বত্য-চট্টগ্রাম বাংলাদেশী জাতির জন্য ভবিষ্যত সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং অফুরন্ত ভান্ডার; সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর বা "Land of Promise" (Ahmed and Rizvi, 1951).

পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনের বিশালতায় বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ হলেও জনসংখ্যার হিসেবে ঐ অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ লোক বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬০% মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি প্রায় ৪০% বাংলা ভাষাভাষী নতুন বসতি স্থাপনকারী সমতলভূমির লোকসংখ্যা। পাহাড়ী জাতিভুক্ত মোট জনংখ্যা আবার ধর্ম, ভাষা ও জাতি তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রায় এক ডজন উপজাতিতে বিভক্ত– যাদের পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আচরনিক দিক দিয়ে মিলের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি প্রখর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের মধ্যে পূর্ব থেকে সঞ্চিত অসন্তোষ আরো বেশি করে ধূমায়িত হতে থাকে এবং ১৯৭৫ সালের পর তা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (Montee, 1981)। অচিরেই এই আন্দোলন সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয় এবং বিশ্বের অন্যান্য নানা স্বার্থান্বেষী শক্তির হস্তক্ষেপের প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতবাদী উপজাতীয় তরুণদের ঐ তৎপরতা বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগোলিক এলাকার অস্তিত্বকে এক প্রচণ্ড হুমকির মুখে নিক্ষেপ করে (Hossain, 1990 and Alam & Akhter, 1990)। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং অঞ্চলটির অফুরন্ত সম্পদ সম্ভাবনার নিরিখে বাংলাদেশসহ অঞ্চলসংলগ্ন অন্যান্য শক্তিসমূহের কাছে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের সামরিক, রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক সকল প্রচেষ্টাই এখন পর্যন্ত কোন দৃশ্যমান সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সকল তৎপরতা এখনো চলছে। কিন্তু সমস্যাটি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমানে একটি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে (Shelley, 1992)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল

বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড়ী এবং বনাবৃত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত। বৃটিশ রাজত্বকালে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকারের ২২তম প্রশাসনিক এ্যাক্ট বলে বৃহত্তম চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামের একটি আলাদা প্রশাসনিক জেলা গঠন করা হয়(Shelley, 1992)। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটিমাত্র বৃহত্তর জেলা লি যা ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি– এই তিনটি প্রশাসনিক পার্বত্য জেলায় বিভক্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও বার্মার পশ্চিম সীমান্তের সাথে ভৌগলিকভাবে যুক্ত। অঞ্চলটির পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য (সাবেক লুসাই হিলস্ অঞ্চল), দক্ষিণে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকান রাজ্য, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত (Amin, 1988/89)।

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এলাকাটি ফেনী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী এবং এদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপ-নদী, শাখা-নদীর উপত্যকায় সুস্পষ্ট চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এসব উপত্যকার মধ্যে চেঙ্গী উপত্যকা (Changi Valley), কাসালং উপত্যকা (Maini Valley), রাইনখিয়াং উপত্যকা, সাঙ্গু উপত্যকা উল্লেখযোগ্য। এসব উপত্যকাগুলো ৩০ থেকে নিয়ে ৭০/৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং গড়ে ২-৩ কি.মি. থেকে ৮/১০ কি.মি. প্রশস্ত হয়ে থাকে। চেঙ্গী ভেলী বা মহালছড়ি উপত্যকা প্রায় ৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং গড়ে প্রায় ৬.৫ কি.মি. প্রশস্ততাবিশিষ্ট একটি উর্বর ঢালু সমভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐসব উপত্যকার সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত দীর্ঘ এবং মাঝারি উচ্চতার কয়েক সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েক শ' মিটার থেকে নিয়ে ১০০০ মিটারের চেয়েও বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শ্রেণী দেখা যায় (যেমন, মওডক, মুয়াল-এর উচ্চতা ১০০৪ মিটার)। দুটি পর্বতমালার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপত্যকাকে কোন কোন স্থানে ২০/৩০ কি.মি. পর্যন্ত প্রশস্ত হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলের পর্বতমালাকে লোয়ার ইয়োসিন যুগের টারশিয়ারীকালের বেলে পাথরে গঠিত আরাকান-ইয়োমা ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা হয় (Rizvi, 1952 and Ahmad & Rizvi 1951)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীসমূহও নদী অববাহিক এবং উপত্যকাসমূহের মত পরস্পর থেকে সমারাল থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিতভাবে সুবিন্যস্ত। বেলে পাথর ছাড়াও ঐসব পর্বতমালার শিলা গঠনে কালো শিলা, শে'ল, কংগ্লোমারেট এবং কোন কোন স্থানে চুনা পাথরের অস্তিত্ব দেখা যায় (Wadia, 1953)।

কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ফেনী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান নদ-নদী। ঐ সব নদ-নদীর বেশির ভাগই স্থানীয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী অববাহিকা-উপত্যকাগুলোর মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমে মোড় ঘুরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী, ফেনী ও মাতামুহুরী পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে চট্টগ্রামের সমতল এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। ঐসব নদ-নদী এবং এগুলোর উপনদীসমূহের অববাহিকাসমূহ ২-৩ কি.মি. থেকে নিয়ে ৮/১০ কি.মি. পর্যন্ত প্রশস্ত। অত্যন্ত উর্বর এসব অববাহিকা কৃষি কাজ, বিশেষ করে ফল-মূল এবং শাক সব্জির (Horticulture) চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অববহিকাগুলোর কোন কোনটি ৩০/৪০ কি.মি. থেকে নিয়ে ৭০/৮০ কি.মি. কিংবা তার চেয়েও বেশি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হওয়ায় এসব দীর্ঘ এবং প্রশস্ত অববাহিকায় অনেক বর্ধিষ্ণু লোকালয়, শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, চন্দ্রঘোনা এমনি অববাহিকার কোলে গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য শহর। অত্যন্ত খরস্রোতা এবং গভীর অববাহিকায়

প্রবাহিত ঐসব নদ-নদী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী (Johnson and Ahmed, 1957)। কর্ণফুলী নদীতে একই উদ্দেশ্যে বাঁধ দিয়ে একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ (Lake) তৈরি করা হয়। কাপ্তাই নামক স্থানে ১৯৫৭ সালে কাজ শুরু করে ১৯৬৩ সালে ঐ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয় এবং এর ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৪০০ বর্গ কি.মি. বা ২৫৬ বর্গমাইল (Khisha, 1966)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের চেঙ্গীভেলী, মাইনি ভেলী এবং কাসালং ভেলী দীর্ঘ ও প্রশস্ত অববাহিকার পূর্বাংশের সাজেক ভেলী এবং দক্ষিণাংশের সাঙ্গুভেলী, রেইংখিয়াং ভেলী ও মাতামুহুরী ভেলী তুলনামূলকভাবে গভীর এবং অপ্রশস্ত অববাহিকা। উত্তরাংশের পর্বতগুলোর তুলনায় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পর্বতমালাসমূহও বেশি খাড়া।

জলবায়ুগত দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জ মণ্ডলীর উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মৌসুমী বায়ু প্রভাবিতপার্বত্য-চট্টগ্রামের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০ সে. মি. (Rashid, 1991)। পার্বত্য-চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত টোঙ্গা ও তিয়াম্বাং (কক্সবাজারের পূর্বাঞ্চলে)-এ প্রায় ৫০০ সে. মি, মধ্যাংশের নাইখ্যাংছড়িতে ২৯৫ সে. মি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লামা বাজারে ৩০০ সে. মি. মাইনিমুখ-এ ২৫৯ সে. মি, কাপ্তাই-এ ২৮২ সে. মি. এবং রাঙ্গামাটিতে ২৫৭ সে. মি.। পার্বত্য-চট্টগ্রামের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং গড় গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস। এখানে শীত ঋতু থাকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। শীতকালে গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস। তবে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ৪০°/৪২° সেঃএবং শীতকালে সর্বনিম্ন ৪°/৫° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানানামা করে।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের মৃত্তিকা "অশ্রেণীভুক্ত পাহাড়ী মৃত্তিকা" (Unclassified Hill soils) হিসাবে চিহ্নিত (Hutchinson, 1909 and Rashid, 1991) । বেলে পাথর, নুড়িপাথর, শেল এবং কাদা পাথর চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে চূর্ণিত উপাদানের সাথে উদ্ভিজ্জ উপাদানের যুক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিক গঠিত হয়। পাহাড়ের ঢালে এবং উচ্চ অসমান স্থানে মৃত্তিকা কম উর্বর এবং গভীরতাও কম এবং বর্ণ হালকা। পক্ষান্তরে সমতলে এবং অববাহিকার নিম্ন এলাকায় বেশি গভীরতা সম্পন্ন গাঢ় বর্ণের উর্বর মৃত্তিকা দেখা যায়। বনাঞ্চলেও জৈব উপাদান সমৃদ্ধ গাঢ়বর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়। সাম্প্রতিককালের ফরেস্টাল রিপোর্ট অনুসারে পার্বত্য-চট্টগ্রামের মৃত্তিকাকে ধর্ম ও গুণানুসারে সাতভাগে ভাগ করা যায়(Forestal Report-1966)। এ সব মৃত্তিকার মধ্যে কাঁদা-দো আঁশ, বেলে দোঁআশ এবং পলি কাঁদা (clay loam, sandy loam and silty clay) উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য-চট্টগ্রামের মোট মৃত্তিকা পরিসরের ৬৭% ভাগই পলিকাদা দো-আঁশ শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকা। এখানকার বেশীর ভাগ মৃত্তিকাই বড়দানা বিশিষ্ট মাঝারি উর্বরতা সম্পন্ন এবং কমপানি ধারনে সক্ষম। নদী অবাহিকাগুলোর মৃত্তিকার উর্বরতা খুবই বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির অর্ধেকেরও চেয়েও বেশি অংশ বনাচ্ছাদিত পাহাড়ী অঞ্চল। এখানকার এ' সব বনভূমি এবং অন্যান্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ চিরসবুজ এবং পর্ণমোচি বৃক্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ চিরসবুজ এবং পর্ণমোচি বৃক্ষ এবং

ঘনঝোপ ঝাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। পার্বত চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মোট ১০২৬ বর্গ কিঃ মি. এবং দক্ষিণাংশে মোট ৫১২ কি. মি. সংরক্ষিত ঘন বনভূমি রয়েছে। বাকি বনাঞ্চলের প্রায় ৫৪০০ বর্গ কি. মি. এলাকা অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত। এসব বনাঞ্চলে সেগুন, তূন, তেলসুর, গর্জন, জারুল, গামার, কড়ই, চাপালিশ, বাঁশ এবং বেত ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেগুন, মেহগনি এবং রাবার, চা ইত্যাদির বাগান এখানে সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সর্বমোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭০৪৬ বর্গ কি. মি. (Rashid, 1991)। এসব বনভূমি থেকে আহরিত কাঠ এবং অন্যান্য মূল্যবান বনজ সম্পদ থেকে দেশ প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লাভ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজসম্পদ ভুক্ত কাঠ এবং বাঁশের উপর নির্ভর করে এখানে গড়ে উঠেছে কয়েকটি পাল্পউড, রেয়ন এবং কাগজ শিল্প। চন্দ্রঘোনার বিশালায়তন পেপার মিলটির মূল কাঁচামাল বাঁশ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে। বনাঞ্চলের সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণী যেমন হাতী, ব্যাঘ্র, বানর, বনগরু (গয়াল) ইত্যাদি এবং নানা প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য পাখ-পাখালি বাংলাদেশের অমূল্য জাতীয় সম্পদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যা, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং জাতিতাত্ত্বিক বিভিন্নতার মধ্যেই ঐ এলাকাটির বর্তমান অশান্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদিতার কারণ নিহীত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামই বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল যেখানকার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবাঙালী এবং অমুসলিম। অঞ্চলটি মূলত একটি মিশ্রজন গোষ্ঠী অধ্যুসিত বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, নানা ভাষা-ভাষি এবং নানা ধর্মাবলম্বী এবং বহু সংস্কৃতিবিশিষ্ট জনসংখ্যার একটি এলাকা। নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা এখন অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠীই এখানকার মূল আদিবাসি (Aborigins) বা, ভূমিপুত্রের (son of the soil) দাবিদার হতে পারে না (Lewin, 1869); Khisha, 1964, Bernol, 1960, and Ahmed, 1990)। এসব গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীই আগে বা পরে পার্শ্ববর্তী অর্থবা একটু দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল বা সমতল ভূমি থেকে দেশান্তরী হয়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং নিবাস গড়ে তোলে। শত শত বছর পাশাপাশি অবস্থান করলেও এসব বিভিন্ন জন গোষ্ঠীর বেশিরভাগই নিজেদের স্বাতন্ত্র বহুলাংশে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এদের মধ্যে কোন কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে বড় এবং প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টাবলীর কিছু কিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন, চাকমারা শক্তিশালী, বাঙালীদের ভাষা এবং খাদ্যাভ্যাস এবং টিপরা (ত্রিপুরা)রা হিন্দুধর্ম এবং লুসাই ও বোমরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তথাপি ঐসব প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়াদির অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অনেক অংশই বজায় রেখে চলেছে।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈচিত্রের দাবিদার যেখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বন্টন অত্যন্ত হালকা এবং অনিয়মিত। বর্তমানে এখানে মাত্র ১০ লক্ষের মত লোক বসবাস করে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল, ৯,৬৭,৪২০ এবং জনসংখ্যার বন্টনের গড় ঘনত্ব প্রতিবর্গ কি. মিটারে ১৯০ জন (P.R.P.C; 1991) । এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের গড় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. এ প্রায় ৮০০ জন। বন্ধুর পার্বত্য ভূমিরূপ, ঘন সংরক্ষিত অরন্যাচ্ছাদিত পরিসর এবং প্রতিকুল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঐ এলাকাটিকে এতকম জন অধ্যুসিত রাখতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশদের আগমন থেকে নিয়ে বৃটিশ রাজত্বের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৭৬২-১৮৯২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ১৭৬০ সালে ঐ অঞ্চলের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। ১৮৯২ সালের পরিসংখ্যানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১,০৭,০০০-এ। উচ্চমৃত্যুহার এবং অভিগমন আইনের কড়াকড়ি এখানকার ঐ সময়ের জনসংখ্যার এই স্থবিরতার জন্য দায়ী (Shelley, 1992)। বর্তমান শতকের প্রথমভাগ থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যাছিল মাত্র ৩,৮৫,০০০। ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫,০৮,০০০। ১৯৮১ সালে দাঁড়ায় ৭,০৮,৪৫৬ জনে এবং ১৯৯১ সালে এর সাথে যুক্ত হয় আরো ৩ লক্ষ। নিচের সারনী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও বন্টন চিত্র দেখা যায়ঃ

সারণী-১

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বন্টন চিত্র

সন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১
মোট জনসংখ্যা	২,৯০,০০০,	৩,৮৫,০০০	৫,০৮,০০০	৭,০৮,৪৫২	৯,৬৭,৪২০
প্রতিবর্গ কি. মি-এ ঘনত্ব	৫৭ জন	৭৫ জন	১০০ জন	১৪৭ জন	১৯০ জন

Source : (Statistical year book of Bangladesh, 1982 and (ii) preliminary Report of Population Census , B. B. S, 1991.

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ মোট ৪,৯৮,৫৯৫ (১৯৯১) জন অবাঙ্গালী বা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ থেকে আগত চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের ভাষা স্থানীয় এবং চাটগাইয়া বাঙলা ভাষার মিশ্ররূপ। মারমা জনগোষ্ঠী আরাকান থেকে আগত মগ উপজাতিভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ভাষা, আচরণ ও জীবনাচরণের দিক দিয়ে এরা চাকমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ভাষা আরাকানী বর্মী উপভাষা (Ahmed, 1990 P-63)। টিপরা বা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী পার্বত্য

Reoprt, 1964)। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, পার্বত্য, বন্ধুর এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ঐ অঞ্চলের ভূমির উপযোগমান এবং বাঁধন ক্ষমতা খুবই কম (least carrying capacity of the land)। তাঁরা যে ভুলটি প্রথমেই করেছেন তা' হচ্ছে, অসমর্থিত এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রায় তিন দশশক আগে সংগৃহীত জরীপের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভুল পরিসংখ্যানকে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের উপাত্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বর্তমান নিবন্ধের লেখকের নিজস্ব "রিকনেসেন্স" জরীপের ভিত্তিতে এবং সংগৃহীত বিমানচিত্র ও ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেঙ্গী চেলী, সাঙ্গুভেলী, মাতা মূহুরী ভেলী, মাইনী ভেলী এবং কামলিং ভেলী প্রভৃতি দীর্ঘ এবং যথেষ্ট প্রশস্ত উপত্যকায় শুধুমাত্র উন্নত বর্তমান মোট জনসংখ্যার (১০ লক্ষ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান মোট জনসংখ্যার (১০ লক্ষ) প্রায় পাঁচ গুণ বেশি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার স্থান সংকুলান এবং সুষ্ঠু জীবিকার সংস্থান হতে পারে। তাছাড়া উর্বর এবং যথেষ্ট জৈব-সার মিশ্রিত পার্বত্য ঢালে ফিলিপাইন, জাভা কিংবা হাওয়াইর মত "ধাপ বা Terrace" কেটে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল পার্বত্য বৃষ্টি ব্যবস্থার মতো লাগসই পদ্ধতির চাষাবাদ করে এবং হার্টিকালচার (Horticuture) বা ফলমূলের চাষ এবং বাগান চর্চার (Plantation) মতো উপযুক্ত বিকল্প অর্থনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে অনায়াসেই পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিপুল অসুবিধাজনক পার্বত্য বন্ধুর ভূমিরূপকে অনুকূল এবং কয়েকগুণধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন উপযুক্ত ভূমিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এ গেলো কৃষি অর্থনীতির কথা। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বান্দরবান কিংবা প্রলম্বিত দীর্ঘ উপত্যকাগুলোর বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা যেতে পারে অনেক সংখ্যক ছোট এবং মাঝারি "শিল্প-নগরী" (Industial townships) বা পর্যটন উপশহর (tourism-subsurbs) এর মতো সেটেলাইট টাউন) satalite town)। কুটির শিল্প, গার্মেন্টিস শিল্প, ফলমূল বা খাদ্য দ্রব্য (যেমন জ্যাম, জেলী, সিরাপ ইত্যাদি) প্রকৃযাজাতকরণ শিল্প এমনকি নানা ধরনের রাসায়নিক বা নির্মাণ-ধর্মী মাঝারি স্কেলের শিল্পায়নের মাধ্যমে এখানে পরিকল্পিত নগরায়ন স্বার্থক করে যুক্তি সঙ্গতভাবেই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেনেভা, বৈরুত বা হংকং এর মতো উন্নত নগরী সমৃদ্ধ উৎপাদনমুখী ঘন লোকালয়ে পরিণত করতে পারি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানে ব্যবহৃত ত্রুটিপূর্ণ যেসব ভূমি ব্যবহার জরিপ রিপোর্ট বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় (ফরেস্টাল রিপোর্টসহ, Forestal Report 1966) সেগুলোর উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালে সেখানে বনভূমি ছাড়া মোট আবাদী জমি বা Total Cropped Area-র পরিমান প্রায় ২,৪৪,৩৮০ একর ছিল বলে দেখতে পাই। ঐ সময় নিট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ১,৫৮,৩৪০ একর এবং সাময়িকভাবে অব্যবহৃত বা ব্যবহার উপযোগী পতিত মোটভূমির পরিমাণ ছিল প্রায় আরো ৩০,০০০ একর। কাপ্তাই হ্রদের জলাধারে নিমজ্জিত মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ একর যা মৎস্য চাষ বা জলজ ফসল চাষে (Acqua culture) ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে দেখতে পাই যে, বনাঞ্চল ও পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিকূর ভূমি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নত, মধ্যম এবং নিম্নমানের (`A' 'B', 'C' and 'D' Categories) প্রায় ৫ লাখ একর কৃষিযোগ্য ভূমি এখনই প্রস্তুত রয়েছে। ঐসব জমিতে বর্তমানে মান্ধ্যাতার আমলের

কৃষিপদ্ধতিতে ধান এবং অন্য ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তির কৃষি কাজের মাধ্যমে অত্যন্ত উর্বর ঐ ৫ লক্ষ একর জমিতে কৃষি কাজ করে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের ১০ গুণ কিংবা তারও বেশি পরিমাণ "বিকল্প ফসল"-এর উৎপাদন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই অসম্ভব নয়। এর ফলে অতি সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সাধারণ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আইনজীবী চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় নিতান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার যুক্তিকে দাড় করাতে গিয়ে যে নিবন্ধ রচনা করেছেন তাতে উপাত্তগত শক্তি এবং বিজ্ঞানগত যথেষ্ট সমর্থন না থাকার ফলে বিশ্লেষণটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার আসল চিত্রটি প্রতিভাত হতে পারেনি (Roy, 1992)। নিচে বিশ্বের কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের বর্তমান ভূমি ব্যবহার চিত্রের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামাঞ্চলেরর ভূমির পরিমাণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সম্ভাব্য ধারণ ক্ষমতা এবং ভূমি সম্পদ চিত্রের একটি ধারণা পেতে পারি।

সারণী-৩

দেশ	মোটএলাকা (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা	কৃষি ভূমি%	অকৃষি ভূমি%
লেবানন	১০,৪৫২ কি. মি.	৩০,০০,০০০	৩০%	৭০%
সাইপ্রাস	৯,২৫১ ,,	৭,৫০,০০০	৩২%	৬৮%
ইসরাইল	২০,৭০০ ,,	৪৬,০০,০০০	১৮%	৮২%
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৩,১৮১ ,,	১০,০০,০০০	৫%	৯৫%
সিঙ্গাপুর	৩৬০ ,,	৩০,০০,০০০	২০%	৮০%

Source : ১. Gordon (1980), ২. Marksides (1977), ৩. Frankel (1980), ৪. Eneyclopedia Britanical (1983), ৫. Shelley (1992).

বিশ্বের প্রায় পৌনে দু'শ' ছোট বড় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধশতাধিক রাষ্ট্রের আয়তন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন অপেক্ষা কম। বিশ্বের অন্তত ঃ ২৫/২৬টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের আয়তন এবং ভূমিসম্পদের অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের আযতন ও ভূমিসম্পদের অবস্থার চাইতেও দুর্বল। তবুও ঐসব দেশ অতিসহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করে অর্থনীতিক উন্নয়নের সূচকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের তালিকায় নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে (Gordon, 1980 and Marksides, 1977)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মধ্য প্রাচ্যের লেবানন, ইসরাইল কিংবা কুয়েত, কাতার এবং ভূ-মধ্যসাগরের সাইপ্রাস পৃথিবীর ক্ষুদ্র অথচ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত। লেবানন, সাইপ্রাস, কিংবা ইসরাইল তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রও নয়। লেবাননের আযতন পার্বত্য চট্টগ্রামের চাইতে অনেক কম এবং লেবানন পার্বত্য চট্টগ্রামের মত এত সুজলা, সুফলাও নয়। দেশটি একটি আধা শুষ্ক পার্বত্য ভূমি। এদেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সমতল কৃষিযোগ্য ভূমি বেকা উপত্যকা (Becaa valley) পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গী, সাঙ্গু, কাসালং, সাজেক

কিংবা মাতামুহুরী যে কোন একটি উপত্যকার তুলনায় নিতান্তনগণ্য। তবুও এই অনুর্বর আর পাহাড়ী রাষ্ট্র লেবানন বর্তমানে প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ লোক সংখ্যাকে অত্যন্ত অনায়াসেই ধারণ করতে পেরেছে। উন্নত প্রযুক্তি আর পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে রুক্ষ, বিরান প্যালেস্টাইনের মরুময় আর পাহাড়ী ভূমিতে গড়ে উঠেছে ৪৫/৫০ লক্ষ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ইসরাইল (Brawer, 1988)। তাছাড়া প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদশূন্য সাবেক ফরমোজা দ্বীপের ছোট্ট পরিধীতে গড়ে উঠেছে এশিয়ার অন্যতম নব্য অর্থশক্তি তাইওয়ান। ঠিক এমনি ক্ষুদ্রায়তন প্রাকৃতিক সম্পদহীন সিঙ্গাপুর এবং হংকং ও ধারণ করতে পেরেছে বিপুল জনসংখ্যাকে। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পায়ন, নগরায়ন আর সমস্ত জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল নিরলস কর্মতৎপরতা ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দুর্বল ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলোকে এমনি উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। সমুদ্র বন্দর থেকে মাত্র ৪০/৫০ মাইল বা ৭০/৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত বাংলাদেশের সুজলা সুফলা পার্বত্য চট্টগ্রামও একই পথে সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষতা লাভ করে সহজেই বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচ গুণ কিংবা তার চাইতেও কয়েকগুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করতে পারে (Rob, 1990)। হিসাব করে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত নিচু পার্বত্যসমূহের গাত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধাপ কেটে (Trrracing) কৃষি ভূমি তৈরি করলে ভূমির 'ত্রিমাত্রিক" (Three-Dimensional Use) ব্যবহারজনিত কারণে এখানকার মোট সম্ভাব্য ভূমিব্যবহার কমপক্ষে প্রায় আরো ৫০০,০০০ একর নতুন জায়গায় পরিব্যাপ্ত হতে পারে (Rob, 1990)। এভাবে আমরা দেখি যে, উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক পন্থার ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির প্রচলন হলে পার্বত্য এলাকার মোট জমির পরিমাণ সমতল ভূমি থেকে প্রায় দেড় গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। টেরেসিং-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রচলনের সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনায়াসেই কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ আরো দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারি। তা'ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে সকল উপত্যাকা বা নদী অববাহিকা রয়েছে তার দৈর্ঘ্য বরাবর দু'পার্শ্বের নিচু উর্বরা সমতল এবং মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমির মোট পরিমাণ ২,৫০,০০০ একর থেকে, ৩,০০,০০০ একরের মধ্যে। শুধু মাত্র এই বিপুল পরিমাণ উর্বর সমতল ১ম শ্রেণীর কৃষিভূমিতে উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থার চাষাবাদ করলে "বর্তমানের কৃষি প্রগাঢ়তা (Cropping Intensity) আরো বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মোট ফলন বা উৎপাদন (Yield) কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বা ভূমির ধারণক্ষমতা সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক বা হতাশ চিত্র আমরা দেখতে পাই তা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিবেচ্য। তাছাড়া কোন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ রিপোর্টে এখানকার ভূমি ব্যবহারের যে মনগড়া পরিসংখ্যান যেমন, পাহাড়ী জমি ১,২৫,০০০ একর, মিশ্র জমি, ১,০০,০০০ একর, ধানী জমি ৬২,৫০০ একর ইত্যাদি দেখানো হয়েছে তা আদৌ বাস্তবতা সম্মত নয় বা সত্যও নয়। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত কোন সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার জরীপই (Land use Survey) সম্পাদিত হয়নি (Rob, 1990, and Rob, 1989)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহারচিত্র বর্তমানে যদিও ১৯৬৬ সালে সম্পাদিত (The Forestal Report 1966)" -এর সাথে মোটেও মিল খাবে না তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বর্তমানে এখানকার বেশির ভাগ জমিই কৃষি কাজের অনুপযুক্ত পাহাড়ী এবং বনাবৃত ভূমি। যে কোন ব্যবহারের জন্যই নতুন ভূমি যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামে বের করতে হয় তবে অবশ্যই এর সিংহভাগই পাহাড়ী এবং মিশ্র বনবিভাগের আওতাধীন ভূমি থেকে গ্রহণ করতে হবে। নিচে ১৯৬৫-৬৬ সালে ভূমি-প্রশাসন রিপোর্ট (পূর্ব-পাকিস্তান) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার চিত্রের পরিসংখ্যান দেখানো হল ঃ

সারণী-৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার চিত্র (একরে) ১৯৬৬

ধরন	পরিমাণ
১। বনাচ্ছাদিত ভূমি	২৯,০২,৭৩৯ একর
২। কৃষির অনুপযোগী ভূমি	২,৭০,৯৮১ একর
৩। কৃষির উপযুক্ত পতিত ভূমি	৪৫,০০০ একর
৪। কৃষিভুক্ত ফসলী ভূমি	১,৩০,০০০ একর
৫। সাময়িক (বর্তমান) পতিত ভূমি	১,০৮,০০০
৬। বহু কসলী জমি (নিচু)	৯৩,০০২ একর
৭। মোট চাষভুক্ত ভূমি	২,২৩,০০২ একর
৮। সর্বমোট জমির পরিমাণ	৩২,৫৯,৫২০ একর

Source : Chittagong Hill Tracts District Gazeteer, 1974, P.125,

কৃষিসম্পদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার বেশিরভাগই কৃষি নির্ভর তৎপরতার সাথে জড়িত। আজ থেকে প্রায় পৌণে দু'শ বছর আগে ১৮১৮ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে হাল চাষের প্রচলন করেন (Khan and Khisha 1970) । তার আগে ঐ অঞ্চলে 'ঝুম' পদ্ধতিই (Shifting cultivation) একমাত্র কৃষি হিসাবে চালু ছিল। 'ঝুম' পদ্ধতির আদিম কৃষিতে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল সাফ করে পুড়িয়ে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরীত পদ্ধতিতে একই সাথে নানা ফসলের চাষকরা হয়ে থাকে। সময়ের পরিক্রমনে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশই ঝুম চাষের সাথে জড়িত। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রায় ১৫,০০০ পার্বত্য পরিবার প্রায় ২৪,৩০০ হেক্টর পার্বত্য ভূমিতে, ঝুম চাষ করে জিবীকা নির্বাহ করে থাকে (Rob, 1989)। উপরন্তু, বর্তমানে ঝুমচাষকে ঐসব পাহাড়ীর পরিবারের বেশির অংশই তাদের সহজীবিকা হিসাবে (Subsidiary Economic Activity) গ্রহণ করেছে।

১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৫০ হেক্টর উপত্যকাভূমিতে হালচাষ (লাঙ্গল বলদ চালিত) করা হত এবং এরমাত্র তিনযুগ পর ১৯০০ সালে হালচাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫০ হেক্টরে (Hutchinoson, 1909)। এভাবে ক্রমে অত্র এলাকার সমতল উপত্যতায় হালচাষ কৃষির প্রচলন বাড়তে থাকে এবং অনিবার্য কারণে

প্রাচীন স্থানীয় পদ্ধতির 'ঝুম' চাষ হ্রাস পেতে থাকে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমাগত 'ঝুম'চাষের ফলে পার্বত্য ভূমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং সাম্প্রতিক সরকার সমূহের আইনগত নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্থানীয় কৃষি রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, ১৯০০ সালে "ঝুম" পদ্ধতির চাষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি হেক্টরে প্রায় ৭৫০ কি. গ্রাম শস্য উৎপাদন হতো। কিন্তু বর্তমানে ঝুমের ফলন প্রতি হেক্টরে ২৪০ কি. গ্রামে নেমে এসেছে (Khan and Khisha, 1970)। ঠিক একইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে যেখানে মাত্র ৪০,৫০০ হেক্টর জমিতে হালচাষ হতে সেখানে বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০০,০০০ হেক্টরে পরিণত হয়েছে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে এর জন্য সৃষ্ট বিশাল কৃত্রিম হ্রদের পানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে উর্বর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর কৃষি ভূমি তলিয়ে যায়। ফলে এখানকার প্রায় ১০,০০০ পরিবার কৃষি নির্ভর মানুষ তাদের মূল্যবান কৃষি জমিসহ বাড়িঘর সবকিছু হারায়। একই সাথে আরও প্রায় ৮০০০ পরিবার ঝুমিয়া পরিবারও স্থান চ্যুত হয়। স্থানচ্যুত কৃষকদের উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলা ভাষী প্রারম্ভিক হাল চাষ ছিল। এসব ক্ষতিগ্রস্ত কাসালং রিজার্ভ ফরেস্টে উপযুক্ত ভূমি সাফ করে পুনর্বাসিত করা হলেও এক উল্লেখযোগ্য স্থানচ্যুত ও ঝুমিয়া পরিবার তেমন কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি (Shelley, 1992) এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানের অশান্তির একটি অন্যতম কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল 'A' (o to 0.5 perent prercent slope), 'B' (২০% Slope) এবং C (40% Slope) মানের ভূমিকে কোন না কোন ধরনের কৃষি কাজের আওতাভুক্তকরা যায়। 'A' শ্রেণীভুক্ত উপত্যকা ভূমির পরিমাণ খুবই কম হলেও ঐসব জমিতে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং এখানে কৃষির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করা যায়। 'B' শ্রেণীর উঁচু-নিচু ভূমির ঢালে ভাল ঝুম পদ্ধতির চাষ এবং সবজি ও ফলমূলের চাষ করা যায়। এখানে খুব ভাল তুলা, ভুট্টা এবং কাকরল, কুমড়া, পেঁপে, কলা মিষ্টি আলু, কঁচু, আদা হলুদ ইত্যাদির চাষ করা যায়। 'C' শ্রেণীভুক্ত পাহাড়ী জমি অধিক উঁচু ও ঢাল বেশি খাঁড়া হওয়ার ফলে এসব জমিতে ধাপ বা টেরেসিং (Terracing) -এর মাধ্যমে গম, ভূট্টা, ধান এবং অন্যান্য সব্জি বা মসলার চাষ হতে পারে। এসব জমিতে খুব ভাল ফলমূলের বাগান করা যায় (Horticulture) । বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণে আনারস, কলা, কমলা, কাঁঠাল, উৎপন্ন হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলের সাজেক ভ্যালির কমলা এবং আনারসের উৎপাদন এবং মান বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানকে হার মানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জমিতে ভার কাজু বাদামের চাষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব ফলমূলের চাষ বাড়িয়ে এখানে অনেকগুলো ফলমূল প্রকৃয়াজাতকরণ শিল্প (Fruit processing Plants) স্থাপন করে সহজেই স্থানীয় অনেক লোকের জীবিকার এবং একই সাথে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অনুকূল প্রভাব ফেলা যেতে পারে। হিসাব করে দেখা যায় যে, এখানকার ঐসব পাহাড়ী ঢালু জমিতে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষি কাজ ও ভূমি ব্যবহার চালু করে যে পরিমাণ উপাদন বা ফলন পাওয়া যেতে পারে তা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বাসিন্দাকে খাইযে পরিয়ে বিপুল অংশের ফসল দেশের সমতলের ঘন বসতিপূর্ণ জেলাগুলোতে ও সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে একই সাথে

মনে রাখতে হবে, কৃষির বিনিময়ে এখানকার মূল্যবান সংরক্ষিত বনভূমিকে ধ্বংস করা যাবে না। উপরন্তু, এখানে "এগ্রোফরেস্ট্রি (Agro-Forestry) বা কমিউনিটি ফরেস্ট্রি (Community foresty) প্রভৃতি আধুনিক বনায়ন প্রকৃয়ার সাহায্যে গাছ পালার সংখ্যা বাড়াতে হবে। কৃষি কাজ হবে শুধুমাত্র বনশূন্য বা বনায়নের অনুপযোগী খালি ঝোপঝাড় যুক্ত অব্যবহৃত ভূমিতে এবং বর্তমানের কৃষিভুক্ত জমিতে গবেষণার দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের গভীর অরণ্যাঞ্চলেও বড় বড় বৃক্ষের নিচে পাহাড়ী জমিতে নানা ধরনের খাদ্যভুক্ত 'কন্দ' বা 'মূল' জাতীয় ফসল (Rot Crops) বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন হতে পারে সেবের খাদ্য মানও অনেক বেশি। পার্বত্যাঞ্চলের জনগণের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে এসব স্থানীয় 'কন্দ' যেমন, জঙ্গী আলু, মিষ্টি আলু, ইয়াম (Yam), ওল কঁচু, ইত্যাদির প্রচলন করে বনাঞ্চল ধ্বংশ না করেও বর্ধিত লোকসংখ্যার জন্য যথেষ্ট এবং উপযুক্ত খাদ্যমান সম্পন্ন ফসলের যোগান দেয়া সম্ভব।

মৎস্য সম্পদঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৪০০ বর্গকি. মি. বিস্মৃত বিশালায়তন মনুষ্য নির্মিত জলাধারে (Kaptai lake) বিপুল মৎস্যচাষের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এই হ্রদ থেকে প্রায় ১০০,০০০ মন বা প্রায় ৫০০০ টন উন্নত প্রজাতির মৎস্য আহরণ করা হয়। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মৎস্য চাষ পদ্ধতিতে এই বিপুল জলাধার থেকে বর্তমানের চেয়ে প্রায় দশগুন বেশী (১০,০০০,০০ মন) বার্ষিক মাছ আহরণ করা সম্ভব। বর্তমানে হ্রদে, রুই, কাতলা, মৃগেল এবং সিলভার কাপ ইত্যাদি মাছের চাষ হয়ে থাকে।

কাপ্তাই হ্রদ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১০০০ একর জুড়ে প্রায় ২০,০০০ ছোট ও মাঝারি পুকুর রয়েছে। অতি সহজেই এ'সব পুকুরে কম পক্ষে ১০ থেকে নিয়ে ২০/৩০ হাজার মন মাছের চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া এখ্যানকার উল্লেখযোগ্য পাহাড়ী নদীগুলোতে (কর্ণফুলী, মাতা মুহুরী, সাঙ্গু, চেঙ্গী, কাসালং) প্রচুর উপযুক্ত প্রজাতির মাছের চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া উপযুক্ত স্থানে পাহাড়ী ক্ষুদ্র খাল বা ছোট নদী সমূহে বাঁধ দিয়ে ক্ষুদ্র কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করে এখানে প্রচুর মাছের চাষ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বনজ সম্পদঃ পার্বত্য-চট্টগ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধতম মুল্যবান বনভূমি। পার্বত্য -চট্টগ্রামের তিনটি পার্বত্য জিলার মোট ৭০৪৩.৮৬ বর্গ কি. মি. এলাকা বনাচ্ছাদিত ভূমি। এর মধ্যে প্রায় ১৫৩৮.৭৯ বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত (Reserved Forest) বনভূমি (Rashid, 1991, P.107) । বাকী প্রায় ৫৪৫২.৫০ বর্গ কি.মি. অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের বেশীর ভাগ বৃক্ষরাজি উজার হয়ে এখন শুধুমাত্র ঝোপঝাড় বা নুতন বনায়নের আত্ততাধীন কিছু বন রয়েছে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনাঞ্চলকে (১) পার্বত্য-চট্টগ্রাম উত্তর, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ, (৩) অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বণাঞ্চল (Unclassified state forests) এবং (৪) "ঝুম" বনবিভাগ-এ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর" এর আওতায় মোট ৩৩৮৪০ বর্গ কি.মি. বনভূমি রয়েছে। এর বেশীর অংশই কাসালং রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তভূর্ক্ত। দুর্ভেদ্য এই গভীর অরন্যে মুল্যবান চাপালিস, তেলসুর, নাগেস্বর, গর্জন, সিভিট ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে।

"পার্বত্য-চট্টগ্রাম দক্ষিণ" ডিভিশন র‍্যাংখিয়াং, সীতাপাহাড়, এবং বরকল রিজার্ভ বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ বনাঞ্চলে কদম, শিমুল, খাগড়া, চম্মা, চিকরাশী, রাশ, শন এবং গল্লাবেত প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। গৃহ-নির্মাণ ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, বেত, এবং নরম কাঠের বিপুল চাহিদা রয়েছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের বৃক্ষ-উজাড় এলাকায় দেশের বনবিভাগ বনায়ন বাগান পদ্ধতিতে সেগুন ও মেহগনির বাগান গড়ে তুলেছেন। ইদানিং এইখানে তেজপাতা, ইউক্যালিপটাস এবং অন্যান্য দরকারী বৃক্ষের বাগান গড়ে তোলার উদ্দ্যেগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ২৩,১৯৬ একর উজাড় ভূমিতে নূতন বনায়ন করা হয়েছে এবং আরো প্রায় ৬,৩১৮ একর ভূমিতে নরম কাঠের (pulp wood plantation)) বনায়ন করা হয়েছে (B. B. S. -1991) ।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের বন ভূমিতে কাঠ ও ব্যাশ -বেত ছাড়াও অন্যান্য অনেক সমৃদের সম্ভাবনা রযেছে। এখানকার বন্য হাতি, বন্যপ্রাণী, পাখ পাক্ষী এবং ভেষজগুনসম্পন্ন উদ্ভিদ দু দেশের অর্থনীতিতে বিপুল অবদান রাখতে পারে। শিল্পের কাঁচামাল, বাড়ী ঘর ও আসবাবপত্র তৈরীতে কাঠ, ঔষধ এবং খাদ্য-সামগ্রীর উৎসস্থল হিসেবে পার্বত্য-চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য এক অপরিহার্য যোগানস্থল। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের হিসেবে পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে মোট, ৪৬,৪,২০০০,০০০/- টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে মাথাপিছু আয় ছিল বার্ষিক গড়ে ১৫,৩৮০ টাকা -যা, বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় বন্টন থেকে অনেক বেশী। এবং বলাবাহুল্য যে, ঐ অধিক হারের কারণ এখানকার বনজ-সম্পদ ও জলবিদ্যুৎ -এর উৎপাদন ও রাজস্ব আয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনভূমি সমস্ত বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের অর্ধেকের চেয়েও বেশী হওয়ার ফলে এর অস্তিত্বের সাথে সমস্ত জাতীয় ভাগ্যের অনেকটা জড়িত।

খনিজ সম্পদঃ পার্বত্য-চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদের প্রায় পুরোটাই এখন পর্যন্ত অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। এখানকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল চুনাপাথর, কঠিন শিলা ইত্যাদি মুল্যবান খনিজের সম্ভাবনাকে ঘোষণা করে। একই ধরনের ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geological and Geomorphological situations and structures) পরিস্থিতি ও গঠন সম্পন্ন আসাম ও সংলগ্ন বার্মা মায়ানমার) অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল ও অন্যান্য খনিজসম্পদ অনাবিস্কৃত হওয়ায় বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রামেও খনিজপ্রাপ্তির সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঐ পর্যন্ত এখানকার খাগড়াছড়ি জিলার সামুটাঙ্গ নামক স্থানে উন্নতমানের মিথেন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। ১৯৬৯ সনে এষ্টিমেটেড আহরণ যোগ্য গ্যাসের মজুদ ছিল প্রায় ০.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তা'ছাড়া রাঙ্গামাটি জিলার কাপ্তাই এবং বান্দারবন জিলার আলী কদমে কঠিন প্রকৌশল শিলা পাওয়া গেছে রাস্তাঘাট তৈরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত জলবিদ্যুতের জন্য বাঁধ তৈরীতে ঐসব স্থানের কঠিন শিলা খুব কাজে লাগবে আশা করা যায়। অতি সম্প্রতিককালে পার্বত্য-চট্টগ্রামের কয়েকটি

স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালের জরিপের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বান্দরবন জিলার রুমা থানার ঘেরাউ এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের আলী কদম থানার তৈল মৌজায় পেট্রোলিয়াম এবং লামা থানার চলম ঝিলিতে প্রচুর কয়লা সম্পদ রয়েছে (Daily Sangram, Oct 24,1993) । তাছাড়া বাঘাই ছড়িও কাপ্তাই থানায় ও প্রচুর পেট্রোলিয়াম রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালের ২১ আগষ্ট থেকে শুরু করে বান্দরবন জিলার নাইক্ষংছড়ি থানার পাহাড়ি ঝিরির পাশে ভূ অভ্যন্তর থেকে অবিরাম ধারায় অনেক দিন ধরে খনিজ তৈল উঠতে থাকার রির্পোট ঐ সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উঠে। ১৯৮১ সনে সেল ওয়েল কোম্পানি বাঘাই ছড়ি থানায় খনিজতৈলের সন্ধান পায়। তারা উক্ত থানার শিল্প ও কাসালং অঞ্চলে ড্রিলিং ও শুরু করে। কিন্তু শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাস মূলক তৎপরতার ফলে উক্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

জল-বিদ্যুৎ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ী খরস্রোতা নদী ও পার্বত্য ভূমিরূপ বিপুল পানি শক্তির দ্বারা প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপরিমেয় সম্ভাবনা ধারণ করে। এখানকার কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র। খর স্রোত কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি বিশাল জলাধার তৈরী করে ঐ পানির সাহায্যে এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিপুল বিদ্যুৎ শক্তি পুর্বাঞ্চলিয় -গ্রীডের মাধ্যমে (১৩২ কে, ভি, লাইন) সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত পাঠানো হয়। সমস্ত চট্টগ্রামের বিপুল শিল্প ইউনিট সমূহ ও লক্ষ লক্ষ বসতবাড়ী, কলকারখানা, কৃষি সেঁচপাম্প, নগর-বন্দর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় কাপ্তাই উৎপাদিত কর্ণফুলীর পানিশক্তিজাত বিদ্যুৎ। বর্তমানে এখানে দুইটি ফেজে মোট ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জরীপ থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য-চট্টগ্রামের সাঙ্গু, মাতামুহুরী নদীতে বাঁধ দিয়েও বিপুল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ঐ সব নদীগুলোর সর্বমোট পানিশক্তিকে যথাযথ কাজে লাগালে সমস্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদার প্রায় এক চতুর্থাংশ মিটানোা যেতে পারে। বাঁধদেয়ার ফলে সৃষ্ট নূতন জলাশয়গুলোত মাছের চাষ এবং পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে প্রচুর আয় বাড়ানো যাবে।

পর্যটন সম্পদ ঃ ঢেউ খেলানো পাহাড় শ্রেণীর সবুজ হাতছানি, চোখ জড়ানো কাপ্তাইহ্রদের মনোহর রূপ আর স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্টির বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনাচার পার্বত্য-চট্রগ্রামকে দান করেছে এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রের মর্যাদা। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বান্দারবান কিংবা দূরবর্তী সাজেক বা বরকলে গড়ে উঠতে পারে সমৃদ্ধ পর্যটন নগরী কাসালং এর গভীর অরণ্যে বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Wild life Observation Tower) বা কাপ্তাই কিংবা রাঙ্গামাটিতে মাছ-ধরা, নৌভ্রমন, জলক্রীড়া কেন্দ্র (Fishing, Angling, River Cruise and Water sports facilities) স্থাপন করে সহজেই দেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়। তাছাড়া এখানকার নিরিবিল পরিবেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আবাসিক কনভেন্ট বা ডরমিটরী ধরনের আধুনিক বিদ্যালয় বা কলেজস্থাপন করা যায়। এক কথায়, পার্বত্য-চট্টগ্রামের নিসর্গের সবকিছুই আদর্শ পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচ্য।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের কুটির শিল্পের বিকাশেরও বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার উপজাতীয়দের তৈরী তাঁতের বস্ত্র, চাদর, থলে, পুঁতির মালা, হাঁড়া এবং হাতিরদাতের শিল্পকর্মী কাঠ এবং বাঁশবেতের আকর্ষনীয় দ্রবাদির যথেষ্ট চাহিদার রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এসব উপজাতীয় হস্তশিল্পজাত স্যুভেনিরের প্রচুর আকর্ষন রয়েছে। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকার এ সব কুটির শিল্পজাত বা হস্তশিল্প দ্রব্য দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে লাভজনক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ'সব উপজাতীয় হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

পার্বত্য-চট্রগামের ভূ-রাজনীতি

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিকভাবে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ভৌগলিক এলাকা। সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান এক-কেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থার (Uni-polar Global System) অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে এশিয়ায় ভারত এবং চীন ভবিষ্যত নব্য পরাশক্তি হিসেবে আবিভূর্ত হতে চলেছে। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গপোসাগরের উপকুল থেকে মাত্র কয়েক কি. মি. দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের অন্তুর্ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত তাপর্যময় ভৌগলিক অবস্থান জুঁড়ে দাড়িয়ে আছে। সাম্প্রকিকালে বাংলাদেশেরই এই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের ভৌগলিক সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর পূর্বঞ্চলের প্রদেশসমূহ যেমন, মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড আসাম, এবং মায়ানমারের আরাকান, শান, ফোচিন এবং চিন প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার প্রবনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে (Sukhwal, 1971) । উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের এবং সংলগ্ন মায়ানমারের উত্তরাংশের উল্লেখিত রাজ্য সমূহের উপজাতীভূক্ত জনগোষ্ঠি সমূহের পুরো জনসংখ্যাই মঙ্গোলীয় তিব্বতী এবং বর্মী জাতিতাত্ত্বিক ধারার অন্তর্ভূক্ত। এলাকাটির জনগোষ্ঠির বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখার অন্তভূক্ত এবং এখানকার জনগোষ্টি সাধারণ সাংস্কৃতিক সামাজিক ধারার কিছু কিছু বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেও ঐসব অঞ্চলে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। পুরো এলাকাটি পার্বত্য অরন্য আচ্ছাদিত ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল ভৌগলিক পরিবেশের আত্তাধীন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলটির জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত হালকা এবং জন সংখ্যার বন্টন ও যথেস্ট অসম এবং হালকা। পার্বত্য ঐ এলাকাটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুবর্তী পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং চীন, ভারত আর দঃপূঃ এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) ভূক্ত অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাব ভূমি (Vicinal land) এশিয়ার এই ত্রিভূজ ভূ-ভাগটি বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্ববহন করে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বমোট আয়তন ১৩,১৪৮ বর্গ কি.মি.। আয়তনে অঞ্চলটি লেবানন, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, কাতার, কিংবা লুক্সেমবার্গের চেয়ে বড়। বাংলাদেশের এই বৃহৎ পার্বত্য -অঞ্চলটি সব দিক দিয়ে ভূমি-পরিবেষ্টিত। অঞ্চলটির সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইখ্যংছড়ি থেকে মাত্র ১২ কি. মি. পশ্চিমে কক্সবাজার জিলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙ্গামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালী থেকে মাত্র ৩০ কি. কি. দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমূদ্রবন্দর চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জিলার সংকীর্ণ একফালি ভূ-ভাগ যা কোন স্থানেই পূব- পশ্চিমে ৫০ কি. মি. এর চাইতে বেশী প্রশস্ত নয়- তা পার্বত্য-চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে। চট্টগ্রামের বন্দর যা কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা এবং সমস্ত চট্টগ্রামের বন্দর কলকারখানা এবং নগরীসহ সমস্ত জিলা, পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর এবং চাঁদপুর জিলাসমূহের বিদ্যুতের সম্পূর্ণ সরবরাহ এই কর্ণফূলীর পানির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নৌ পরিবহন এবং কৃষির জলসেচ ব্যবস্থার জন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলাদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা ইত্যাদি নদীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এইভাবে দেখা যায় যে, সমস্ত চট্টগ্রামও কক্সবাজার জিলাদ্বয়ের প্রায় সোয়াকোটি মানুষের জীবন জীবিকা তথা অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরের অস্তিত্ব ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম উৎস পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। ঐ সব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনেতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া দুর্গম এবং পর্বতঘেরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান চট্টগ্রাম বন্দর, মহানগর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূ-ভাগকে ভূ-রাজনৈতিক এবং অবস্থানগত দুর্ভেদ্যতা দান করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতায় চট্টগ্রাম অঞ্চল কৌশলগতভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজভেদ্য (Strategically) ঐ এলাকাকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতিকুল বৈশিষ্ট্য দান করবে [২ নং মানচিত্র]

পারিসরিক বৈশিষ্ট্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-রাজনৈতিকভাবে (Geo-Political) গুরুত্ব বহন করে। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটির সন্নিহিত অবস্থান (Vicinal or relative location) অত্যন্ত প্রতিকূল। একমাত্র পশ্চিমের বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর, পূর্ব কিংবা দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভারত এবং মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত দুর্গম, পার্বত্য, বনাবৃত এবং জনবিরল, অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টি মাত্র। পার্বত্য-চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম ছাড়িয়ে প্রায় ৬৫০ কি.মি. দূরে চীনের উইনান প্রদেশের সীমান্ত অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি (উঃঃ) জেলার প্রায় ১১০ কি.মি. সীমান্ত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন। পার্বত্য-রাঙ্গামাটির ২৪০ কি.মি. সীমানা ভারতের মিজোরাম (Lusici Hills) ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভক্তি নির্দেশ করে এবং পার্বত্য-

বান্দারবন জেলার প্রায় ১৫৫ কি.মি. সীমান্তরেখা মায়ানমারকে বাংলাদেশে থেকে আলাদা করেছে। (Bangladesh Administrative Map prepared by Graphosman, Dhaka, 1992)। পার্বত্য চট্টগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ (Non-Compact) এবং দীর্ঘায়তন (Elongate)। প্রস্থের তুলনায় অঞ্চলটি কয়েক গুণ বেশি দীর্ঘ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৃহত্তম ভূ-ভাগ। এসব ভূ-পারিসরিক বৈশিষ্ট্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক বলে বিবেচ্য। পূর্ব বর্ণিত মানচিত্র (Graphosman, 1992) বিশেষণে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-দক্ষিণে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ কি.মি. এবং গড় প্রশস্ততা প্রায় ৫০ কি.মি.। অঞ্চলটির পূর্ব-পশ্চিম দিকে সবচেয়ে প্রশস্থ স্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কি.মি. (রামগড় থেকে বরকল-এর উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত) এবং অপ্রশস্থ স্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৪০ কি.মি. (চন্দ্রঘোনা থেকে মিজোরামের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত)। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে (কাপ্তাই কিংবা চন্দ্রঘোনা) সড়ক পথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব যদিও ৫০/৬০ কি.মি. বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দারবান জেলার নাইখ্যাংখছড়ি থানার শেষ প্রান্ত (পূর্বাংশ) থেকে নিকটতম সমুদ্র উপকুলের দূরত্ব মাত্র ১৩/১৪ কি.মি. (Graphosman, 1992)। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত এলাকার অবস্থান থেকে সমুদ্রের এই নিকটবর্তিতা সমগ্র অঞ্চলটিকে দান করেছে বিশেষ ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব।

ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস

পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস প্রায় অজানা বা এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। দুর্গম গভীর অরণ্যাবৃত বন্ধুর ভূমিরূপ বিশিষ্ট ঐ এলাকা প্রাচীনকালে হিংস্র বন্য জন্তু-জানোয়ারের দখলে ছিল। ধারণা করা হয় আজ থেকে হাজার বছর আগে ঐ এলাকয় মুষ্টিমেয় কিছু ভ্রাম্যমান অরণ্যাবাসী জংলী জনগোষ্ঠী ফলমূল সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী শিকার করে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলত। প্রায় জনশূন্য ঐ অঞ্চলের সাথে সমতলের সভ্য জগতের প্রথম যোগাযোগ ঘটতে শুরু করে ভারত বর্ষে মোঘল শাসনামলে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে। ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি অরণ্যবাসী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (যেমন কুফিজনধারাভুক্ত ম্রো পাংখো, যুমি এবং লুসাই ইত্যাদি) পার্বত্য চট্টগ্রামের অরন্যে বিচরণ করত (Ahmed, 1990)। এদের পরবর্তীতে এখানে পার্শ্ববর্তী বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে মারমা, চাকমা, ও উত্তরের ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে ত্রিপুরা (টিপরা) উপজাতীয়রা দলে দলে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারতবর্ষের মোঘলদের সুবে বাংলার প্রশাসক গণ চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন এবং কোন কোন উৎপন্ন দ্রব্যের (যেমন হাতি, তুলা) উপর করারোপ করতেন। মাঝে মধ্যে বার্মার বিভিন্ন রাজাগণও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব জনগোষ্ঠী বেশির ভাগই নিজেদের মূল নিবাসস্থল থেকে যুদ্ধ কিংবা অন্য কোন কারণে বিতাড়িত বা দেশান্তরী হয়ে এখানে আগমন করে। তারা প্রায় সময়ই একে অপরের সঙ্গে বৈরী ভাব পোষণ করত। মোঘলদের পর ঔপনিবেশিক বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং ১৮৬০ সালে

পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের সরাসরি দখল (Annex) নিয়ে আসে। ১৯০০ সালে বৃটিশ উপনিবেশিক সরকার ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী বাঙালী ভারতীয় প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্যে এবং ঐ এলাকায় একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে "চিটাগাং হিলট্রাক্টস রেগুলেশন ১৯০০ (Chittgong Hill tracts Regulation 1900) চালু করে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী জেলার প্রশাসক সেখানকার সব ধরনের অভিগমন বা জনস্থানান্তর (migration and resettlement) বন্ধ বা প্রতিরোধ করতে পারতেন। এই আইন প্রণয়নের দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলোকে এক একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করানোর প্রয়াস চালায় (Cited in Ahmed, 1990)।

১৯৩৫ সালে বৃটিশ প্রণীত ভারত শাসন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামকে "সম্পূর্ণ বা পৃথকাঞ্চলে" বা totally excluded Area" হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সংলগ্ন বাংলাভাষী সমতল অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের এই কৌশলের কারণ ছিল– ঐ অঞ্চলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ বন্ধ করা ও সেখানে বাঙালী প্রভাব ও বসতিস্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করা। প্রায় জনশূন্য এবং সম্পদ সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বার্মা, আরাকান কিংবা উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত বসত স্থাপনকারী উপজাতীয়দের যতটুকুই দাবী ছিল– অঞ্চলটির কাছের সংলগ্ন চট্টগ্রামের সমতলবাসী বাঙালী জনগোষ্ঠীর ঐ অঞ্চলটির উপর অধিকার বা দাবী কোন যুক্তিতেই কম ছিল না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক বৃটিশরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে ভারতবর্ষে তাদের শোষণ-শাসন পাকাপোক্ত করে নিয়ে মানবিকতার ন্যায়পরায়তার যুক্তিকে লংঘন করে ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্নতার পথ প্রতিষ্ঠিত ধারার ধূয়া তোলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে (Amin, 1988/'89 and Shelley, 1992)।

১৯৪৭ সালে যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারত বিভক্তি মেনে নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত করতে তৎপর হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের অমুসলিম হওয়ার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অঞ্চলটির ভারতভুক্তি দাবী করে বসে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ জনবিরল সম্পদ-সমৃদ্ধ অঞ্চলটির অহিন্দু জনসংখ্যাধিক্য এবং চট্টগ্রাম জেলার স্বার্থে সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলটির পাকিস্তানভুক্তির দাবী পেশ করে। বৃটিশ শাসকরা কংগ্রেসের দাবী প্রায় মেনে নিয়েও শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের ফিরোজপুর (শিখজনসংখ্যা সমৃদ্ধ) জেলার ভারতভুক্তির বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করে (Tayyeb, 166 মুসলিম লীগের দাবীতে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাইহিলস (মিজোরাম) এবং কাছাড় জেলার দাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিল (Sukhwal, 1971)। কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে রেডক্লিফ রোয়েদাদে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন ঐ সব জনবিরল অহিন্দু জন অধ্যুষিত পার্বত্য-অঞ্চলসমূহ ভারতের আসামের সাথে জুড়ে দেয় (Ahmed, 1990 and Rahman, 1958) পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন কিছু শিক্ষিত প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ অঞ্চলটির ভারতভুক্তির পক্ষে দাবী তুলেছিল এবং ১৯৪৬ সালে তারা ঐ প্রচেষ্টার

অসারতা বুঝতে পেরে "The Hillmen Association"-এর ব্যানারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা বা কুচবিহারের মত দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা (the status of a princely state) দাবী উত্থাপন করে। তাদের ঐ দাবীও প্রত্যাখ্যাত হলে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে চাকমা নেতা স্নেহ কুমার চাকমা মরিয়া হয়ে রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন (Shelley, 1992)-এর বিপক্ষে স্থানীয় মারমা মঘ গোষ্ঠির দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার নেতৃবৃন্দ বান্দরবানে বার্মার পতাকা স্থাপন করেন (পূর্বোক্ত)। ইতিহাসের এই চিত্র দু'টি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের অনৈক্যের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৫ সালে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের "বিশেষ মর্যাদা"-র মাধ্যমে সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী করাচী থেকে ঐ অঞ্চলে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন চালু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সকল জনগণের জন্য ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করে দেয়া হতে থাকে (Mey, 1986)। ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে তার সাবেক "বিশেষ মর্যাদা" হারিয়ে ফেলে (Ahmed, 1990) পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনে মার্কিন সহায়তায় ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের "কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প" চালু হয়। এর ফলে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কয়েকশ' বর্গ কি.মি. এলাকা বিস্তৃত বিশাল হ্রদ সৃষ্টি করা হয় এবং হ্রদের পানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠির প্রায় ৪০% ভাগ চাষের ভূমি এমনকি রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীসহ পুরাতন শহরের সম্পূর্ণটা বন্যার পানিতে ডুবে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার চাকমা পরিবার কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি এবং অনেকেই পার্শ্ববর্তী ভারতে ত্রিপুরা বা মিজোরামে চলে যায় (Rob, 1990 ; Ahmed, 1990 and Shelley, 1992) এবং এই কৃত্রিম প্লাবন ও চাকমাদের দেশান্তরী হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকলের অলক্ষ্যে আর নব্য উপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির অযুত অবহেলায় অবধারিত অদৃষ্টের মত অংকুরিত হয় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর বর্তমানের সবচেয়ে বড় হুমকি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার "বাঙালী জাতীয়তাবাদ"-কে দেশের একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে এবং রাষ্ট্রপতি মুজিব সকল উপজাতি, যারা বাংলাদেশে বসবাস করে, তাদেরকে বাঙালী হয়ে যেতে আহ্বান করলে "অগ্নিতে ঘৃতাহুতি"র মত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় (Amin 1988/ '89)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ও গবেষক নূরুল আমিনের মতে, After the emergence of Bangladesh the Awami league Government led by Sheikh Mujibur Rahman created a reign of terror in the Chittagong Hill Tracts area. It committed another misdeed by not granting special status to the CHTs people under the constitution of 1972 which they had enjoyed under the 1900 regulation (Amin, 1988)

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী চাকমা নেতা ও সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ একদল চাকমা প্রতিনিধি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে তাদের ৪ দফা দাবী উত্থাপন করেন। দাবীগুলো ছিলো (Ray, 1985, Cited Amin, 1988/'89।

১) নিজস্ব কানুনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত শাসন,

২) বাংলাদেশের শামনতন্ত্রে বৃটিশ প্রণীত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ধারার পুনঃসংযোজন,

৩) প্রশাসনিক পূর্ণ ক্ষমতাসহ স্থানীয় উপজাতীয় রাজাদের ক্ষমতা প্রদান এবং

৪) সাংবিধানিকভাবে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের অপরিবর্তনীয়তার নিশ্চয়তা বিধান এবং বাঙালী পরিবারসমূহের বসতিস্থাপন বন্ধ করার ব্যবস্থা সমন্বয়।

শেখ মুজিবের মত উদার রাজনৈতিক নেতাও চাকমা প্রতিনিধিদের এই চারটি দাবীর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যত বাস্তবতার ভয়াবহ চিত্র অনুধাবন করে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চাকমাদের এসব দাবী-দাওয়া নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলে অভিহিত করেন (Amin 1988/'89 P. 140)। তাছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতীয়দের ঐসব তৎপরতা পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের মূল ধারায় (Mainstream) মিশে গিয়ে যে, বাঙালী হয়ে যেতেও আহবান করেন। (Hussain, 1991. p. 440)।

১৯৭২ সালের ১৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু চীনপন্থী কম্যুনিস্ট চাকমা উপজাতীয়দের অধিকারের দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা করে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে রূপান্তরিত করতে তৎপর হয় এবং তাদের উদ্যোগে "জনসংহতি সমিতি" নামের একটি সংগঠন গড়ে উঠে। শেখ মুজিবের অনমনীয় মনোভাব এবং কঠোরতার ফলশ্রুতিতে উপজাতীয়দের দাবী আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে "জনসংহতি সমিতি" থেকে জন্ম নেয় "শান্তিবাহিনী" ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারীতে। স্বাধিকারের দাবী-দাওয়ার এবং উপজাতীয়দের "স্বাধীনতা"-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার পরিবর্তিত হয়। শান্তি বাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলা ক্রমে গেরিলা যুদ্ধে মোড় নেয় এবং অশান্তি আর হত্যা ধ্বংসের ভয়াবহতায় ভরিয়ে দেয় কর্ণফুলি, সাঙ্গু, মাতামুহুরী আর কাসালং এর শান্ত উপত্যকা আর অধিত্যকাগুলোকে। এবার চাকমাদের দাবী-দাওয়ার আরো সুস্পষ্টভাবে যোগ হয় নতুন কিছু ধারা, যেমন–

১৯৪৭ সালের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত সকল অ-উপজাতীয় অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী সকল জনসংখ্যাকে পার্বত্য চট্টগাম থেকে পুরোপুরি উঠিয়ে নিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল নিরাপত্তা বাহিনী উচ্ছেদ করে স্থানীয় উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা বাহিনী বহাল করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় উপজাতীয়দের উপর ন্যাস্ত করতে হবে।

যে কোন সচেতন ব্যক্তিই এসব দাবী-দাওয়ার ধারাগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবে যে উপজাতীয়দের ঐসব দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা স্থানে অসহায় গরীব অ-উপজাতীয় লোকজনদের উপর "শান্তি বাহিনী"র হামলার খবর আসতে লাগলে এবং ক্রমে তাদের আক্রমণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনের উপরও পরিচালিত হতে শুরু করলে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘীনালা, আলীকাম ও রূমার তিনটি ছোট সেনাবিনাস কেন্দ্র এবং অনেকগুলো সামরিক চৌকি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। Hossain, 1991)

১৯৭৫ সালের আগস্টের পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আগমন ঘটে তরুণ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের। তিনি বাংলাদেশেরই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জনবিরল সম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক সমতলবাসী বাস্তুহারা এবং দরিদ্র ভূমিহীন বাঙালী চাষী পরিবারকে পুনর্বাসিত করেন। বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক জিয়া, তিব্বতে "সমাজতান্ত্রিক, চীন এবং জম্মু (কাশ্মীর)-তে গণতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ" ভারত যেমন জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সংখ্যালঘু বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রবণ অঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার পুনঃস্থাপন (Resettlement) ঘটায়, তেমনি উদ্যোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের একটি অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী অপতৎপরতার স্থায়ী মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেন। সাথে সাথে তিনি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্যোগে মাত্র ২/৩ বছরের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের খাসজমিতে প্রায় এক লক্ষের মত ভূমিহীন গরীব মানুষ পুনবার্সিত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জিয়ার করুণ মৃত্যু ঘটলে তার এসব আন্তরিক পরিকল্পনাসমূহ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এবার পট-পরিবর্তনের ফলে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করে এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় একই নীতি বহাল রাখেন। 'শান্তি বাহিনী'র তৎপরতা অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত সরকার অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে চাকমা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে থাকলে নিতান্ত সামান্য উৎপাত ক্রমে দরিদ্র বাংলাদেশের জন্য বিরাট ক্ষতিকর আপদ হিসেবে দেখা দেয়। উপায়ন্তর না দেখে এরশাদ সরকার চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে তৎপর হন। এই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ এরশাদের পরে আগত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ও চালিয়ে যান। কিন্তু চাকমা নেতারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের আগের দাবী দাওয়ায় সম্পূর্ণ অনড় রয়েছেন এবং মাঝে মধ্যেই নানা মানবাধিকার সংস্থার ছদ্মাবরণে বিদেশী শক্তি এবং ভারতীয় প্রশাসন (বি.এস.এফ বা বিদেশ মন্ত্রণালয়)-এর অযৌক্তিক উদ্দেশ্যমূলক হস্তক্ষেপ ঐসব উদ্যোগকে বার বার নস্যাৎ করে দিচ্ছে (১৯৯২/৯৩-এর যে কোন জাতীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দ্রষ্টব্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন শক্তির ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও বাস্তবতা

পার্বত্য-চট্টগ্রামের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট বিদেশী শক্তির প্রভাব ও সংযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (Shelley, 1992, Hossain, 1991)। অঞ্চলটির মিশ্র জনসংখ্যা এবং বিপুল ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নানা আঞ্চলিক এবং দূরবর্তী আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহকে অঞ্চলটির উপর নজর রাখতে উৎসাহিত করেছে। ভারত মহাসাগরে এবং সংলগ্ন ভৌগলিক এলাকায় নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করতে বা ধরে রাখতে ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসি গোষ্ঠি বাংলাদেশের এই নাজুক অঞ্চলটির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে উৎসাহিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব সমস্যায় দূর-প্রাচ্যের জাপান এবং দূরান্তের অস্ট্রেলিয়ার মত আপাতঃ নিরীহ রাষ্ট্রের আগ্রহের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানের 'বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি (Economic Super Power) জাপান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সাম্প্রতিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ধারণা "বিশ্ব মঙ্গোলীয়" বা "বিশ্ব বৌদ্ধ পুনরুত্থান" (Pan-Mongolian or Pan Budaist Revivalism)-এর আওতায় এবং প্রকৃত অর্থে অদূরভবিষ্যতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগর ও দঃ এবং দঃ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলসমূহে স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতে জাপানের ঐ সচেতনতা। অস্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত রাখতে বা খর্ব করতে এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় র‍্যাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রখর নজর রাখছে এবং "মানবাধিকার প্রশ্ন" তুলে বাংলাদেশের উপর চাপ ফেলতে প্রয়াস পাচ্ছে। নিচে সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যায় কয়েকটি শক্তির স্বার্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করা হল ঃ

বাংলাদেশের স্বার্থ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বার্থ জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ সার্বভৌম অঞ্চল। জনভারাক্রান্ত ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যত বিপুল জনসংখ্যার পুনবার্সনের জন্য হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি অতীব প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দারুনভাবে বঞ্চিত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্পদ-সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ এই পার্বত্য অঞ্চলটিকে বাংলাদেশের "Land of Prmise" বা "প্রতিশ্রুত সমৃদ্ধির লীলানিকেতন" বলা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে এবং সমৃদ্ধ বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎস, ফলমুল উৎপাদনের উপযোগী ক্ষেত্রে অনাহরিত-অনাবিস্কৃত খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের জন্য এক অপরিহার্য অঙ্গেপরিণত করেছে। ভূ-রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটি বাংলাদেশের প্রধান সমূদ্র বন্দরসহ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী ও প্রায় সোয়া-কোটি জন অধ্যুষিত চট্টগ্রাম আঞ্চলকে (কক্সবাজারসহ) কৌশলগত নিরাপত্তা (strategic Security) বা ভূ-রাজনৈতিক আড়াল (Strategic Defence) ও গুরুত্বদান (Thickness) করেছে। পার্বত্য-চট্টগ্রাম ছাড়া সম্পূর্ণ বৃহত্তম চট্টগ্রাম অঞ্চল একফালি সরু প্রলম্বিত সহজ-ভেদ্য ভূমিতে পরিণত হবে (thin, eongated and vulnerable Land)। চট্টগ্রামের প্রায় সকল নদ-নদী

পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলটির বিচ্ছিন্নতা বৃহত্তর চট্টগ্রাম (কক্সবাজার জিলাসহ) অঞ্চলের কৃষিজমির পানি সরবরাহ, নৌ-যোগাযোগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের নাব্যতা এবং কাপ্তাই হতে সরবরাহকৃত জলবিদ্যুতের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করে তুলবে সর্বোপরি পার্বত্য-চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রায় পাঁচলক্ষ বাংলাভাষী গরীব এবং মধ্য বিত্তের অস্তিত্ব ও অঞ্চলটিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত।

মায়ানমারের স্বার্থ ঃ বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রামের সাথে মায়ানমারের প্রায় ১৭০কি.মি. সাধারণ সীমানা বর্তমানে পার্বত্য- চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠিদের বেশীর ভাগ অংশই মাত্র এক বা দুই তিন শতক আগে মায়ানমার থেকে দেশান্তরী হয়ে বাংলাদেশের অঞ্চলে প্রবেশ করে (Hutchinson, 1906 and Burman, 1983)। ঐ অঞ্চলের উপজাতীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বেশীর অংশের ধর্ম, ভাষা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টাবলীর সাথে মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির যথেষ্ঠ মিল রয়েছে। বর্তমানে মায়ানমারের ঐ অঞ্চল মানুষের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা বিশেষ করে কারেন, রোহিঙ্গা, মান, চিন ইত্যাদি উপজাতীয়রা বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে লিপ্ত। তা ছাড়া ঐ এলাকায় কম্যুনিষ্ট গেরিলারাদের তৎপরতাও প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। আরাকানের রোহিঙ্গাদের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের বর্তমান সম্পর্ক খুবই খারাপ। এমতাবস্থায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মায়ানমারকে সম্পূর্ণ এলাকাটির উপর বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে। তবে নিজদেশের বর্তমান অশান্ত এবং অনিশ্চিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অভাবগ্রস্থ মায়ানমারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন আধিপত্যবাদী ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

ভারতের স্বার্থ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতির পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি ভারত (Shelley,-1992; Rahman, 1990,; Hossain, 1991 and Rob, 1991)। চামকা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগঠিত করা থেকে নিয়ে তাদের আশ্রয়দান, অস্ত্র-যোগানো, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ দান এবং আন্তর্জাতিক ফোরাম সমূহে এদেরকে সমর্থন দান করার ব্যাপারে ভারতের প্রত্যক্ষ সংযোগের অজস্র প্রমাণ রয়েছে (Rob, 1991)। পার্বত্য-চট্টগ্রামে ভারতের ভীষণ রকমের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ জড়িত। ১৯৪৬/৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ভারতীয় কংগ্রেস পার্বত্য-চট্টগ্রামের ভারত-ভূক্তির দাবি তুলেছিল (Tayeb, 1966; and Ahmed, 1958) বর্তমানে ভারত এশিয়ার অন্যতম শক্তি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরাশক্তি বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে ভারত মহাসগরে ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সুস্পষ্টভাবে সক্ষম হয়েছে। (Bindra, 1982)। কিন্তু, বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষ করে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, তামিল নাড়ু, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, গোর্খাল্যান্ড (দার্জিলিং) প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত জোরালো স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী (Secessionist Movements) দানাবেঁধে উঠেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে (seven sisters states of India) বর্তমানে প্রবণতায় ভারত বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত চীনের কাছে শোচনীয় পরাজিত হলে ভারতের এই অঞ্চলটির কৌশল গত এবং ভূ-রাজনৈতিক দূর্বলতা

বিশেষভাবে ধরা পড়ে। চীন মাত্র ২/৩ দিনের মধ্যে বৃহত্তর আসামের সম্পূর্ণ উত্তরাংশ (ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ) কব্জা করে নেয়। তা ছাড়া একটি ভবিষ্যত শত্রু ভাবাপন্ন প্রতিবেশী নেপাল কিংবা বাংলাদেশ ভবিষ্যতের এ ধরনের সংঘর্ষে চীনের পক্ষ নিলে ভারতের ঐ অসুবিধা জনক ভূ-কৌশলগত অঞ্চলটির অস্তিত্ব সম্পূণ্ বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। (Sukhwal, 1971) । বর্তমানে আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মিজোরাম ULFA সম্মিলিত আসাম মুক্তি ফৌজ (United Liberation Forces of Assam) এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গেরিলা সংগঠনসমূহ ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদিরা যুদ্ধরত। ভারত ঐসব দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য সমূহে দ্রুত সরবরাহ পাঠাতে বা যোগাযোগ বজায় রাখতে রীতিমত হিমশীম খায়। ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তী পরিস্থিতিতে যদি কোন দিন নেপাল বা বাংলাদেশ অথবা চীন ভারতের মূল ভূ-খন্ডের সাথে সমগ্র উত্তর পূর্বাংশের "সাতবোন" রাজ্য সমূহকে সংযুক্তকারী সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর বন্ধ করে দেয় তবে ঐ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য সহজেই খতম হয়ে যেতে পারে। ঐসব পরিস্থিতি বিচেনায় ভারতকে মরিয়া হয়ে ঐ প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত (land blocked) উত্তর-পূর্বাশের সাথে সমুদ্র পথের সংযোগ ঘটানোর জন্য একমাত্র উপায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বা ঐ উপকূলীয় কোন সুবিধাজনক স্থানকে কেন্দ্র করে সোজা উত্তর পূর্ব দিকের ভূ=-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে মিজোরাম বা ত্রিপুরা রাজ্যের সংযোগ সাধাণের চিন্তাভাবনার দ্বারস্ত হতে হয়। শিল্প এবং প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ভারত সহজেই বঙ্গোপসাগরের অগভীর দক্ষিণ চট্রগ্রাম (উখিয়ারা বা চকোরিয়ার চিরিঙ্গা-মালুম্পঘাটের কাছের ঘাড়িতে) উপকূলে ভাসমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করে মাত্র ১৩/১৪ কি.ি মি. বাঙলাদেশী ভূমির (প্রয়োজন জোর করে বা ২৫ বছর চুক্তির মত চাপিয়ে দেয়া চুক্তির বলে) উপর দিয়ে চলে পার্বত্য-চট্টগ্রামে পৌছাতে সক্ষম। এখন শুধুমাত্র পার্বত্য-চট্টগ্রামই হতে পারে ভারতের এই ভূ-কৌশলগত স্বপ্নকে সফল করার একমাত্র ক্ষেত্র। তাই সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে ভারত সহায়তা করে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফলকারী তথাকথিত "শান্তি বাহিনী"'র লোকজনকে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত ভারত দীর্ঘদিন ধরে পোষে চলেছে প্রায় অর্ধলক্ষ চাকমা শরাণার্থীকে তার ঐসব উত্তর-পূর্ব অঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের সরকারি শিবিরগুলোতে। বাংলাদেশ নিরাপত্তাবাহিনীসমূহের কাছে আত্মসমর্পণকারী "শান্তিবাহনী" সদ্যদের বর্ণনা এবং তাদের জমাকৃত অস্ত্র-শস্ত্রে তালিকা ও ব্রান্ড দেখে ভারতের সরাসরি সংযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। (Rahman, 1990 and Shelley, 1992)। তা ছাড়া ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ৬০০/৬৫০ কি. মি. ইউনান সীমান্ত থেকে ভবিষ্যতে ভারত মহাসাগরে প্রবেম করতে হলে ঐ একই পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবশোধীকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা ভারত মোটেই বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। সুতরায় আগে ভাগেই নিজের দখল দারি এবং অধিকারের পথ ভারতকে করে নিতে হবে। কিন্তু ভারতের এই অধিপত্যবাদী দূরদৃষ্টিমূলক মনোভাব বাস্তবায়নের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ পার্বত্য দুর্গম মিজোরাম, মনিপুর, ত্রিপুরা কিংবা নাগাল্যাণ্ডের মঙ্গোলীয় বিভিন্ন জনগোষ্টিসমূহ দারুণ ভারত বিদ্বেষী মনোভাব পোষন করে এবং অনেক দিন থেকে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সচেতন একতাবদ্ধ

বিপুল জনসংখ্যাসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালী এবং বিশেষ করে মুসলমানগণ ভারতের বিন্দুমাত্র অপতৎপরতা সহ্যকরতে প্রস্তুত নয়। বাংলাদেশের যে কোন প্রতিষ্ঠিত আভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় ভূ-খন্ডে ভারতের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মোড় নিতে বাধ্য। ঐসব পরিস্থিতি ভারতকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সরাসরি বা বড় ধরনের কোন ঝূঁকি নিতে সাহসী করবে না। অবশ্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের যে কোন জাতীয়তাবাদী সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে "ফারাক্কা"-র মত ভারত "চাকামা সমস্যা"কে সফল "চাবি" হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে যাবে।

চীনের স্বার্থ ঃ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সম্রাজ্যের। পতনের পর এশিয়ার বিপুল জনশক্তিতে বলিয়ান বিশাল চীন বর্তমান জামানার একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। এশিয়ার প্রধানশক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভৌগলিক ও অবস্থানগত কারণে চীন ভারত মহাসাগরের নীল জলভাগে সরাসরি প্রবেশাধীকারে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে তার অন্যতম কিংবা এশিয়ায় প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বী (শত্রু?) ভারত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ও বিমানবাহী জাহাজ (৩-টি)-এর বলে ভারত মহাসাগরে স্বীয় প্রভাব প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে (Scisha 1977, Subrahmanyam, 1972 and Kodikara, 1979)। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশিতে প্রবেশ করতে হলে চীনের নিকটতম সংযোগ পথ হচ্ছে তিব্বতের দক্ষিণ পূর্বাংশের ভূটানের সীমান্ত সংলগ্ন চুম্বি-উপত্যকা থেকে মাত্র ৬০ মাইল বা প্রায় ১০০ কি.মি. দক্ষিণে দার্জিলিং-শিলিড়ি পেরিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন (বর্তমানের) বাংলাদেশে (উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চল) অবরতণ পূর্বক আরো প্রায় ৫০০/৬০০ কি. মি. সমতল ভূমি পেরিয়ে সংলা বা ৭০০/৮০০ কি.মি. দূরের চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা লাভ করতে হবে। এক্ষেত্রে চীনকে মোকাবেলা করতে হবে বর্তমানে বিপুলভাবে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন ভারতের সাথে। তাছাড়া বিজাতীয় সংস্কৃতির ভিন জাতি চীনাদের বাংলাদেশীরাও বেশী দিন অতিথেয়তা দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে চীনকেও অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলায় স্থায়ীভাবে ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারে পৌছতে হলে মায়ানমারের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ইউনান প্রদেশ থেকে যাত্রা করে সোজা দক্ষিণ পশ্চিম এবং পরবর্তীতে পশ্চিম হয়ে প্রায় ৭০০ কি.মি. অত্যন্ত দূর্গম পার্বত্য এবং বনাবৃত জনবিরল মায়ানমার ও ভারতীয় (উঃ পৃঃ) ভূ-ভাগ অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে হবে। এবং এখান থেকে সহজেই মাত্র ৫০/৬০ কি. মি. চট্টগ্রাম বন্দর বা দক্ষিণে আরো কম দূরত্বে বঙ্গোপসাগরের কূলে পৌছাতে পারবে। ঐ ক্ষেত্রে বার্মা (মায়ানমার), ভারত, এবং বাংলাদেশের পার্বত্য-অঞ্চলের উপজাতীয় মঙ্গোলীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিগুলো নৃতাত্ত্বিক (মঙ্গোলীয়) সগোত্রীয় চীনাদের সহজেই বরণ করে নিতে পারে। উল্লেখ্য, ঐ অঞ্চলে উপজাতীয়রা বৃটিশ ভারতের ১৯২৬ সালের ইউনডাবো (Yundabo) চুক্তি বলে সৃষ্ট ভারত-বাংলাদেশ-বার্মার কৃত্রিম রাজনৈতি সীমানাকে কখনো স্বীকার করে নিতে পারেনি (vung, S.G. 1968) মায়ানমারের উত্তরাংশের চিন, আরাকানী চাকমা, মারমা ইত্যাদি) ভারতের মিজো ইত্যাদি জনগোষ্ঠিগুলো মূলত ঃ একই নৃ-ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের কারেন, কাচিন, শানজন গোষ্ঠি এবং ভারতের U.L.F.A. এবং অন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রচুর কম্যুনিস্ট

গোরিলা তৎপর রয়েছে। নাগা, লুসাই, মনিপুরী এবং আসামী সকল গেরিলাদের সাথে পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাকমা শান্তি বাহিনীর একটি বড় অংশের সংযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য-চট্টগ্রামের "শান্তিবাহিনী"র পূর্বসূরী জনসংহতি সমিতি মূলতঃচীন পন্থি কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত একটি দল ছিল (Amin, 1988/89)। জানা গেছে, ভারতের উত্তর পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রাম এবং মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে স্থানীয় মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠিসমূহ একটি বৃহৎ "কনফেডারেন্সী" ধরনের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চায় (Burman, 1983) ভবিষ্যতের ঐ পরিকল্পিত স্বাধীন রাষ্ট্রটির আয়তন হবে সমস্ত বাংলাদেশের চেয়ে কয়েকগুণ বড়। ঐ রাষ্ট্রটির ভাবি রূপকাররা ও সমুদ্র সংযোগ পথের প্রয়োজনে চট্টগ্রামের উপকূল রেখার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। পার্বত্য-চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা এবং কম্যুনিস্ট গ্রুপসমূহের সাথে সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায় (Sukhwal, 1971, and Burman, 1983) এবং বাস্তব-ভূরাজনৈতিক তাকিদে দূরবর্তী চীন ঐ সকল কম্যুনিস্ট এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর সম্ভাবনাময়গুলোকে একত্রিত, সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে এদের তৎপরতার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়।

উপসংহার ঃ ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি, কিংবা কৌশলগত যে কোন দিকের বিবেচনাই ক্ষুদ্রায়তন এবং গরীব বিপুল জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের জন্য স্বীয় এক-দশমাংশ সার্বভৌম এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিমেয়। ঠিক একইভাবে তাৎপর্যময় ভূ-রাজনৈতিক বা অবস্থাগত কারণে বিশ্বের দুই উদীয়মান শক্তি ভারত এবং চীনের কাছেও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলটি নিজ নিজ ইঙ্গিত বলয়ে প্রবেশের সম্ভাব্য ভবিষ্যত নির্বাচিত প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচ্য। অপর দিকে, পার্বত্য- চট্টগ্রামের পুরোনো বসতিস্থাপনকারী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভূক্ত উপজাতীয়দের কিছু সংখ্যক লোক, বিশেষ করে চাকমাদের কিছু সদস্য, কিছু যৌক্তিক এবং বেশীর অংশে অযৌক্তিক প্রেক্ষিতে এবং বহুলাংশে বাইরের স্বার্থন্বেষী শক্তির ইন্ধনে ঐ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার এক আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছে। তারা বিগত এক দশকে বহিঃশক্তির স্বকীয় সহায়য়তায় পার্বত্য-চট্টগ্রামের শান্তি পরিবেশকে করে রেখেছে দারুণ অশান্ত। শান্তিবাহিনী "নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্তা হামলায় এ পর্যন্ত শতাধিক অফিসারসহ প্রায় সহস্রাধিক সামরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং বাংলাভাষী ও উপজাতীয়সহ মোট প্রায় তিন/সাড়ে তিন হাজার নিরীহ পার্বত্য-চট্টগ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছে। এখানকার ঐসব পরিস্থিতির কারণে অসংখ্য লোকালয় উজাড় হয়ে গেছে এবং বিপুল পরিমাণে সম্পদের (বনজসম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি) ক্ষতিসাধিত হয়েছে। বিপুলজনশক্তি সমর্থিত, সুসংগঠিত, সুসজ্জিত প্রশিক্ষিত শক্তিশালী বাংলাদেশী নিরাপত্তা ও সামরিক বাহনীর প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপে এবং উৎপীড়িত অভিবাসী বাঙালী জনগোষ্ঠির ক্রোদ্ধ প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়ায় বিদেশী শক্তির সাহায্য নির্ভর মুষ্টিমেয় স্বল্প জনসংখ্যা সমর্থিত চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এক অবধারিত পরাজয় ও সম্ভাব্য বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপথগামী অভিমানী এসব পাহাড়ীদের এই অনাকাঙ্খিত ও করুন পরিনতির কোন বাংলাদেশীরই কাম্য হতে

পারে না। একই সাথে, ঐসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধ্বংসাত্তৎপরতা বা অযৌক্তিক দাবী দাওয়াকে মোটেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাদের উপস্থাপিত দাবী দাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাসমূহের সুস্পষ্ট লংঘন রয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন যা মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপর বাঙলাদেশের সার্বভৌমত্বের সার্বিক পরিসমাপ্তি ঘোষিত হবে।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, জাতীয় সার্ববৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রশ্নে বিশ্বের যে কোন উদার বা প্রগতিবাদী রাষ্ট্র বলে যারা অনেকের কাছে স্বীকৃত, সেসব রাষ্ট্র ও অত্যন্ত অপোসহীন ও কঠোর পদক্ষেপগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজতন্ত্রী চীন মাওবাদীকে নীতিকে অগ্রহ্য করে সংখ্যালঘু তিব্বতী জনসংখ্যার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমানোর জন্য এবং তিব্বতকে চীনের সার্বভৌম অখন্ড অংশ হিসেবে ধরে রাখার স্বার্থে বিরল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং ভিন জাতীয় এবং তিন সাংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তিব্বতের ভৌগলিক আয়তনের মধ্যে চীনের প্রধান জনগোষ্ঠি হুন জাতির (পুনজাতির চীনের মোট জনসংখার প্রায় ৯০% ধারণ করে) বিপুল জন-অভিবাসন ও পুর্নবাসন ঘটায় (Pye, 1975)। চীনের বৃহত্তর জন গোষ্ঠির এই পরিকল্পিত পূর্ণস্থাপন ((Resettlement) বর্তমানে চীন থেকে তিব্বতের স্বাধীনতা বা আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে ((Tripura, 1992) বা পূনর্বাসিত করে । এর ফলে এক সময়ের জম্মুর মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসংখ্যা বর্তমানে একটি সংখ্যালঘু জনসংখ্যায় পরিণত হয়েছে (Shahabuddin, 1989) বাংলাদেশের সাবেক দুইজন রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান ঐ একই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে এবং বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌম অংশ জনবিরল পার্বত্য-চট্টগ্রামে জনভারাক্রান্ত জিলাসমূহ থেকে বিপুল সমতলবাসী লোকের পূনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত আন্তরিক হলেও অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি রাষ্ট্র বিশেষ করে ইহুদী অর্থপুষ্ট কিছু তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থা বিশ্বব্যাপী প্রচুর হৈ-চৈ শুরু করে দেয় এবং তাদের এই অবৈধ হস্তক্ষেপ এখনো বলবৎ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডেন মার্ক ভত্তিকি "International work Group for Indigenous Affairs" ঠিক তেমনি এক বর্ণবাদী এবং ইহুদী অর্থপুষ্ট সংস্থা যা অত্যন্ত নগ্নভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যায় নাকগলিয়ে উদ্দেশ্য-মূলক ও কল্পিত বানোয়াট মানবাধিকার লংঘনের রিপোর্ট তৈরী করে। ধারণা করা হয় যে, এদের প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী এই সব রিপোর্টের পেছনে হয়তো উচ্চাভিলাসী ভারত-ইসরাঈল আতাঁতের গোপন সম্পর্ক রয়েছে (Mey, 1984)। বাংলাদেশের নিজ রাষ্টীয় সার্বভৌম অঞ্চলের অখন্ডতা রক্ষার যুক্তিসঙ্গত উদ্যোগের প্রখর সমালোচনা করলেও এসব সংস্থা এবং সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো প্যালেস্টাইন, বসনিয়া কিংবা কাশ্মীরের মুসলিম জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে, এমনকি ঐসব অঞ্চলে অমুসলিম দখলদার শক্তির চরম অত্যাচার ও মানবাধিকারের চরম অমর্যাদায় ও সম্পূর্ণ নীরব। এদের তৎপরতার এই বৈষম্য থেকেই তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তির এসব সংস্থাসমূহ পুরোপুরি অবহিত আছে যে, তাদের পূর্বপুরুষরাই

অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা নিউজিল্যান্ড এবং বিশ্বের আরো অনেক জায়গায় মূল আদিবাসী (Aboriginal People)দেরকে চরম নৃশংসভাবে হত্যা করে কিংবা ধ্বংস করে দিয়ে নিজেরা ঐসব মহাদেশেও অঞ্চলের নিয়ন্তা হিসেবে জেঁকে বসেছে। আর ঐসব স্থানের মূল বাসিন্দারা "নিজগ্রহে পরবাসী"র মত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দূর্গমও অনুর্বর অঞ্চলে জবর দখলকারীদের দ্বারা বরাদ্দকৃত "রিজর্ভ" বা সংরক্ষিত উপজাতীয় অঞ্চলে চরম দারিদ্র ও হতাশার মধ্যে এখনো ধুকে ধুকে মরছে।

বাংলাদেশের অপামর জনসাধারণ মনে করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এখানে বসবাসরত নতুন এবং পুরাতন সকল অধিবাসীই বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রশ্নে সারা জাতি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এখানে বসবাসরত সকল জাতিসত্ত্বাও জনগোষ্ঠির লোকদের সকল বৈধ এবং ন্যায্য দাবী দাওয়া অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ষাটের দশকে কর্ণফূলী জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সময় কাপ্তাই ওদের গ্রামে স্থানীয় উপজাতীয় বা অ-উপজাতিয় জনগোষ্ঠির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ যথাসম্ভব এখনো পূরণ করে দিতে হবে। সাথে সাথে স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর সামাজিক সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাদের সার্বিক বিকাশ ওসমৃদ্ধির জন্য উদার ও মানবিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্যই চলতে দেয়া যাবে না এবং যে কোন তরফ থেকে এ ধরনের যে কোন অযৌক্তিক দাবী কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। পার্বত্যচট্টগ্রাম এবং অন্যান্য যে কোন স্থানে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের উপজাতীয় কিংবা অ-উপজাতীর সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতাকে দুর্বল করে এমন যে কোন তৎপরতা বা বহিঃশক্তির যে কোন অবৈধ চাপ বলিষ্ঠভাবে মোকবেলা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে। দেশের একদশমাংশ অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আক্রমণকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতাকে "সামাজিক অসন্তোষ" বলে তাকে নিতান্ত হালকা করে দেখে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করারই সকল উদ্যোগই সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত বাস্তব কারণে একান্ত পলায়নবাদী ও আত্মঘাতী পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোন সার্বভৌম এলাকার প্রকৃত মালিক সারা জাতি কোন একক গোষ্ঠি বা কোন বর্ণ-ধর্মের প্রকার হতে পারে না। দেশের বারোকাটি মানুষ দেশের যে কোন অংশের যে কোন ধরনের অঙ্গহানির কারণকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তথ্যপঞ্জি

Administrative Map of Bangladesh, 1992 , Graphosman, Dhaka.

Ahmed, N 1958, "The Evolution of Bourdanes of East Pakistan," Oriental Geopgrapher, vol ii No. - 4, Dhaka.

Ahmed, R 1990, :Krantikale Parbatta Chattagoamer Janagoshthhi; Ekti Paryalochans; Journal of Anthropology (in Bengali), Jahangir Nagar University, Dhaka, PP. 58-75.

Alam, S.M. and Akhtar, R. 1990, "Problem of Ethnic Identity and national Integration: A Case study from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh" The Jahangir Nagar Review, Vol XIII and XIV Par-2, Dhaka.

Amin, M.N. 1988/89 "Secessionist Movement in the Chittagong Hill Tacts," Regional Studeies, Vol VII, No.1 Islambad

Bernot, L. 1960, "Ethnic Groups of Chittagong Hill Tracts, In Pierre Bessaignet (cd) social Research in East Pakistan, Asiatic Society of Pakistan, Publication No- 5 Dhaka.

Bindra, S.S. 1982, "Indo-bangladesh Relations, Deep and Deep Publications, New Delli.

Brawer, M(ed) 1988, "Atlas of the Middle East, Mac- Millan Publishing Company, New York.

Burman, D.C. 1983 Regionalism in Bangladesh : The Study of Chittagong Hill Tracts," Regionalism in South Asia (ed by Rama Kant Asia Studies Centrc, Alekh Publishers, Jaipur, PP. 116-137.

Chatterjee, S.P. 1947 the Partition of Bengal A Monograph, Calcutta Geopgraphical Society Publication, No. 8 Calcutta University Calcutta.

Frankel, W. 1980. Israel Observed: An Anatomy of the state, London.

Grodo; D.C. 1980, Lebanon, he Fragmented Nation, London,

G.O.B 1974, Chittagong Hill Teacts District Gazetteer Government of Bangladesh, Dhaka.

G.O.B 1986 Constitution of the peoples Republic of Bangladesh Ministry of laq and Justice, Dhaka.

Hossain, A, 1989, Geopolitics and Bangladesh Foreign Policy "C.L.I.O Journal, Dhaka.

Hossain, S.A. 1990, "Shanti-Ashantir Dolachole Parbattya Chattagram," Weekly Bichitra, Vol- 26 '90 Dhaka.

Hossain, S.A. 1991, "Rligion and Ethnicity in Bangladesh Politics" The B.I.I.S S Journal Vol XII, No- 4 Dhaka.

Hutchinson, R.H.S. 1906, An Account of Chittagong Hill Tracts Calcutta.

Jaffa, J. 1989, "Chakmas : Victims of Colonialism and Ethno-Centric Nationalism," The Mainstream (Oct, 28, 1989), New Delhi, P. 107.

Hohnson, B.L.C. and Ahmed, N. 1957, "The Karnafuli Project: Geopgraphical Record," Oriental Geographer, Vol-I No. 1 (July) Dhaka.

Karan, P.P. 1953, "Indo-Pakistan Boundaries," The Indian Geopgraphicl Journal, Vol, 4, No 1.

Khan, F.K and Khisha, Al, 1970, "Shifting Cultivation in East Pakistan," Orental Geographer Vol. 14, Dhaka, P.P. 22-44

Khisha, Al 1966 "Shifting Cultivation in Chittagong Hill Tracts, (Un-Published M.A. Thesis) Department of Geopgraphy, Dhaka, University.

Kdikara, S. 1979, "Strategic Factors in Interstate Relations in South Aisa," Canberra, Papers on strategy and Defence, No. 19, Canberra.

Karksides, K.C. 1977, The Rise and Fall of the Cyprus Republic, London.

Mey, W.(ed), 1984, "Ginocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh," Document No. 51, International work Group of Indigenous Affairs-Copenhagen.

Montu, K. 1981, "Tribal Insergency in cluttagong Hill Tracts," Economicand political weekly.

P.R.P.C (B.B.S) 1991 Preliminary report of polulation Census of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistices, Dhaka.

Pye, L.W. 1975, "China: Ethnic Minorities and National Security," in N. Glazerand D.P. Moynihon (ed) Ethnicity: Theory and Experience Horvard University Press. Combridge

Raman. M. 1976, "Geographical Analysis of Bangladesh Boundaries B.N.G.A. Journal Vol-VI No. 1 J.N.U, Dhaka, PP. 31-51

Rahman, M. 1990, "The Problems behind the National Consensus "(in Banglali), B.I.I.SS Paers-12 Bangladesh Institute of International and Strategic studies, Dhaka, P. 39

Risley. H.H. 1891, The Tribes and castes of Gengal (Vol. 1), Calcutta P. 118.

Rob, M.A. 1989, "Changing Role of the shifting cultivation in chittagong Hill Tracts of Bangldesh, Abstracts of the Papers, International Seminar on the Role of Agriculture in the Economic Development of Thirld world Countries, A.M.U.G.S. Aligarh (2-7 sept, 1989), India

Rob, M.A. 1991, "Resource Potentials and Geopgrlitical Significance of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh," Seminar Papae Presented at A.M.U.G.S. (Sept, 1991) Aligarh, India

Roy, D. 1992, "The Jenural Problems of the Chittagong Hill Tracts" (in Bengali), The Daily Sangbad (15th July 1992), Dhaka.

Shahabuddin, S, 1989, "Repressin on the Muslims of Kashmir: An untold story," Muslim India Vol XXII New Delhi.

Shelley, M.R(ed) 1992, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untorld story, Centre for Develpment Research, Dhaka.

Subrahmanyam, K. 1983, "Indias Securities in Eighties," Strategic Analysis, Vol No. 6 (sept, 1983)

Sukhwal, B.L. 1971, India: A Political Geography, Allied Publishers, Bombay, PP. 219- 223.

Susha. B.B. 1977, "Indo-Bangladesh Maritime Boundari Issue," Stategic Analysis.

Tyeb, A 1966, "Pakistan : A Political Geopgraphy The Oxford University Press, London.

Tripura, P. 1992, "The Colonies strike Back: Tribal Ethnicity and Modern state_Building in South Asia," Paper Presented at the National Seminar on Bangladesh and SAARC Issues, Perspectives and Outlooks, B.I.IS.S and I.R. department, D.U. (23-24 August, 1984), Dhaka.

The Daily Sangram, 1993, "Prospect of Mineral Resouces in Chittagong Hill Tacts" (In Bengali) Newspaper Report published on 24 the oct. 1993, Dhaka, PP. 3-4.

Vung, S.G. 1968, "Frontier of Freedom," Far-Eastern Economic Review, Vol. XLI No. 33 (August 15) P. 318.

Wadia, D.N. 1953, Geology of India, Mc. Millan and Company, London.

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকার, গবেষক, রাজনীতি বিশ্লেষক। গত ক'বছর ধরে ইসলামের উপর পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন। ইসলাম বিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশ করা শুরু করেছেন। পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। শতাধিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার। পঁচিশটি গবেষণা গ্রন্থ এবং দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে গত দু'দশকে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ **এ্যান আনসার্টেইন বিগীনিং ঃ পার্সপেক্টিভস্ অন পার্লামেন্টারী ডিমোক্রেসী ইন বাংলাদেশ**। তার শেষ দু'টি বই ঃ **সাপ্তাহিক ছুটি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি** এবং **পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব**।

ড. মোহাম্মদ আবদুর রব
সহযোগী প্রফেসর
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষণ করছেন সাম্প্রতিককালে। পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে বেশ ক'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার। চিকিৎসা ভূগোলের উপর তার একটি গবেষণা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বর্তমান বইটি ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে সহলেখক হিসেবে প্রকাশ করেছেন।